যাযাবর অমনিবাস

যাযাবর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাংলা সাহিত্যে যাযাবরের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা লেখকের প্রথম বই "দৃষ্টিপাত" প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বাঙালী শিক্ষিত সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভূতপূর্ব। সেকালের বিমুগ্ধ পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আজও এই বই-এর অনেক লাইন, অনেক অংশ স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন। বস্তুতঃ এক নতুন গদ্যরীতি ও অভিনব রচনা শৈলীর চমৎকারিত্বে "দৃষ্টিপাত" বাংলা রম্য রচনার ক্ষেত্রে **Trend-setter-** এর মর্যাদাকৃতের আসন দখল করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থকারের আরও চারখানা বই প্রকাশিত হইয়াছে। একখানা উপন্যাস ও একখানা ইতিহাস ভিত্তিক রাজনৈতিক চিত্র। তৃতীয়টি সাটায়ার ও হিউমার জড়িত প্রবন্ধ সমষ্টি এবং চতুর্থ বইটি ছোট ও বড় গল্প সংগ্রহ। প্রত্যেকটিই ভিন্ন স্বাদের। সংযুক্তি ও বিষয়বস্তু- **from** এবং **content-** এর দিক দিয়া প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। জনৈক বিদগ্ধ সমালোচনা বলিয়াছেন যে "অত্যন্ত- পরিমিত লেখা এবং একই ধরনের লেখায় পুনরাবৃত্তি না করা যাযাবরের সাহিত্য-কর্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।"

converted to *pdf* By-

Tanvir Ahmad

(RoNy)

2K4, *Dept. of Mechanical Engeneering*.

KUET

এ বইতে আছে

দৃষ্টিপাত ---------- ৭
জনান্তিক ---------- ৯১
ঝিলম নদীর তীর ---------- ১৯৩
লঘুকরণ ---------- ২২৭
হ্রস্ব ও দীর্ঘ ---------- ২৭২
যখন বৃষ্টি নামল ---------- ৩২৮

এক

সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানঘাঁটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রধান। পূর্ব গোলার্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন ও চৈনিক সমর-বিশারদদের এটা আগমন ও নিষ্ক্রমণের পাদপীঠ। প্রাত্যহিক পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডাগলাস্ ডাবল এঞ্জিন জাতীয়। খেচর কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোর্টেস ও লিবারেটার প্লেনের পরেই এর স্থান। নিকষ না হলেও ভঙ্গকুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার বিশাল, গর্জন বিপুল ও গতি বিদ্যুৎপ্রায়।

পুরাণে পুষ্পকরথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমান রথের গন্তব্যস্থল মর্তলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোন মুহূর্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

বিমানঘাঁটির কর্মকর্তা বাঙালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এর স্ত্রী মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য-খ্যাতি নয়াদিল্লির অনেক বঙ্গললনার মর্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিস্ময়কর এক অনুভূতি। এই তো সকালবেলায় ছিলেম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের আলোগুলি সব তখনও নেভেনি। ফুটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা নিদ্রামগ্ন, কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের দ্বারা রাজধানীর বহুজনমর্দিত পথগুলির ক্লেদমুক্তির আয়োজনে ধাবমান। সাইকেলের হাতলে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হকাররা যাচ্ছে এ দুয়ার থেকে ও দুয়ারে।

সদ্যগত রজনীর সুষুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি। আকাশের কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্না রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মতো দ্যুতিহীন। মিটমিট্ করে জ্বলছে গুটি কয়েক মুমূর্ষু তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখিদের কাকলি শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে! দমদম বিমানঘাঁটির দূরবর্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিমনিটা আকাশের পটে আঁকা আবছা ছবির মতো দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধবধবে য়ুনিফর্ম পরিহিত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্থরগতি গরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলতৃষিত চাকার ক্ষীণ আর্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিল্লি। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টাখানেকের বিশ্রাম,—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। ব্যবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় দিল্লি থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতায় ফিরে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড়দিনের পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে-বিজ্ঞান, তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। দুপুরে গৃহকর্তারা কর্মস্থলে। আহারাদির পর প্রাত্যহিক দিবানিদ্রার অব্যর্থ ঔষধ বঙ্কিমের উপন্যাস হাতে মা পাশের ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শয়ান। তাঁর সেই স্বল্পায়ু বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপলস্বভাব বালকের সশব্দ দৌরাত্ম্যে খণ্ডিত না হয় সেজন্য পিতামহী নাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধা তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর উপরে নিকেলের চশমা-জোড়াটা এঁটে মৃদু স্বরে পড়ছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এপাশ, ওপাশ, উসখুস করে মাথার বালিশটা নিয়ে লোফালুফির পরে হঠাৎ এক সময় কানে আসত

রাবণ বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে।
বিদ্যুতের সম গতি আকাশ পথেতে॥

অমনি স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে উঠতেম। অরণ্য, পর্বত, সাগর, জঙ্গম অতিক্রম করে রথ চলেছে শূন্যপথে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো, দূর হতে দূরে, দেশ থেকে দেশান্তরে মধ্যাহ্নদিনের কর্মহীন অলস প্রহরগুলি শিশুমনের নিরঙ্কুশ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। দশাননের সৌভাগ্যে ঈর্ষা জন্মত। একলক্ষ পুত্র ও ততোধিক পৌত্র সংখ্যার জন্য নয়, তার যদৃচ্ছ আকাশভ্রমণক্ষমতার জন্য।

৮

সেদিনের বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে দীর্ঘকালগত হয়েছেন। তাঁর-ই নাতি-নাতনীরা যে অদূর ভবিষ্যতে লঙ্কাধিপতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে-কথা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দণ্ডকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা নিকষাতনয় কয় দণ্ডে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ কৃত্তিবাসে আছে কিনা মনে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লি,—নশ' তিন মাইল পথ আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি। এতে উত্তেজনা আছে কিন্তু উপভোগ নেই। কমলালেবুর বদলে ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার মতো।

প্রাকবিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না ; নানাজনের সংস্পর্শে আসবার একটা সুপরিসর অবকাশ তাতে মিলত। মন্দগতি গরুর গাড়ির কথা থাক ; রেলভ্রমণেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে, বিমানযাত্রায় তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষেও বিমান চলাচল বহুলতর হবে। রাত ন'টায় গ্রেট ইস্টার্নে ডিনারের পর দমদমে প্লেনে উঠে পরিপাটি নিদ্রা দিলে পরদিন সকালে বম্বের তাজে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে। সেদিন না থাকবে ঘুষ অথবা ঘুষির জোরে টিকিট কেনার হাঙ্গামা, না থাকবে কুলীর বা সহযাত্রী কোলাহল। জানালার কাছে 'চাগ্রাম' হেঁকে কেউ ঘুম ভাঙাবে না। পানিপাঁড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর অঞ্জলি ভরে দেবে না। এবং টিনের চালার ঘুমটি ঘরের ফটক আটকে যে পয়েন্টস্‌ম্যান সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি 'পাস' করে তারও আর দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।

বিমানঘাঁটির বাইরে এসে দেখা গেল, যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ পাণ্ডুর এবং বাতাস প্রচুর ধূলিকীর্ণ। সামনে এ্যাশফালটসের রাস্তা জনবিরল। রুক্ষ প্রান্তরের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অধঃ—যে-দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে উত্তপ্ত বাতাসের একটা কম্পমান নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নয়। রুদ্র বৈশাখ—কথাটা এতকাল রবি ঠাকুরের কাব্যে পড়া ছিল ; কিন্তু 'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর' বলতে সত্যি যে কী বোঝায় দিল্লির নিদাঘ মধ্যাহ্নে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। সহযাত্রীদের সাতজন বিদেশীয়। তাদের খাকী অঙ্গাবরণে যথাযথ সামরিকগোত্রের নিঃসন্দেহ নির্দেশ। ত্রিপলঢাকা বৃহদাকার এক মোটর-লরিতে মাল ও মালিকেরা একই সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্হিত হল।

হোটেলে স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত, পথ অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অকৃত্রিম চরণযুগল। তারই স্মরণ নিয়ে পথে বিচরণ শুরু করব কিনা ভাবছিলেম।

"আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।"

গভীর রাত্রিতে নিশি ডাকে বলেই তো শুনেছি। তবে কি দিনেও ? না ; পিছনে তাকিয়ে দেখি নিজের মোটরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রাসহচর এ· এস· বোখারি,—ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের ফুয়েরার।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের নিরুপায় পথপ্রাপ্তে দাঁড়িয়ে মনে হলে,—স্বয়ং উর্বশী 'লহ লহ জীবন বল্লভ' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধহয় এত খুশি হতেম না।

সংবাদপত্র ও বেতারজগতে বোখারি সাহেবের নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই সমপরিমাণ, যদিও সরকারী সুখ্যাতির সোপানে সোপানে, দুর্গম প্রমোশনের শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে অল-ইন্ডিয়া রেডিওর তিনি আজ সর্বাধিনায়ক।

বেতারপূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছদ্মনামে রসরচনা দ্বারা উর্দু সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভদ্রলোক অসাধারণ বাকপটু এবং পরিহাসরসিক। লাওনেল ফিল্ডেন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতারজগতে আমদানি করেন। কলেজের লেকচার রুম থেকে রেডিওর স্টুডিও। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর তিনি সগোত্র।

শুধু তিনি একাই নন, তাঁর অনুজ জেড· এ· বোখারিও ফিল্ডেনের অনুগ্রহপ্রচ্ছায় অল-ইন্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, এককালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের

কৌতুক-আখ্যা ছিল, ইন্ডিয়ান বি· বি· সি—বোখারি ব্রাদার্স কর্পোরেশন।

নয়াদিল্লির রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম। ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন। মসৃণ পীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জালস্তূপের দ্বারা পঙ্কিল নয়। যানবাহনের সংখ্যা পরিমিত; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় সতত সঞ্চরমান নির্ভীক বৃষভকুল এখানকার রাজপথে দৃশ্যমান নয় এবং পথপার্শ্বের কোন গৃহের অলিন্দ থেকে অকস্মাৎ মুখনিঃসৃত তাম্বুলরাগ নিরীহ পথচারীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক, সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানাদিকে প্রসারিত। পার্কগুলির নাম প্লেস, আকৃতি একই। উইন্ডসর প্লেসের সঙ্গে ইয়র্ক প্লেসের তফাৎ যা, সে শুধু নামে। সবগুলিই সযত্নে রচিত এবং রক্ষিত।

রাস্তার পরিচয় আমলাতান্ত্রিক। সরকারি দপ্তরখানার পূর্বতন বহু ইংরেজ কর্মচারীদের নাম পথের প্রান্তসীমায় সুস্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। মোগল বাদশাহ বাবরের চাইতে চীফ-কমিশনার বেলা সাহেবের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নুরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর অভিজাত। বোঝা গেল, নয়াদিল্লির নগরপালদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটি রাস্তার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের নামে তাঁর জীবদ্দশায়ই হয়েছে, কবির জন্মস্থানে আজও যা সম্ভব হয়নি। গাঁয়ের যোগীর পক্ষে ভিখ পাওয়া সহজ নয়।

বোখারি সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তার নাম কুইনস্‌ওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা রানীরদীঘির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। ক্ষুৎ, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক যে ক'টি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিব্রত করে থাকে আপাতত তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিড়িকে গভর্নমেন্টের দপ্তরখানার বিস্তার ঘটেছে অভাবনীয় বেগে। কেরানী, দপ্তরী, সাহেব, সুবোয় শহরের ঘরবাড়ি পরিপূর্ণ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়েটের বহু তিন-হাজার চার-হাজারী মনসবদার। নানা দিকদেশ থেকে এসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার। হোটেল, বোর্ডিং-হাউস সর্বত্রই এক রব,—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাতদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—বহুদিন মনে ছিল আশা; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। অনুমান হয় কবি এককালে দিল্লিতে ছিলেন।

যিনি আতিথ্য দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার। নিজের কর্মকুশলতায় কোম্পানীকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিল্লি শহরটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে; কপালে তার জয়পত্র আঁটা,—"অন্ হিজ ম্যাজেস্টিস্ সার্ভিস" জামসেদপুরকে যদি বলি স্টীল-টাউন, তবে নয়াদিল্লিকে বলা যেতে পারে স্টীলফ্রেমের টাউন। শহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেক্রেটারিয়েটকে কেন্দ্র করে। চাপরাশী, দপ্তরী, কেরানী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট আকীর্ণ এই শহরে বেসরকারী ব্যক্তিদের কক্ষে পাওয়া ভার। এখানকার সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস থাকে ইন্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে-অল্পসংখ্যক বেসরকারী লোক এখানকার সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁরা যথার্থই শ্রদ্ধার যোগ্য। আমার হোস্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির সভাপতি, কালীবাড়ির সম্পাদক, বাঙালী ক্লাবের কর্মকর্তা এবং আরও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য।

ভদ্রলোকের আলমারিতে সারিবাঁধা 'সবুজপত্রের' বাঁধানো খণ্ড দেখে বোঝা যায় তাঁর রুচি। ভোজনপর্বে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট হলো। শুক্তো, ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ, টক ও একটু দৈ। সাধারণ ভদ্র বাঙালী পরিবারে যা প্রাত্যহিক আহার অতিথির জন্যও সেই ব্যবস্থা। অপরাহ্নে নারিকেলের কুচি সহযোগে চিঁড়ে ভাজা বা বাড়িতে তৈরী খানকয়েক লুচি। চায়ের সঙ্গে পান্তুয়া রসগোল্লার সমারোহ এবং ভাতের সঙ্গে চপ-কাটলেটের বাহুল্য দ্বারা প্রত্যহই অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে একজন বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের। সে দম্ভ কখনও অর্থের কখনও বিদ্যার, কখনও বা প্রতিপত্তির।

দুই

বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে একদা 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। সিদ্ধির কনট প্রেসকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণগলি বলে কোন মতেই ভুল করবার সম্ভাবনা নেই, তার পুরনারীরা কেউ বৃষভানুনন্দিনী নন। কিন্তু এখানকার শ্রীমতীরাও নিদায় রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন।

না করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্তণ্ডদেব এখানে যে প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা শুঁজতে গেলে মাথা ফুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে নিলেও আগুনের হল্কা লাগে। সুতরাং বাইরে ঘুমানো ছাড়া গতি নেই।

শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে বুড়ো বাচ্চাকাচ্চা সবারই এক অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে জমিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্তপ্ত ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপর খাটিয়া বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, যেন সরকারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, পুত্র কন্যা সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয্যা ঘিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যেন একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য আর পাঁচটা নীতিবোধের ন্যায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের তাগিদে হয় বদলবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, ধোটা কাঁচুলি আর আঠারো গজি ঘাগরার মধ্যপথে মেদবহুল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসঙ্কোচে চলেছেন মারোয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙালী তরুণীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সঙ্কল্পটিতে। হাঁটুর উপরে-ওঠা স্কার্ট পরে ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্র তত্র। কিছু খারাপ লাগছে না তো চোখে। অথচ আমাদের অতি আধুনিকাদের মধ্যেও কোন দুঃসাহসিকা তাঁর ক্রেপ শাড়ির ঝুল পায়ের গোড়ালি থেকে জানু পর্যন্ত উন্নীত করতে পারবেন না। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তাঁর দিকে কেউ তাকাতে পারব না।

একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন ভাষা ও পরিবেশের তফাতে শ্লীল ও অশ্লীল ঠেকে তার আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে সিনেমায়। শ্বশুর-ভাশুর, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতা একসঙ্গে মেট্রোতে বসে প্রেটা গার্বো ও চার্লস বোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আর আলিঙ্গন দেখতে যাঁরা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন না, বাংলাছবির নায়ক-নায়িকার নিরাবিল প্রণয় নিবেদন দৃশ্য তাঁদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে দেখেছি। শারীরতত্ত্বের আলোচনায় যে কথা বাংলায় বলতে বাধে, ইংরেজীতে তা নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা হয় অনায়াসে।

গরমকালে ঘরে শুলে যে-দেশে জ্বর ধরে, সে-দেশে মেয়ে পুরুষকে বাইরে ঘুমোতে হয় এবং তিন চারটে করে আলাদা উঠান যখন শতকরা নিরানব্বই জনের বাড়িতেই রাখা সম্ভব নয় তখন শ্বশুর, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাট না বিছিয়েই বা করে কী? নয়াদিল্লি সার্বজনীন শহর। অন্ধ্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, কোশল থেকে এখানে ঘাটছে জনসমাগম। আহারে তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়, শয়নে মেনে নিয়েছে একই রীতি। পাঞ্জাবী মেয়েদের বসন এরকম কমিউনিটি স্পিরিট-এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালির কাছে আঁট পায়জামা শিথিলবন্ধন শাড়ির মতো অলক্ষ্যে নিহিত দেহের উপর অবিন্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সে হচ্ছে ফিরিওয়ালার ক্যাভেলকেড। দুধ, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, সবই এখানে ঘরে বসে পাওয়া যায় পসারিণী যদিও বা নেই, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয় সাইকেলে। ঐ জিনিসটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারকে। কিন্তু নয়াদিল্লিতে গয়লা, ধোপা, নাপিত, জেলে, কসাই, ব্রাউজের ছিট, গায়ের সাবান বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মস্ত ঝুড়ি বা বাক্স চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পশ্চাদ্‌পদ নয়।

প্রভাতে উঠিয়া যে-মুখ দেখিনু, তার বেশির দুধ। ছাকনা পাড়ির মোড়ার মতো হাতলওয়ালা বেত করা জীর্ণদেহ সাইকেল, তার পিছনের কারিয়ারের দু'পাশে ঝোলা দুধের দুটি টিন। টিনের ঢেরী, পাত্র। আশ্চর্য বহন ও চলন ক্ষমতা এই বিচক্ষণের। আশ্চর্যতর তার চাকা, ফ্রেম ও দুগুরাজের সম্মিলিত ঐকতানবাদন। টিনের টবগুলির উপরের দিকে চাকনি আছে, তাতে তালা ঝোলা। বলা বাহুল্য দুগ্ধের বিশুদ্ধতা এবং গয়লার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্রেতারে আশ্বস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের ছাতার বাঁট করে নাম লেখার মতো। নীরা তাহা জানিয়া গ্রহণ করাতে হয়তো ঁপাচ সের দুধকে দু'সেরে দাঁড় করাতে হয়।

গয়লার পরে "কলকাত্তাকা হিলশা লো, করাচীকা চিংড়ি" হাঁক দিয়ে এল মাছওয়ালা। কল বাহুল্য সে-ইঁলিশ বেশীর ভাগই বঙ্গজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারও মন সময়ে চেহারায় ধরা পড়ে না, পড়ে ঘ্রাণে। মাছওয়ালার সাইকেলের পিছনে ঝুড়ির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্য।

সবজিওয়ালা আসে একে একে। কেউ হাঁকে,—লেউকী লো, কেউ হাঁকে পালং অথবা গোবী। কারো বা ঝুড়িতে আছে টমাটো, ভিণ্ডি, হরা ধনিয়া এবং সীতা ফল অর্থাৎ কুমড়া। বলাবাহুল্য সাইসিকেলের পশ্চাতে যে পর্বতপ্রমাণ কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আনে তা দেখে প্রেতাত্মারও পরমানন্দনেরও বিস্ময়ের উদ্রেক হতে পারত।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দু-একই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময়াপেক্ষ। তফাত শুধু এই যে, প্রথমটির বদ্ধ বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে। যে বাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায়,—এ কথা সত্য। তবুও বেণীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশী হন ; ক্ষৌরকার্যে নর-সুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলে আয়েশ বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট্ট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লী, অনেকটা ইকবিদ কুকারের মতো আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের রসিকেরা জানেন, ডিসেম্বারের সাইবিরিয়া ভিত্তির শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হয় আপিস অভিযান। প্রথমে চাপরাশী দল। গায়ে খাকী রঙের উর্দি, মাথায় পাগড়ি ও কটিতে লাল সর্পাকৃতি তিন চার ফেরতা কোমরবন্ধ। দু'-একজনের কোমরবন্ধে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে হাতির দাঁতের হাঁটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহের আমলে খোজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনারেবল মেম্বর বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্মানী বন্দিনীরে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে ঢাকা এক গুচ্ছ ফাইল, যা সাহেবরা প্রত্যেক শনিবারই বাড়ি নিয়ে যান কাজ করার জন্য এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছুঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরানী, এ্যাসিস্টাণ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা।

সাইকেল, সাইকেল, সাইকেলের পর সাইকেল। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশন। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা। সেও বিচক্ষণ। ঘোড়ায় টানে। সামনে পিছনে চারজন বসা যায়,—কিন্তু মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু কাপিসের আচ্ছাদন ; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টিধারা কোনটাই পুরোপুরি নিবারিত হয় না। আরোহণ ও অবরোহণের কালে পুরুষদের পক্ষে হয় জিমন্যাস্টিকের পরীক্ষা, শাড়ি পরিহিতাদের পক্ষে ভয়াবহ। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মূর্ছা অসম্ভব নয়।

টাঙ্গার গতি মন্থর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারন্ধ্রের পক্ষে ক্লেশকর। সম্প্রতি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হার হয়েছে বৃদ্ধি। আগে যে রাস্তটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তার জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালারা কথা বলে না ; কিংবা এমন কিছু বলে যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটার সেক্রেটারিয়েটের পথে সহযাত্রী মেলে। টাঙ্গাওয়ালা

"দপ্তরকো, দপ্তর জানেবালা আইয়ে", বলে চেঁচিয়ে সংগ্রহ করে সওয়ারী। তাতে ভাড়ার অংশ বিভক্ত হয়ে পকেটের পক্ষে সুসহ হয়। ভাগের মা গঙ্গা পায় না, কিন্তু ভাগের টাঙ্গা গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে পৌঁছায়।

সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা শহরটার সমস্ত পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়েট। বাবু পালাল পাড়া জুড়ালো, গিন্নি এল পাটে।

ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটটি নবনির্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়েট নয় এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লি শহরটা আপস্টার্ট, বারাণসী প্রয়াগ এমনকি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও এর পশ্চাতে কোন ট্রাডিশন নেই। সে হঠাৎ টাকা-করা ওয়ার কনট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগটাই যে ভুঁইফোড়দের। এ যুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী-অস্টিন, সাত লহরীর চাইতে মফচেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব।

মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়েটের দুই মহল,—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনার এডুইন লুটীনস এবং তাঁর সহযোগী সার হার্বার্ট বেকারের নাম।

নয়াদিল্লির প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বাড়িগুলিই মুখ্যতঃ ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ, যদিও পুরোপুরি নয়। থাম আর গম্বুজ। আর্চের সংখ্যা কম। যা আছে তাও রোমান ধরনের অর্ধবৃত্তাকার, মুসলিম পদ্ধতির সূক্ষ্মাগ্রভাগের নয়। থামগুলি চতুষ্কোণ নয়। গোলাকার। নয়াদিল্লির পত্তনে গ্রীক স্থাপত্যকে গ্রহণের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার দিক দিয়ে গ্রীস উত্তর ভারতের সমতুল্য যদিও তার গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য এবং শীত অপেক্ষাকৃত কঠোরতর। উত্তর ভারতের মতো গ্রীসেরও বাতাস অনার্দ্র, আকাশ নির্মেঘ এবং রৌদ্র নির্মল সুতরাং গ্রীক স্থাপত্য নয়াদিল্লির পক্ষে স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অধিকতর উপযোগী হবে, স্থপতিদের মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

কিন্তু নয়াদিল্লির স্থাপত্যকে পুরোপুরি কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্ল্যাসিক্যাল বটে কিন্তু একেবারে নির্ভেজাল নয়। সেক্রেটারিয়েট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে,—সারনাথে দৃষ্ট অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ-তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘন্টা প্রভৃতি অলংকরণের! তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যরীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিন্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজমিস্ত্রিরা বেশীরভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু'ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেন্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র একুশ ফুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে কক্ষ আছে প্রায় এক হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডই বটে!

সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরখানার সঙ্গে আর্টের বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। তার নামে যে-দৃশ্যটি আমাদের কল্পনায় আসে তা এক রাশি নথি, দলিল, দস্তাবেজ, ও হিসাব নিকাশ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টেবিলের উপর ফাইল ঘাঁটাই যেখানে একমাত্র কাজ, সেখানে গৃহের গঠনভঙ্গি বা পরিবেশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনে। সে দালানের জানালা কি রং-এর, সিঁড়ি কি ঢং-এর সে প্রশ্ন আমাদের মনেই আসে না। পুলিশকোর্টের দেয়ালে অজন্তার ফ্রেস্কো পেন্টিং আমরা আশা করিনে। কিন্তু দেখলে কি খুশি হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিল্লির সেক্রেটারিয়েটকে সুদৃশ্য করার চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে গড়া বিরাট ভবন। মাঝখান দিয়ে দূরপ্রসারিত পথ। পথের দু'পাশে শ্যামল দূর্বার আস্তরণে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝিল, তাতে সারিবদ্ধ ফোয়ারা থেকে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে জলরাশি। পাশে পুষ্পিত মরসুমী ফুলের—ডেভী প্যানসী, এ্যাস্টার ও হুলি হকের—কেয়ারী। নির্বাচিত স্থানে একটি করে কমলালেবু গাছ। বহু যত্নে বৃত্তাকারে ছাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন বাঁটের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক একটি বেলুন ছাতা।

দালানের ভিতরটাকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে দর্শনযোগ্য করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ ব্লকে কমিটি রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তাদের সিলিং এবং দেয়াল চিত্রশোভিত। বম্বে স্কুল অব আর্টের শিল্পীদের আঁকা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভাল কিন্তু দুঃখের বিষয় অঙ্কনচাতুর্য প্রশংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রকম কমিটি, কনফারেন্স বসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস কনফারেন্স বসল সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌঁছল দিল্লিতে। তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়—মাত্র দু'ঘণ্টা ব্যবধানে—একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে, বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট আছে একটি টেরে। অবস্থান নৈকট্যের কারণ বোধ হয় স্বভাবসাদৃশ্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারী প্রায় কাছাকাছি। স্বগোত্র না হলেও স্বজাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্য ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপত্রের।

প্রচুর বক্‌শিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও সাউথ ব্লকের দরজায় এসে যখন অবতীর্ণ হলেম চারটে বাজতে মিনিটখানেক মাত্র বাকী। বেচারার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগীপুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও নির্বিকার : কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয়। বেগবৃদ্ধি প্রায় সাধ্যাতীত।

ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হলেম কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ সার ফ্রেডরিক পাকল, ইনফরমেশন বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন, ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিঁড়ি উপরে যাচ্ছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সদ্য আগত ইংরেজ বা মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে নেমে এসে সার ফ্রেডরিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "Did you say Cripps ? That's me."

এর চেয়ে বজ্রপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিস্মিত, পাকল স্তম্ভিত, পারিষদেরা হতবাক।

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে। আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ক্রাউন মার্কা গাড়ি চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইকেলে পাইলট সার্জেন্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুরূপ কোনো হোমরা-চোমরা পথ-প্রদর্শক। জমকে জলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত। এইটেই আশা করছে সবাই। হা-হাতাশি, কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তলকোমরে সার্জেন্ট পাহারা। সঙ্গে একটি মাত্র ভাইসরয়'স হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

সরকারী কায়দা কানুন, ফর্মালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন ক্রীপস্। তাঁর আন্তরিকতায় ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হলো, তাঁর চেষ্টার সাফল্য কামনা করল জনসাধারণ, তাঁর সুখ্যাতি অকৃপণ ভাষায় কীর্তিত হলো সর্বপ্রদেশ ও সর্ব ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

কনফারেন্সে ক্রীপস্ আবেদন জানালেন সাংবাদিকদের, তাঁরা যেন ক্রীপস্ প্রস্তাবের সারমর্ম নিয়ে অযথা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে সংবাদপত্রে যৌমাংসা-প্রস্তাবে কল্পিত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবাঞ্ছিত বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি না হয় রাজনীতিক মহলে। বলা বাহুল্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীপসের মনে অবিচলিত আস্থা। ওয়ার ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত এই মীমাংসা-প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণীয় হবে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অদম্য অভিলাষে ভারতের অগণিত নরনারী দুরূহ ত্যাগ ও দুঃসহ নির্যাতন বরণ করেছে তার সার্থক পরিণতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনোভাব কারো অজ্ঞাত নয়। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের প্রতি ক্রীপসের সহানুভূতি, বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যও তেমনি অতি পরিচিত তথ্য। চার্চিল ইম্পিরিয়লিস্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ক্রীপস্ সোশ্যালিস্টগোষ্ঠীতেও সবচেয়ে প্রগতিশীল। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রচনায় প্রধানমন্ত্রী ও সার স্ট্যাফোর্ডের মতৈক্য হলো কী করে? চার্চিল তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেছেন, না কি সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বদলেছেন?

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ক্রীপস্ উত্তর করলেন, কোনোটাই নয়, দুজনারই মতের মিল হওয়ার মতো একটা নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এর আগে চোখে পড়েনি।

কনফারেন্স থেকে যখন বাইরে এলেম, ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ছ'টার কোঠায়। অপরাহ্ন বেলার শান্তরোষ সূর্যের অ-তপ্ত রশ্মি পড়েছে সেক্রেটারিয়েট ভবনের রক্তাভ প্রাচীরে। সামনের ফোয়ারার উৎসারিত জল কম্পিত ধারায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বৃত্তাকার প্রস্তর-আধারে। ঋজু দীর্ঘ কীসওয়ের প্রান্তভাগে দেখা যায় ওয়ার-মেমোরিয়াল, বিগত মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণলেখা যার গায়ে উৎকীর্ণ। দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণদুর্গের ভগ্নাবশেষ রূপসী তরুণীর পাশে পলিত কেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা পিতামহীর মতো নয়াদিল্লির বর্তমান বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালের অমোঘ বিধান, অপ্রতিরোধনীয় পরিণাম।

পিছনে তাকিয়ে দেখি উন্নতশির ভাইসরয়'স হাউসের বিরাট গম্বুজের শীর্ষে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত য়ুনিয়ন জ্যাক,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন গৌরবচিহ্ন। দু'শ বছর ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অচল, অটল ও অনপনেয়। এই মাত্র যে কনফারেন্স শেষ হলো, তাতে আশ্বাস ছিল ঐ পতাকার বর্ণ পরিবর্তনের। সে বর্ণ গৈরিক হবে কি সবুজ হবে, তাতে চরকা থাকবে কি অর্ধচন্দ্র থাকবে সে প্রশ্ন পরের। আপাতত এইটিই বড় কথা যে, সে নতুন হবে, ভারতীয় হবে। কিন্তু সে কবে গো কবে?

তিন

গৃহকর্তীর সাত বছরের মেয়ে রেবা এসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "মিনি সাহেব, ইংরেজ জিতবে কি জাপান জিতবে?"

মিনি সাহেব নামের পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষাতত্ত্বও।

বিলাতে গেলে আমাদের প্রথম রূপান্তর ঘটে বেশে, দ্বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যারা পল্টু, গদাই, সুরেন কিংবা সুবোধ বিদেশে তারাই সেন, রয়, মিটার অথবা ব্যানার্জী। নয়াদিল্লিটা খাঁটি বিলাত নয়,—এরসাৎস। এখানেও ব্যক্তির পরিচয় নামের আদিতে নয়, অন্তে। পি· এল· আস্থানায় আদ্য অক্ষর দুটি কিসের সংক্ষেপ তা নিয়ে কারও ঔৎসুক্য নেই, শেষের টুকু জানলেই হলো। পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে সম্বোধনের বিশেষণ। কেরানী হলে আস্থানার সাফিক্স বসে বাবু, অফিসার হলে প্রেফিক্স লাগে মিস্টার।

কিন্তু মুখে মুখে কথার ধারা বদল হয়, নামেরও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে চাকর,বেয়ারা আর্দালী, পিওনের অশিক্ষিত উচ্চারণে অনেক সময় চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আঁচ করাই কঠিন হয়। ব্যানার্জী বেনারসী হন, মিঃ ম্যাকাটিস হন মারকুট্টি সাহেব। সেনগৃহের পরিচারিকা বিলাসিয়ার আদি বাস রামগিরি পর্বতের সানুদেশে। ভাষা কিছুটা দ্রাবিড় এবং কিছুটা আর্য, শব্দের উচ্চারণ মারাত্মক। সুতরাং কবে কেমন করে কোন শব্দের অপভ্রংশ ও কোন শব্দের অর্ধাংশ মিলিয়ে তার মুখে মিনি সাহেবে দাঁড়িয়ে গেছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুয্যের শরণ নিতে হবে।

"বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ না জাপান?" প্রশ্নকর্ত্রী তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নতুন নয়। ইতিপূর্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। যাঁরা তা দেননি, তাঁরাও কী শুনলে খুশি হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রাখেননি কখন, ঠিক যেমন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, নতুন শাড়িটায় তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "তুমি বল, কে জিতবে।"

"ইংরেজ!" স্বর গম্ভীর, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। স্বয়ং চার্চিলের পক্ষেও বোধহয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই ভাই ছুটে এল: "কী বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি। জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফু!" বাকোর সঙ্গে যোগ করল ভঙ্গি! ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখে চোখে এমন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য হবে।

বুড়ঢু রেবার চাইতে মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকত্বের ধারা প্রায়ই বয়সের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষত বুড়ঢু স্কুলে ভর্তি হয়েছে, রেবার এখনও বাকী। সুতরাং তর্ক-বিতর্কের মাঝপথে বুড়ঢু যখন মাস্টার বা অন্য ছাত্রদের নজির উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়ে বোবা হতে হয়। "বিশু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সে বলেছে। তার চাইতে তুমি বেশী জান কিনা?" এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজ তো ফার্স্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের বিশ্বাস। তাই রেবা দমল না।

"কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে।" কিন্তু কণ্ঠে যেন সে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল না।

বুড়ঢু অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ইংরেজ জার্মানের সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে! হুঃ, হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

"কেন হারবে? ইংরেজের কত কামান বন্দুক কত এরোপ্লেন। আছে জাপানীদের এরোপ্লেন?"

"জাপানীদের এরোপ্লেন নেই? হা হা হা! এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিন্স অব ওয়েলস্ ডুবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্লেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে?"

"ইংরেজের এরোপ্লেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা যদি তবে আকাশে ওঠে কেমন করে?" করুণ কণ্ঠে আপীল জানালেন ইংরেজ হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বুড়ঢু বলল, "ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লেখেনি 'বিমান দুর্ঘটনা'? কলকাতায় এরোপ্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে।"

অকাট্য প্রমাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ। এর পরে তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। "দেখো, ইংরেজ হারবে না।"

"তুমি কত জানো! হারবে হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্চিলকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বেঁধে এনে তারপর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।" বলে, এমন বীরদর্পে প্রস্থান করল বুড়ঢু যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্চিলের বন্ধনের উদ্যোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, "কখনও নয়, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?"

তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেম, "না পারবে না। আর পারলেই বা কী? বাঁধুক না চার্চিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাঁধতে পারছে না।"

"ইংরেজ হেরে গেলে বিলদের কি হবে? বিলের বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, জন, লুসী ও এ্যানী সবাইকে তো বেঁধে নেবে?" বিল মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সিমস্ দম্পতির বারো বছরের ছেলে জন। লুসী ও এ্যানী তারই দুই বোন।

"তা নিক না ধরে বিলুদের। ওদের টাবী কুকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন কামড়ে দিচ্ছিল যে।"

মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল, " না ধরে নেবে না ওদের। বিল আমাকে চকোলেট, টফী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেল চড়তে দেবে।"

ও হরি! এতক্ষণে বুটেনবান্ধবীর প্রবল ইংরেজ-হিতৈষণার আসল কারণটা বোঝা গেল। চকোলেট, টফী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আশ্বাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় কল্পনা করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় হবে। বিস্ময়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে ক'জন আছেন তাঁদের সবারই ঐ এক অবস্থা। চকোলেট, টফী না হোক, কারো চাকরি, কারো প্রমোশন, কারো বা রায়সাহেব, খানবাহাদুর বা সি· আই· ই· নাইটহুড খেতাব।

কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সস্ত্রীক ঘোষ সাহেব হানা দিলেন। এই দম্পতিটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র দিন কয়েক কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা অল্পকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস বললেন, "চলুন ওখলায়।"

"সে কোথায়? পেরু না কামস্কাটকায়?"

"তার চাইতে কিছুটা কাছে। মথুরার পথে, এখান থেকে মাইল আটেক। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।"

ওখলা জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্যে দিয়ে ভিন্নমুখী করা হয়েছে সেখানে। সে-খাল বেষ্টন করেছে এক টুকরো ভূমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছন্ন। একপাশে সরকারী সেচ বিভাগের দপ্তর, বাকীটা প্রমোদ-উদ্যান। খালের মুখ খোলা ও বন্ধ করার জন্য আছে লকগেট, তার উপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা ও মোটর অনায়াসে যেতে পারে। ছুটির দিন দলে দলে লোক আসে পিকনিক করতে। ওখলা নয়াদিল্লির বটানিকস।

স্থানটি মনোরম। চারিদিকের ধূসর রুক্ষ ও ধূলিকীর্ণ দেশে একটুখানি স্নিগ্ধ, শ্যামলতার আমেজ মেলে। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্য দীর্ঘ বাঁধ। তার উপর দিয়ে উপচীয়মান শুভ্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো সেখানটা। চাষীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু-একজন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের ধৈর্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা গুপ্তজী। চৌরী বাজারে বিরাট লোহার আড়ত। সারা সপ্তাহ হন্দর হিসাবে লোহা বেচে অর্থ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবার এসেছেন প্রমোদ-ভ্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকায়া গৃহিণী, আধডজন পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহদাকার টিফিন-কেরিয়ার, জলের সোরাই, আলবোলা ও ভৃত্য।

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাকতি বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানাডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। বাহুসংলগ্না ফিরিঙ্গী বান্ধবী। স্কন্ধে চামড়ার ফিতে দিয়ে লম্বমান ফটোগ্রাফের ক্যামেরা। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের প্রণয়কাণ্ডের উৎকট অভিনয় দেখে মাঝে মাঝে লজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।

স্বদেশে ইংরেজকে কখনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানহীন। শনিবার বিকেলে পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণয়ীযুগলের দল। কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ঠিক ভট্টপল্লীর বিধানানুযায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও অদৃশ্য, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা লঙ্ঘন করে না কেউ। সে রেখা সুনীতির নয়, সুরুচির। ডিসেন্সীকে ইংরেজ ভালবাসে মনে প্রাণে। ইন্ডিসেন্ট বলার বাড়া গাল নেই ইংলন্ডে। ছাব্বিশ মাইল জল পার হলেই কন্টিনেন্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলি-নির্দেশকে সেখানে তরুণ-তরুণীরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সাত সমুদ্র তের নদীপার হয়ে এদেশে এসেছে যে-ইংরেজ, সে ঐ সুরুচির রেখাটির কথা ভুলে গিয়েছে নিঃশেষে। ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশ কলঙ্কের কদর্য কাহিনী আছে Somerset Maugham-এর গল্পে ভূরি ভূরি। পালামৌ ভ্রমণে সঞ্জবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, বন্যেরা বনে

সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। ব্রিটেন-অরণ্যের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডারুইন-তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এই, যে, চার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সম্বন্ধে কী ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই আমাদের সামনে ভদ্র আচরণের দায়িত্ব। আরও একটা কারণ আছে, সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্গাহীন অশ্ব। সে যেন কলকাতার মেসে থাকা মফঃস্বলের ধনী জমিদারনন্দন। পিছনে অভিভাবকের এতটুকু নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

দুটি ইংরেজ দম্পতি এসেছেন নয়াদিল্লি থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। স্নানার্থে। নদীতে জল কোথাও বুকের উপর নয়, কিন্তু স্বচ্ছ। তারই মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে তাঁদের সন্তরণ অর্থাৎ সন্তরণের চেষ্টা চলল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বকের দল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর ন্যায় নিশ্চল নিথর, জলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি দাঁড়িয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, স্নানার্থীদের সশব্দ জলক্রীড়া ও কলহাস্যে তাদের স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হলো। সচকিত হয়ে বারংবার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগল।

স্ত্রী-পুরুষে এই মিলিত স্নানপর্বটা তেমন রুচিকর নয় আমাদের দেশে। প্রাচীনপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলেন। আহারে বিহারে শয়নে যাঁরা ইংরেজের অনুগামী তাঁদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্লাবে ভিন বা ভারমুথ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ওয়লজ নাচতে যাঁদের বাধে না, তাঁরাও সহস্নানটা খুব প্রীতির চোখে দেখেন না।

স্থির চিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে, এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে-সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃতি নয়। উভয়ের ক্ষেত্রে পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কর্তব্য আলাদা।একমাত্র ধর্মাচরণ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের একত্র করণীয় কিছুর উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নেই। অর্জুনের রথে সুভদ্রার সারথ্যকে বাদ দিলে সমগ্র পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত কর্মের দ্বিতীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গ নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বয়ে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে। সেকালে পুরুষেরা করত যজন, যাজন, অধ্যাপনা, হলকর্ষণ ও বাণিজ্য। মেয়েরা করত গো-ব্রাহ্মণের সেবা, রন্ধন ও গৃহমার্জনা। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশীথে শয্যাগৃহের স্বল্পপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথাও স্বামী-স্ত্রীর সর্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে স্বামী এবং স্ত্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্ত্রের ক্ষুদ্র বা কটু মাত্র, উভয় মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সরগমের তারা আলাদা দুটি সুর ; দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী বাড়ির মেজগিন্নী পারেন না বাড়ির আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা স্বামীর সঙ্গে সিনেমায়, কিংবা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতে। বঠঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিন্নীকে দার্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়িয়ে আনার কথা।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজাত। স্ত্রী পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্ররূপ সম্প্রতি আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি এবং স্বীকার করতে দোষ নেই যে এ জ্ঞান আমরা য়ুরোপের কাছ থেকে পেয়েছি। এখনও পুরুষ দশটা-পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এবং মেয়েরা ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'পক্ষের রেসপনসিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির যোগ থাকে। এ যুগের স্ত্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও স্বামীদের জাহাজের খবর রাখেন।

গৃহ এখন কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচারেই গঠিত নয়। বাইরে পুরুষের বন্ধুত্ব, সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনও শুধু স্বামীর নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুর মতো বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বামী, স্ত্রী ও দু'চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীর স্থান গৃহকর্তার। সে স্বনামে পুরুষোধন্য। সে গৃহে স্ত্রীর পরিচয়ও মেজ, সেজ বা ছোট বউ রূপে নয়, আপন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে।

অনেকেই ভুলে যান যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের পরিপূর্ণতাও প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে,—সেটা আকস্মিক নয়। বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারান্টি তো নয়ই। সে শুধু মীনস, সে এন্ড নয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত অধিকার দিয়ে বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সুপরিসর ও নির্বিঘ্ন করে মাত্র। তাকে সফল করতে হয় উভয় পক্ষের সযত্ন চেষ্টায়, নিরলস সাধনায়। আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান জ্ঞান করতেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল-প্রুফ নয়, যেমন নয় ইন্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে দিনে একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে আপন রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং মতবাদের দ্বারা। পরস্পরকে গঠন করে নিজ অভিলাষানুযায়ী, সৃষ্টি করে পলে পলে। এই দেওয়া নেওয়া, ভাঙা গড়া চলে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে এবং অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সান্নিধ্যের দ্বারা। সান্নিধ্য শুধু গৃহে নয়, বাইরেও।

মানুষের মন বহু বিচিত্র, তার পরিচয়ের নাই শেষ। তার সত্তা ধ্রুব নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তার প্রকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়, উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। স্বামী স্ত্রীকে অবিষ্কার করবে তিল তিল করে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকার হীরা, পান্না, মুক্তাকে করে নতুন ডিজাইনের বাহারে, চুড়িতে, চন্দ্রহারে। সুতরাং স্ত্রী যদি জলকেলির সঙ্গিনী হন, তবে তাঁকে এমন একটি বিশিষ্টরূপে পাই, যা সকাল বেলার সধূম চায়ের পেয়ালা-হস্তে প্রতীক্ষমান গৃহিণীর মাঝে নেই। স্ত্রীকে নাচঘরে অপরের বাহুলগ্না দেখে যাঁরা রাগ না করেন, তাঁরা তাঁকে স্নানের সহচরী পেলে দুষিত হবেন কেন? নারীদেহ সুইমিং কস্টিউমে দেখলেই শকড হবেন এ যুগে মর্ডান সিনেমা দেখে যাঁরা চোখ পাকিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই। যোধজয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ফিরবার পথে মোটর থামালেন নিজামুদ্দিনের দরজায়। দরজা খুলে গেল ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায়ের।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী তৈরী করেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকার দিল্লির এক প্রান্তে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একদা এক ফকির এলেন সেই মসজিদে। ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। স্থানটি তাঁর পছন্দ হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই মহাপুরুষ। ক্রমে প্রচারিত হলো তাঁর পুণ্যখ্যাতি। অনুরাগী ভক্তসংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুত বেগে।

স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি যেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধূরা ভরবে ঘট এবং নামাজের পূর্বে প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারীর দল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতরূপে। উদ্দীপ্ত হলো রাজরোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকির দেওয়ানা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের পিতৃপরিচয় কৌলিন্য-যুক্ত নয় ক্রীতদাসরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য এবং বুদ্ধির দ্বারা আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালেই গিয়াসুদ্দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহরূপে। সম্রাটের 'মালিক'দের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে ছয় বৎসর পর পর রাজত্ব করল দুজন অপদার্থ সুলতান, যারা আপন অক্ষম শাসনের দ্বারা দেশকে পৌঁছে দিল অরাজকতার প্রায় প্রান্ত সীমানায়। গিয়াসুদ্দিন তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। এমন সময় খসরু খান নামক এক ধর্মত্যাগী অন্ত্যজ হিন্দু দখল করল দিল্লির

সিংহাসন। গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্জাব থেকে দিল্লি, পরাজিত ও নিহত করলেন খসরু খানকে, সগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তক্তে।

গিয়াসুদ্দিনের দৃঢ়তা ছিল শক্তি ছিল, রাজ্যশাসনের দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের অসাবধানী রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর। সুলতানের কানেও পৌঁছল সে ভিত্তিহীন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তাঁর সিপাহসালারকে, "লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ করেছে, কাজেই আমি তাদের সত্যি কবরে পাঠাতে চাই।" অগণিত হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটল নিমেষে। গোরস্থানে শবভুক পশু-পক্ষীর হলো মহোৎসব।

কিন্তু গিয়াসুদ্দিনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দিন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন করলেন নূতন নগর, তৈরি করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরদ্বারে দুর্জয় দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত আর একদিকে প্রাচীর বেষ্টিত নগরী, মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই জলাশয়ে ; সংবৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।

ফকির এবং সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর-নির্মাণ, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ করেই।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীঘি কাটাতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লিতে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত, দু'জায়গায় প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ চাইবেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণ অপেক্ষা করুক ফকিরের খয়রাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তালাও। সুলতান হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—'তবে রে—'

কিন্তু তাঁর ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এত্তালা এল আশু কর্তব্যের। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য সামন্ত নিয়ে।

শাহজাদা মহম্মদ তোগ্‌লক রইলেন রাজধানীতে রাজ-প্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিবারাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকাবাদের নগর-প্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গণনা করল নিজামুদ্দিনের অনুরাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন,—"দিল্লি দূর অস্ত্।" দিল্লি অনেক দূর।

প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তরা অনুনয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন,—দিল্লি দূর অস্ত্।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য প্রশিষ্যেরা অনুনয় করল সন্ন্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তাঁর সে কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠল বারংবার। স্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—"দিল্লি হনুজ দূর অস্ত্"। দিল্লি এখনও অনেক দূর। হাতে জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ মণ্ডপ। কিংখাবের সামিয়ানা। জরীতে, জহরতে, ঝলমল। বাদ্যভাণ্ড, লোকলস্কর, আমীর ওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তিযূথের প্রদর্শনী-প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোধূলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মণ্ডপে। প্রবল আন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনান্তে অতি বিনয়াবনত কণ্ঠে মহম্মদ অনুমতি প্রার্থনা করলেন সম্রাটের। জাঁহাপনার হুকুম হলে এবার হাতির কুচকাওয়াজ শুরু হয়, হস্তিযূথ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে।

মহম্মদ মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

কড় কড় কড়ড় কড়াৎ।

একটি হাতির শিরসঞ্চালনে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ। মুহূর্ত মধ্যে সশব্দে ভূপতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের থাম। চাপাপড়া মানুষের আর্ত কণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রির আকাশ। ধূলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তিযূথের গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করল বাদশাহের।

পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ভগ্নস্তূপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধ করি আপন দেহের বর্মে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

প্রমত্ত ঐহিক ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপুত্র গিয়াসুদ্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগরপ্রান্তে। দিল্লি রইল চিরকালের জন্য তাঁর জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

দিল্লি দূর অস্ত। দিল্লি অনেক দূর।

চার

নিজামুদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করে আজও প্রথমেই চোখে পড়ে আউলিয়া খনিত পুকুর। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশস্ত চত্বরে যার মাঝখানে সমাধিস্থ হয়েছে ফকিরের দেহ। সমাধির উপরে ও আশেপাশে হয়েছে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ। উত্তরকালে সম্রাট সাজাহান সমাধির চারদিকে ঘিরে তৈরী করেছেন শ্বেত পাথরের বিলান; প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করেছেন সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে। দ্বিতীয় আকবর রচনা করেছেন সমাধির উপরিস্থ গম্বুজ। ফকিরের পুণ্য নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধন্য জ্ঞান করেছেন।

গিয়াসুদ্দিনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বি বি সি আই রেলওয়ে লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং টুরিস্টদের দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ তার গুরুত্ব। নিজামুদ্দিনের দরগায় আজও মেলা বসে প্রতি বছর। দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যকামীরা আসে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। সেদিনের রাজধানী তার অভ্রভেদী অহংকার নিয়ে বহুদিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আকর্ষণ দূরকালে প্রসারিত।

হিন্দুর অন্তিম অভিলাষ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা—ন্যায় শত শত বর্ষ ধরে দিল্লির বিত্তশালীরা কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিস্থ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে 'পীর মজলীসে'র সান্নিধ্য। তাই তার আশেপাশে আছে সংখ্যাতীত আমীর ওমরাহের সমাধি। তারই মধ্যে একটি গর্ভে আছে কবি আমীর খসরুর দেহাবশেষ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর; খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। দিল্লির কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আলাউদ্দিন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল গভীর। আপন অনুপম ছন্দে গ্রথিত করে খিজির খানের বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি কালজয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একনি কবি রয়েছে চিরনিদ্রিত, যাঁর রচনা আজও উর্দু সাহিত্যে অজাতশত্রু। কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর-বেদিকায় মাত্র আবৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্য অম্লান রেখেছে তাঁর স্মৃতি, কাব্যে ও গাথায়। জগতে বহু ঐশ্বর্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিন্তু কবি'পরে ভার থাকে নিজ মেমোরিয়্যালের।

হিন্দু যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী। তাই শ্মশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করার কথা কখনও তাদের মনে হয়নি। মৌর্যরাজদের আমল থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজা রাখেননি কোনো স্মৃতি-সৌধ। রাজপুত রাজন্যেরা গড়েননি কোনো এতমদ্দৌলা, সফদারজঙ্গ বা হুমায়ুন'স টুম্ব। তাঁরা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাহ্মণকে। সমস্তই জগৎ-হিতায় অশোক যে স্তম্ভ রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি ঘোষণার জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিহার সঙ্ঘের জন্য, শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্তচর্চার মানসে।

সে যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে ঊর্ধ্বমুখীন। ঐহিক সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কান্তা কস্তে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী? ময়াময়মিদম অখিলং বিশ্বম্। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহধর্মিণী। নারী যে সহমৃতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ংবরা যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য যেমন একালের তরুণীরা আংটি পরিয়ে দেন আই· সি· এসের অঙ্গুলিতে।

মুসলমানেরাই আনল ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে থোড়াই পরোয়া করল, ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদল, কাঁদালো এবং ভালোবাসল। তাই নারীর জন্য করল লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেউস্কা বা লেডি হ্যামিল্টন?

মুসলমানেরা প্রিয়তম প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে। হিন্দু তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত; এই দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ। একটিকে বাদ দিলেই পাকিস্তান,—মিস্টার মহম্মদ আজি জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসহচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্মর সমাধির প্রতি। সেই সম্রাটদুহিতা জাহানারার।

ইতিহাসে সম্রাট আলমগীরের শাসন বিধর্মী নির্যাতনের দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন; সে-তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিত-বিক্রম যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দুটি বিশিষ্ট উপদ্রুতা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথোচিত বিদিত নয় জগতে। জাহানারা ও জেবুন্নেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অনূঢ়া, অপর জন আত্মজা, দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেরই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগৃহে।

কিন্তু আরও এক জায়গায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তারা দু'জনেই ছিলেন কবি। মুঘল যুগের মহিলা কবি।

জাহানারার সমগ্র রচনা সযত্নে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন। দু'একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। জেবুন্নেসার কাব্যখ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। 'জেব উ-মুনশোয়াতে' সত্যিকার কাব্যপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পার্শী কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে মখ্‌ফীর' রচয়িত্রীরূপেও জেবুন্নেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

জাহানারা আমাকে আকৃষ্ট করেছেন শৈশব থেকে। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বক্ষণে সন তারিখে কণ্টাকাকীর্ণ মুঘল কাহিনী কণ্ঠস্থ করার দুরূহ প্রয়াস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়িয়ে, দেহ হত অলস, মাথা ঝিমিয়ে পড়তো ঢুলুনিতে। এরই মধ্যে জাহানারার উপাখ্যান পড়ে কল্পনায় আঁচ করার চেষ্টা করতেম তাঁর চেহারা।

প্রথম যৌবনে জাহানারা বাদশাহ-বেগমের মর্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য। অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তরা। তাঁর জন্য সম্রাট তৈরি করেছিলেন দিল্লির জুম্মা মসজিদ, ভারতের বৃহত্তম মুসলিম ভজনালয়।

জাহানারার স্নেহভাজন ছিলেন এক বাঁদী। অতর্কিতে একদিন আগুন লাগল তার বসনে। সে আগুন নেভাতে গিয়ে শাহজাদী নিজে দগ্ধ হলেন সাংঘাতিকরূপে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এল হাকিম, হলো নানারকম এলাজ। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সম্রাটনন্দিনীর জীবন সংশয় দেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এত্তালা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে। গ্যাব্রিয়েল বাউটন। সুরাটে ইংরেজ কুঠির ডাক্তার। বাউটন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিনীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদ্‌রা হতবাক হলেন। বলে কি বেয়াদব! শাহানশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না কম্‌বক্ত?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃস্নেহ জয়লাভ করল সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রস্তাবে। অল্পকাল মধ্যে আরোগ্যলাভ করলেন জাহানারা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে।

আভূমিনত কুর্নিশ করে বাউটন বললেন, নিজের জন্য কিছুই চাইনে। কলকাতার একশ' চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠি নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করি একটুকরো ভূমিখণ্ড। ইংরেজকে দান করুন এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

বাউটনের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। স্বজাতিহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাইম ভাইজমানের।

উনিশ শ' ষোল সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্কটজনক কাল, ইংলন্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন, তথাস্তু।

দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ? অর্থ?

"কিছু নয়। একটি মাত্র বাঞ্ছা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইহুদীদের ন্যাশনাল হোম।"

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান। অবশ্য কাগজেপত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইহুদীদের। বরং ইসরাইল কনসার্ভেটিভরা প্যালেস্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছে সুয়োরানী, মধ্য প্রাচ্যে ইংরেজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নেই ইংরেজের চরিত্রে।

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতো বিস্মিত হইনে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে স্ট্যাফোর্ডশায়রে বাড়ি হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সবচেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমেরীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ তাঁর জন্ম গোরখপুরে।

জাহানারার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁর অনুরক্তি ছিল খ্রীস্ট ধর্মে। সেটা মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তার কারণ নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লি অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা তাঁকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা চাতুরীময় পৃথিবীর কোনো কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা দু'জনে মিলে দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোকগত হন—আল্লার দোয়ায় তিনি যেন সেরে ওঠেন—তবে দিল্লির সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের। মদ্যপ মোরাদের প্রতীতি হলো এই আশ্বাসে। দা... পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে, এক উৎসব রজনীর অবসানে সুরামত্ত মোরাদ হলো বন্দী, আওরঙ্গজেব নিজেকে ঘোষণা করলেন সম্রাটরূপে। পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবদ্ধ করলেন আগ্রা দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

আওরঙ্গজেব জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন বাদশাহ্-বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। স্বেচ্ছায় বরণ করলেন সাজাহানের সহ-বন্দীত্ব। পিতার পরিচর্যার জন্য। চতুর্দিকে ক্রূর প্রবঞ্চনা, সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রইলেন অচল, অটল, অকম্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। সাজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রোশেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। দিল্লির সিভিল লাইনসে আছে তাঁর উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোশেনারা ক্লাব, দিল্লির মস্টিকার্লো। দশ টাকা পয়েন্টে স্টেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উত্তর ভারতে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড় ঋতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঞ্জন আহুতি নিয়ে। বর্ষার মেঘকজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে। বর্ষণমুখর রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল্ল ভবনশিখীরা নৃত্য করে প্রসাদের মর্মর অলিন্দে। শরতের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনের লাগে দোলা। হেমন্ত আনে কুহেল ; শীত দেয় হতাশ্বাস। বসন্তে ফুলের মঞ্জরী আন্দোলিত হয় শিরীষের শাখা প্রশাখায়। আগ্রার প্রাসাদ প্রাচীরের অন্তরালে জাহানারার বন্দী জীবনে একটি করে বৎসর হয় বদ্ধি, আয়ু থেকে খসে পড়ে একটি করে বছর। কর্মহীন অবসরে শাহজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিশীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের কাছে এসে পৌঁছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার। তবে কি অনুতপ্ত পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম নিদর্শন ? আগ্রহকম্পিত হস্তে বৃদ্ধ সাজাহান খুললেন মোড়ক। পরতের পর পরত। খুলতে খুলতে শেষকালে হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারাশিকোর খণ্ডিত মুণ্ড। সম্রাট মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জাহানারার অঙ্কে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাহানারা রইলেন তাঁর পাশে। হুবির পিতার পরিচর্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্যে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লিতে।

অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্তশীতল ক্রোড়ে মুক্তি লাভ করলেন বন্দিনী। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধির

উপরে না রইল মণ্ডপ, না রইল আচ্ছাদন, না রইল ঐহিক ঐশ্বর্যের লেশমাত্র আভাস। শুধু তাঁরই স্বরচিত একটি কবিতা উৎকীর্ণ হলো তার গায়ে,—

"বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গড়িবান্ হামিন্ গিয়াহ বসস্ত্।

"একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।"

পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামিনী সাজাহান দুহিতা নশ্বর জাহানারার এই তো যোগ্য সমাধি।

আসন্ন সন্ধ্যায়াস্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে, সামনে এসে দাঁড়ালেম আমরা তিন দর্শনার্থী। কারো মুখে ছিল না কথা, কিন্তু মনে ছিল ভার।

নব শ্যাম দূর্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধি। নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণ রেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে সমাধিস্থ সেই অঙ্গের ললিত সুবাস? পায় তাঁর সুকুমার বক্ষের নীচে ভক্তিনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন ধ্বনি?

পাঁচ

প্রভাতের সবচেয়ে বড় সেন্সেশন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ক্রীপস্ প্রস্তাবের সারমর্ম। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া বিবরণ। শোনা গেল, গভর্নমেন্ট বিচলিত হয়েছে এ সংবাদ প্রকাশে। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা তদন্ত শুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কারণ প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমরা সবাই পেয়েছিলেম গত ক'দিন ধরেই। প্রকাশ করা হয়নি, জেন্টলম্যান্স এগ্রীমেন্ট স্মরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সংবাদদাতারা অনুমান করলেন, ভাইসরয়'স কাউন্সিলের কোন মহামান্য সদস্যের কাছ থেকে বেরিয়েছে এ খবর।

জনশ্রুতি এই যে, ক্রীপস্ যে-দিন এলেন, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহারে ভাইসরয়'স হাউসে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এই মাননীয় সদস্যগণ। বেলা দুটোয় এলেন ক্রীপস্। লর্ড লিনলিথগো আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সারিবন্দী দণ্ডায়মান নিজ সহকর্মীদের। ক্রীপস্ করমর্দন করলেন সবার সঙ্গে, নিরাসক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, "হাউ ডু ইউ ডু?" দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন আপন নির্দিষ্ট কক্ষে।

তাঁর আশা করেছিলেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ক্রীপস্ তাঁর প্রস্তাব আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে, জানতে চাইবেন তাঁদের অভিমত। সেদিক দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবের সারমর্ম অনুদ্ঘাটিত রইল তাঁদের কাছে। আশ্চর্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেও, হাজার হোক, মানুষের শরীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসরয়ের সুপারিশে বিগত রাত্রে লাট প্রসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় ক্রীপস্ তাঁর প্রস্তাবের চুম্বক জানিয়েছেন তাঁদের। আজই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোর্টারের জবানীতে ঘটল তার প্রকাশ। ধূম দ্বারা যদি পর্বতের বহ্নি অনুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ 'স্কুপ' করার অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিন্তু তারও একটা অলিখিত মাত্রা আছে। জাতির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে সাংবাদিকের আপন বিবেক সেন্সর করে তার কপি। এডোয়ার্ড দি এইট্থের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে সুস্পষ্ট। মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল সংবাদপত্র জানতো সিম্পসন-এডোয়ার্ড প্রণয়-কাহিনী। ফ্লীট স্ট্রীটে কানাঘুষায়

শুনেছেন অনেকেই। কেউ প্রকাশ করেনি মুদ্রিতাক্ষরে। সরকারী দপ্তরের কোনো অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোনো আইনগত বাধা। একদিন জার্মানীর বিরুদ্ধে সেকেণ্ড ফ্রন্ট হবে। কোথায়, কোনখানে করবে মিত্রশক্তি আক্রমণ সে-তথ্য জানা হয়ত সম্ভব হতে পারে স্টুয়ার্ট গেস্তার বা ডু পিয়ার্সনের। তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সংবাদ, যদিও ক্রীপস্ প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় 'স্কুপ' নয়।

সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন সততার। ক্রীপস আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলেম বিনা প্রতিবাদে। পূর্ব প্রকাশের দ্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে প্রতিশ্রুতি। তাই লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেন্টল্‌ম্যানরা যদি জার্নালিস্ট হতে পারেন, জার্নালিস্টরা জেন্টল্‌ম্যান হতে পারবেন না কেন?

ভাইসরয়'স হাউস থেকে ক্রীপস্ এসেছেন তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার এণ্ড্রু ক্লো-র বাংলোয়। ক্লো আসামের আগামী গভর্নর। গদি দখলের আগে দু'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন মুসৌরী না আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারদের বাড়িগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ঈষৎ পীতাভ রং; সামনে অতিবিস্তৃত অঙ্গন। এত বড় যে দু'দিকে গোলপোস্ট খাড়া করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন-মোর দিয়ে পরিপাটি ছাঁটা। মাঝখানে বৃত্তাকার ফুলের কেয়ারী। তাকে বেষ্টন করে টকটকে লাল সুরকির রাস্তা; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এতটুকুও। ফটকের গায়ে একপাশে কাচের উপরে বড় হরফে লেখা বাড়ির নম্বর। কাচের একদিকে ছোট্ট একটু খুপরি। রাত্রিবেলায় তাতে লণ্ঠন জ্বেলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ির নম্বরটা চোখে পড়ে। দালানের সম্মুখে পোর্চ, তার নীচে গাড়ি দাঁড়ায়। বারান্দার দু'পাশে দুটি ছোট কুঠুরী। সেখানে অনারেবল মেম্বারের সেক্রেটারী ও স্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

হুবহু একই ধরনের ছ'টি বাড়ি। সেক্রেটারিয়েটের সুমুখ থেকে দুই বাহুর মতো দু'দিকে প্রসারিত দুটি রাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন ছ'টি যমজ ভাই, ডিয়োনি কুইন্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশয্যের দ্বারা অত্যন্ত ভালো জিনিসকেও যে কতখানি হাস্যকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত আছে নয়াদিল্লীর নগরপরিকল্পনায়। য়ুনিফর্মিটির বাতিকে পাওয়া স্থপতিরা শহরটাকে শ্রী দিতে গিয়ে ছাঁচ দিয়েছেন, বাড়ি দিতে গিয়ে ব্যারাক। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মূলগত ঐক্য প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গজ, ফুট বা ইঞ্চি মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবিশি। প্রথমটা যিনি করেন তাঁকে বলি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টা যিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেরটার মধ্যে আছে ক্রাফট।

পুরাকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি ও অভিরুচি অনুসরণ করে গড়ে উঠতো জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরা তুলতো সৌধ, সাধারণেরা বাঁধতো বাসা, শ্রেষ্ঠিরা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে রাজধানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্যয়, নগর নগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি। আগ্রা, আওরঙ্গাবাদ ও ফতেপুর সিক্রিতে আজও রয়েছে তার নির্ভুল নিদর্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্য-বিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এ-যুগের মহানগরীর centre of gravity থাকে ক্লাইভ স্ট্রীটে বা হুনবি রোডে। তাদের প্রেরণার মূল চেম্বার অব প্রিন্সেস নয়, চেম্বার অব কমার্স। তাই ওয়াশিংটনের চাইতে নিউইয়র্কের গুরুত্ব হয় বেশী, লক্ষ্ণৌকে ছাপিয়ে ওঠে কানপুর, পাটনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টাটানগর।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রভুত্ব নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুধের পরিবর্তন ঘটেছে। মডার্ন ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসিজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা ব্যূহ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই রুলমাফিক। আধুনিক ক্ষত্রবীরেরা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত এবং চুল দুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দেশ হলো precedent। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর সব কিছুরই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে শুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টার, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুই যেন খাকী কোর্তা-পরা পল্টনের মতো সঙ্গীন উঁচিয়ে এটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন আস্তানায় ক্রীপসের সভা বসল পাত্র-মিত্র নিয়ে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, এবং ক্যানাডার সমাজতন্ত্রী গ্রেহাম স্প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কুপল্যান্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লন্ডনের এক বিতর্ক-সভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, ঔদার্য আছে কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন মৌলানা আজাদ, গান্ধীজি, পন্ডিত নেহরু ও মিস্টার জিন্না। আজাদের সঙ্গে দোভাষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর একজন কংগ্রেসী মুসলমান। ব্যারিস্টার মিস্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ, কর্মস্থান দিল্লী, শ্বশুরবাড়ি বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অরুণা আসফ আলীর পৈতৃক উপাধি ছিল গাঙ্গুলী, অতি নিকট আত্মীয় সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বহুবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তুল্য ইংরেজী রচনাকুশলী বড় বেশী নেই, একথা স্বীকার করেছেন বহু ইংরেজ সমালোচক। গান্ধীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্যপ্রধান নয় কিন্তু তার স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিস্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয় নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয় উর্দুতে। যদিও কাজ চালাবার মত ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার; মৌলিকতা আছে মৌলানার। তার জয় হোক।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়, কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিখতে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়ত লাভই আছে। স্বাজাতিকতার আধুনিক ধারণা, ইংরেজীতে যাকে বলে ন্যাশন্যালইজম্, তার বেশীটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার মাপকাঠিও দাঁড়িয়েছে ইংরেজী বলা ও লেখার কৃতিত্বে। এটা হাস্যকর। কলেজে পরীক্ষার খাতায় যে-ছেলে ভালো ইংরেজী লেখে, চাকুরির বাজার থেকে বিবাহযোগ্যা কন্যার উদ্বিগ্না জননী পর্যন্ত সর্বত্র তার আদর আছে। এ-দেশের নেতাদের সম্পর্কেও তাই বিদেশী পর্যটকেরা যখন বলেন যে he speaks faultless English আমরা তখন আনন্দে গদগদ হই। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সতেজ প্রতিবাদ আছে মৌলানা আজাদের আচরণে। ক্রীপস্ই হোন, ভাইসরয়ই হোন, কিংবা স্বয়ং জর্জ দি ফিফথই হোন, যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাষা না বলতে চান বা না পারেন তবে আমিই বা তাঁর ভাষা বলতে যাব কেন? সাবাস!

গান্ধীজি ক্রীপসের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রায় তিন ঘন্টা পরে। তাঁকে বারান্দার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস্। মুহূর্তমধ্যে সাংবাদিকেরা চক্রব্যূহ রচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। চোখে তাঁদের জিজ্ঞাসা, মুখে তাঁদের আগ্রহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগের ছাপ। স্মিতহাস্যে উদ্বেল জনতাকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত করলেন বহু উদ্যত প্রশ্ন।

ক্রীপসের রসবোধ আছে। রহস্য করে বললেন, গান্ধীজির হাসি দেখে সাংবাদিকরা যেন ক্রীপস্ প্রস্তাবের গুণ বিচার না করেন। ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক এবং বীমার দালালের চাইতেও নাছোড়বান্দা আছে জগতে।

তার নাম রিপোর্টার। গান্ধীজির আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তাঁরা। অঙ্গুলিনির্দেশে ক্রীপস্‌কে দেখিয়ে উত্তর করলেন মহাত্মা, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছু বলার নেই।"

"প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক?" প্রশ্ন করলেন এক কানু সাংবাদিক।

"You naughty boy" বলে প্রসন্ন হাস্যে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্ত করে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিড়লা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিচ্ছি আমরা রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প আপিসের কর্তা জগদীশ্‌ নটরাজন, ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার এর প্রতিষ্ঠাতা বম্বের বিখ্যাত সাংবাদিক কে· এস· নটরাজনের পুত্র। পাইওনীয়রের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গভর্নমেন্টে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন স্বচ্ছন্দে, উচ্চারণে নেই তামিলজনোচিত ধ্বনিবিকৃতি। একদিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর গৃহে।

নটরাজন গৃহিণী মাদ্রাজী নন,—এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তাঁর পিতৃকুল বহু পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের মূল অনুসন্ধান করা যায় বঙ্গদেশে। তাঁর মাতামহী ব্যানার্জী-কন্যা ছিলেন, সে হিসাবে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলীন্যে দাবী আছে। পিয়ানো বাজাতে পারেন চমৎকার।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙালী পরিবারেও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যার্জন করেছেন বিদেশে। অক্সফোর্ডে ইংরেজী, গ্লাসগোতে এঞ্জিনিয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা লিঙ্কনস্‌ ইনে ব্যারিস্টারী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কর্মজীবনে, অর্থার্জন করেছেন অজস্র ধারে। তাঁদের বসনে স্যুট, অশনে সুপ এবং আসনে কৌচ। তাঁদের গৃহিণীরা পার্টি দেয়, ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে পুরুষ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অসঙ্কোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেমসাব, এবং মেয়েরা মিসিবাবা।

বিলাতে না গিয়ে যাঁরা সাহেব, তাঁরা আরও দুর্ধর্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোডকে করেন আউটহিরোড। স্লিপিং পায়জামা না পরে ঘুমানো বা ছুরিকাঁটা দিয়ে না খাওয়াকে তাঁরা প্রায় মধ্যযুগের গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহর্ষক বর্বরতা জ্ঞান করে থাকেন।

তবুও একথা মানতে হবে যে, ইংরেজ অথবা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল থেকে যেমন নিঃশেষে উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙালী গৃহিণীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রং করা ঠোঁটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে Coty বা ম্যাকস্‌ফ্যাক্টর-ঘষা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুরমা দিদিমাদের অন্ধবিশ্বাসের রেড কর্পাসল। তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোঁজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অসুখে লুকিয়ে মানত করেন সুবচনীর, ছেলের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলে যতই খান স্টেক বা ভিল, মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেন গুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগ্য ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্যুত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জিত। তারা না ভারতবর্ষের, না ইংলন্ডের। কোন দেশের প্রতি তাদের দেশাত্মবোধ জাগবে, কোন জাতির প্রতি মমত্ববোধ? তারা বাবার কাছে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছে থেকে পাবে গায়ের রং, কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব? তারা সত্যিকার বর্ণসঙ্কর, শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। ভারতীয়-য়ুরোপীয় বিবাহজাত সন্তানেরা আজ পর্যন্ত হয়নি কোনো উঁচু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোর রেলের বড় সাহেব নয় তো টেলীগ্রাফের ডিরেক্টর।

য়ুরোপের সমাজ অনেকটা সার্বজনীন। ইংলন্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত মোটামুটি তার একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র য়ুরোপে লোক ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, খায় ছুরি কাঁটায়। থিয়েটারে যায় শনিবারে রাত্রে, গির্জায় জানুপেতে ভজনা করে রবিবারে। ভাষার বিভেদ ছাড়া য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সামাজিক মিল আছে সর্বত্র। লন্ডনের ইংরেজ স্বামীর অষ্ট্রিয়ান স্ত্রীকে দেখেছি অন্য আর পাঁচজন ইংরেজ গৃহিণীর মতো অনায়াসে সমাজে প্রতিষ্ঠিতা। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ পরিবারের নেই তফাত। ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিক, পল বা হ্যারিংটন পুত্র-কন্যার মতো।

অবশ্য সমস্যা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্যা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষগোচর নয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মনে। যেমন লর্ডসে টেস্ট ম্যাচের সময় কোন পক্ষের এ্যাশেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী? মহাযুদ্ধে কার জয়লাভে উৎফুল্ল হবে জার্মান মিস্টার, কোন পক্ষের পরাজয়ে মুহ্যমান হবেন তাঁর রাশিয়ান মিসেস? তবুও দূর ভবিষ্যতে কোন দিন য়ুনাইটেড স্টেটস অব য়ুরোপ যদি গড়ে ওঠে, যদি সম্ভব হয় এক কথা ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ। তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোন্নগরের কনেকে ঘরে নিয়ে আসে বরিশালের বর।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জীবনের মর্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রীপুত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। বহু আত্মীয়-পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের দ্বারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দূরপ্রসারিত। তাই পূর্ব পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু তা দ্বারা কোনোকালে ঘটবে না দুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। য়ুরোপের স্ত্রীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে পরস্ত্রী।

নটরাজনের ভোজ সভায় পরিচয় ঘটল এক মারাঠি ব্রাহ্মণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের অনেক উপরে, মাথায় কালোর চাইতে সাদার ছোপ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য তাঁর চোখ দুটি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার অর্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আষাঢ়ের জলভারনত ঘনমেঘের মতো কালো গম্ভীর ছায়া। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না পুরুষের এমন অসাধারণ চোখ।

কিন্তু নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে চারুদত্ত আধারকারের খ্যাতি পানীয়ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ হুইস্কি পান করতে পারেন অবলীলাক্রমে। চোখের পাতা কাঁপবে না এতটুকু। সেটা অদ্ভুতপূর্ব নয়। আরও দু'চার জন পারেন তা। কিন্তু আধারকারের কৃতিত্ব শুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্‌ভাবনেও। সংখ্যাতীত মিক্সিং জানা আছে চারুদত্তের। ককটেল তৈরীর বহু পদ্ধতি তাঁর নখাগ্রে। ডিনারে, পার্টিতে নিমন্ত্রণকারিণীরা আগে ভাগে পরামর্শ করেন আধারকারের সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্রণা দেন তিনি। "কে কে আসছে, কতজন আসছে? যদি তিন রাউন্ডেই ঘায়েল করতে চাও, তবে প্রথমে দাও রাম অরেঞ্জ, তারপর জিন অ্যাণ্ড লাইম। তারপর হুইস্কি। মেয়েদের জন্য মাঝখানে ব্রাণ্ডি মিতে পার জিঞ্জারেলের সঙ্গে মিশিয়ে। কী বললে, রাম-অরেঞ্জ কেমন করে করবে জানো না! হোয়াট এ পিটি! আচ্ছা শিখিয়ে দিচ্ছি। shaker-এর মধ্যে সিকি ভাগ নাও ইটালিয়ান ভারমুথ। ইটালিয়ান নেই? আচ্ছা অভাবে ফ্রেঞ্চই দাও। মেশাও সিকি ভাগ কমলালেবুর রস, অর্ধেক ঢালো রাম। বেশী করে বরফ, আর সামান্য একটু দারুচিনির রস। ব্যস। আচ্ছা করে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর।"

নটরাজন গৃহিণী বললেন, "মিনি সাহেব, (আমার মিনি সাহেবের নামটা সেন সাহেবের অন্দরমহল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে বন্ধুজনের সকৌতুক সম্বোধনে) যদি নতুন নতুন

ককটেল চাখতে চান তো মিস্টার আধারকারের বুদ্ধি নেবেন।"

স্মিত হাস্যে আধারকার বললেন, "হ্যাঁ, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিগুলোর পেটেন্ট নেবো ভাবছি। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো—If it's a drink, consult আধারকার। ঘরে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারিতে থাকবে আধারকার'স বুক অব ড্রিঙ্কস্।"

কিন্তু আমার জন্যে এ সবের চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ভোজন পর্বের শেষে অতিথিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন আধারকার। দরবারী কানেড়ার সুর। গৎ নয়, শুধু আলাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব দক্ষতায়। বাজনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "বলতে পারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেম খানিকক্ষণ, উত্তর দেওয়ার কথাই মনে রইল না। পরিষ্কার বাংলা।

"কী, একেবারে থ' হয়ে রইলে যে?" এবারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেম, "আপনি আশ্চর্য। বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

"একি একটা প্রশ্ন? তুমি ইংরেজী শিখেছ কেমন করে?"

"আমি শিখেছি পেটের দায়ে।"

"আমি শিখেছি প্রাণের দায়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়, curiosity is a feminine vice."

বিদায় দেওয়ার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিনি সাহেব, তুমি বলছি বলে চটোনি তো মনে মনে? তুমি তো বয়সে অনেক ছোটই হবে। আমি থাকি রটেণ্ডম রোডে, বাইশ নম্বর। এস একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনাবো, আর দেব টপ-হ্যাট। টপ-হ্যাট জানো তো? জানো না? অর্ধেক জিন, সিকিভাগ ফ্রেঞ্চ ভারমুথ, সিকিভাগ ইটালিয়ান। একফোঁটা বিটার্স, তার সঙ্গে খুব খানিকটা বরফ।"

আধারকারের বাড়িতে গেলেম। টপ-হ্যাটের লোভে নয়, লোকটির আশ্চর্য আকর্ষণে। একদিন গেলেম, দু'দিন গেলেম। তারপর প্রত্যহ। কখনও বা সকালে এবং বিকেলে। অনেকদিন ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবই সমাধা হয়েছে তাঁর ওখানে। অল্প সময়ে আন্তরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে, আধারকার পুরুষ না হলে নিশ্চয়ই কুৎসারটনায় কলঙ্কিত হতে পারতো আমার নাম। তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সত্বরপর বর কল্পনা করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অলস মধ্যাহ্নে।

কিন্তু কন্যা দূরে থাক, কন্যার জননীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গৃহে। গোটা তিন চার চাকর, বেয়ারা খানসামা নিয়ে আধারকারের হোম গভর্নমেন্ট। তার একমাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের ভার তাঁর নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিস্লেটিভ, মায় জুডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। খাঁটি প্রজাতন্ত্র। মজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই ভৃত্যদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম, ওয়র স্ট্র্যাটেজী, মায় সিনেমা স্টার পর্যন্ত। কোন বিষয় বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে হয় কাব্যালোচনা। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ আধারকারের কণ্ঠস্থ। গভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "বল, কোথায় আছে?" বলতে পারলে বলেন, "সাবাস্, Now you have earned a drink, নাও একটা অরেঞ্জ গিমলেট—খানিকটা জিন ও কমলালেবুর রস। এই বয়, সাবকোবাস্তে—" কোনো দিন বলেন, "আজ পরীক্ষা। বল, কোথায় আছে—আমারে যে ডাক দেবে তারে বারবার এ জীবনে ফিরেছি ডাকিয়া; সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।"

"পারলে না? আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু পারলে না, হাঃ, হাঃ, বাঙালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজিতে অবাঙালীর কাছে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কী যে? আচ্ছা আগে মাথা সাফ্ করে নাও। বয়,—লাও একঠো বুকলীন। একটা টাম্বলারে অর্ধেকটা বরফের টুকরো, কিছুটা ফ্রেঞ্চস্টাইল ভারমুথ, কিছুটা ড্রাই জিন্। আচ্ছা করে নেড়ে দুফোঁটা অরেঞ্জ বিটার্স।

ডিপ্লিসস্।"

একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কখনও ?"

"না।"

"বল কী হে, ছুয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা বিশ্বাস করবে কে ?"

"বিশ্বাস করা উচিত। There are more things in heaven and earth..."

"কিন্তু There are more girls in Piccadilly and Liecester Square-ওতো বটে।"

"আসল কথা কী জানেন ? প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড্ড বোকা বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি। সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি।"

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার। "বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ, হাঃ, Just imagine প্রেমে না পড়ার কারণ। বার্নার্ড শ' এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। তুমি একটি genius। না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না। Try রাম ব্রুইয়ট। চার চামচে রাম, এক চামচে লাইম, এক রত্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে। ওয়াণ্ডারফুল।"

দিনের পর দিন বাড়ে বিস্ময়। ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি। আশ্চর্য এর জীবন। কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর। বেশীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয়। অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কখনও। দম্ভ করে বলেন, "মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয্যে লিখেছেন,—যে মদ খায় সে কোনো দিন না কোনো দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয়। যে অস্বীকার করে সে হয় মিছে কথা বলে, নয় তো মদের বদলে জল খায়। শরৎ চাটুয্যে দেখেননি চারুদত্ত আধারকারকে। দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন।"

স্ত্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে। কিন্তু আত্মীয়, পরিজন ? কারও জানা নেই কোনো তথ্য। হাসিতে, খুশিতে, গল্পে, গুজবে, সরগরম রাখেন মজলিস, মুখরিত করেন নিজ গৃহের প্রাত্যহিক বন্ধুসমাগম ; তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এহ বাহ্য। কী এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ ভারানত নয়নের অন্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার,—

আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল ;
বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল।

ছয়

দু'জন ইংরেজ একত্র হ'লে গড়ে একটা ক্লাব, দু'জন স্কচ একত্র হ'লে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, দু'জন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দু'জন বাঙালী একত্র হ'লে করে কী ? দলাদলি ? তা করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিন্তু তাছাড়া আরও একটা জিনিস করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ি। উত্তর ভারতের এমন শহর দুর্ঘট যেখানে বাঙালী আছে কিছু সংখ্যক অথচ কালীবাড়ি নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালীমূর্তিটি সুখদৃশ্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর সুষমা বা কমলাসনা লক্ষ্মীর শ্রী নেই তাঁর মসীকৃষ্ণ দেহে। ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিন্তু কালীমূর্তির কাছে তাঁকে অনেক শান্ত ও সুকুমার মনে হয়। কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডের মালা, কটিতে তাঁর ছিন্নবাহুর গুচ্ছ, এক হাতে ধৃত মুক্ত কৃপাণ, আর হাতে দোলে খণ্ডিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনোখানে নেই করুণাভার লেশমাত্র আভাস, নয়নে নেই স্নিগ্ধতার দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ। লোলায়িত রসনা। শ্বদেশীয় ভক্তরা বলেন, মা ভয়ঙ্করা ; ক্যাথারিন মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস।

এই রুদ্র ভয়াল মূর্তিকে ভালোবাসে বাঙালী। শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিস্রোত আনলেন তার চিহ্ন রইল একটি মাত্র বিশেষ শ্রেণীতে। কালীর ভক্তরা আছেন দেশব্যাপী। শুধু শাক্তদের মধ্যেই তাঁর

পূজারীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।পুরাকালে কাপালিকেরা শবাসনে সাধনা করেছে দেবী কালিকার, তান্ত্রিকেরা আরাধনা করেছে শ্যামামায়ের, দস্যুদল লুণ্ঠন মানসে নির্গত হয়েছে নৃমুণ্ডমালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক যুগেও অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙালী মেয়েরা মানৎ করেন মা কালীর কাছে, পল্লীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাসীরা পূজা করে ভক্তিভরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ধ্যান করেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁরই ভজনা করেছেন সাধক রামপ্রসাদ ; রচনা করেছেন অপূর্ব শ্যামা-সঙ্গীত।

বাঙালীর পক্ষে এই কালীপ্রীতি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হবে। তার শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন বাঙালীকে আকৃষ্ট করবে কোমলতার প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি, মাধুর্যের প্রতি,—এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালীকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তার প্রকৃতিকে যাঁরা যথার্থরূপে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন, এই আপাতবিরোধিতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুসুমের মৃদুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। তাই ভীরুতার অপবাদ যেমন তার বহুপ্রচারিত, চরম দুঃসাহসিকতার জয়তিলকও তারই ললাটে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনেরও সংঘাত সংঘর্ষ আজ বহুব্যাপ্ত, আসমুদ্রহিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্ব প্রদেশের সর্বসাধারণ। মারাঠী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী, পার্শী ও বেহারী। ভরেছে জেল, সয়েছে নির্যাতন। কিন্তু স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙালীই সাধন করেছে অগ্নিমন্ত্রের, দিয়েছে দক্ষিণা, জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঋণ। একমাত্র বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্কুলের ছেলে বরণ করেছে ফাঁসি, মেয়েরা ছুঁড়েছে পিস্তল, পলিতকেশ অন্তঃপুরিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলীর আঘাত ?

রিডিং রোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে মিলিত উদ্যোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্য নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজের গর্ব করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বুদ্ধির কর্মনাশা হঠকারিতায় সে কেবলই করে কলহ, ঘটায় ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান,—এ অপবাদ বাঙালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা তার ঋদ্ধি, তার নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বহুজনের সম্মিলিত কর্ম দ্বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙালী—কথাটা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়িটি দেখে মন খুশী হয়। কোনো রাজনাব্যক্তির অনুগ্রহে নয়, নয় কোনো বিত্তশালীর একক অর্থানুকূল্যে, প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত ও সংগৃহীত চাঁদায় গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ।

সরকারী দপ্তরখানায় জীবিকার্জনের তাগিদে উত্তর ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে আয় করেছেন প্রচুর অর্থ, কেউ সাধারণ কেরানীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন। তাঁরা সবাই দিয়েছেন দান,—যেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। অল্প অল্প করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধন্য।

মন্দিরটি পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম জানি নে, কিন্তু প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাহুল্য-বর্জিত, সহজ, সরল গঠন। বড়বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী ঢং-এর অতি আধুনিক স্ট্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মন শুচিতায় ভরে ওঠে।

গুটি কয়েক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলে বিস্তৃত অলিন্দ, ইষৎ উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মন্দির, চারিদিক ঘিরে পথ। সে পথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, দ্বারে লম্বমান ঘণ্টা-ধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নেয় মাথায়। আপন অন্তরের কামনা নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের বাতাস আসতে বাধা নেই একটুকুও। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই অন্ধকার, নেই পুষ্পপত্র ও গন্ধোদকের দ্বারা আর্দ্র অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। একদিকে আরাবল্লী পর্বতের 'রীজ'। পাথরের খাড়া দেয়াল, সিমেন্ট দিয়ে জোড়া। অন্যদিকে রাস্তা এবং রেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান, ছোট্ট একটি কোয়ার্টার মন্দির কর্তৃপক্ষের তৈরী।

দূরদেশে দেবীর নিয়মিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ খুব সহজ নয়। বাঙলা থেকে কাউকে এনে রাখতে হলে চাই তাঁর জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা। তাঁর পরিজন প্রতিপালনের নিশ্চিত আশ্বাস। তাই মন্দিরের কর্তৃপক্ষ পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেন্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। এ যুগে দেবসেবককেও চাকরির ফান্ডামেন্ট্যাল রুলস্ মেনে চলতে হয়।

মানুষের জীবন যখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্য, প্রয়োজন ছিল পরিমিত। সেদিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ছিল না বিত্তের। সে বিদ্যা দান করতো ছাত্রকে, জ্ঞান বিতরণ করতো শিষ্যকে, ভজন পূজন করতো নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে। সে নির্লোভ, নিরাসক্ত, শুদ্ধাচারী, সাত্ত্বিক। সে-দিন বিগত, তার সঙ্গে সে ব্রাহ্মণও তিরোহিত। একালে পুরোহিতেরও সংসারযাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার স্ত্রীর জন্য চাই সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ, ছেলের জন্য মেলিনস ফুড, মেয়ের জন্য হেজলীন স্নো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু যজমানের পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের পূজারীর জন্য রাখতে হয়েছে বিনাভাড়ায় বাসস্থান, তাতে বিজলী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্বল্পবিত্ত বাঙালী পরিবারের উপযোগী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা খুলে রেখে উঠলেম মন্দিরে। অকৃপণভাবে পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্মাল্য ও প্রসাদকণিকা।

কলকাতার মতো মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্যুটপরা বাঙালীর উপস্থিতি এখানকার সমাজে পরিহাসের উদ্রেক করে না। কারণ বসনকে এখানে ব্যক্তির পরিধেয় বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নয়। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু শহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদে মানুষের অবস্থিতির ফলে। এখানে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে। তাদের বেশ, ভূষা, এমন কি বস্ত্র পরিধানের রীতিনীতি সমস্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত, এইটেই তাদের একমাত্র পরিচয়, পরিচ্ছদটা তাদের শীত, আতপ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিপলঢাকা মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয় মহা আড়ম্বরে। বাঙালী ছেলে-মেয়েদের হাতেগড়া কারুশিল্পের প্রদর্শনী বসে। দিনের বেলায় বালকবালিকারা পায় প্রসাদ, নিশাযোগে থিয়েটারে গোঁপ কামিয়ে মিহি স্বরে মেয়ের পার্ট করে সখের দলের তরুণ সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীকীর্তন হয়। শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়েন ও দোহার মিলে গাওয়া হয়। রচনা ভক্তিমূলক, সুর বৈচিত্র্যহীন। তাতে মহাজন পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তিনিবেদনের গাম্ভীর্য ও আবেগ। জিনিসটা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ভক্তিতত্ত্বের দিক থেকে অনাবশ্যক অনুকরণ। সব দিক দিয়েই অসার্থক। কালীর অঙ্গনে রামপ্রসাদী সুরে ভক্তের কণ্ঠে—'শ্মশান ভালো বাসি বলে শ্মশান করেছি হৃদি,' জাতীয় গানই হচ্ছে শেষ কথা।

গানের আসরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটল তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুপ্ত, বয়স পঞ্চাশের ওপরে, শরীর অকৃশ, দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙালীজনোচিত, অডিট একাউন্টস সার্ভিসের লোক। সুদক্ষ অফিসার বলে খ্যাতি আছে সরকারী মহলে। বর্তমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমর্যাদা দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। এঁর আর দু'ভাইয়ের নাম বাংলাদেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। পরীক্ষার আগে এম্ সেনের ইকনমিক্স ও মিহির সেনের সিভিক্স পড়েনি এ-দশকে এমন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেশী নেই। ছাত্রজীবনে সেনগুপ্ত নিজেও প্রথিতযশা ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজীনের তিনি দ্বিতীয় ছাত্র-সম্পাদক।

ভদ্রলোক মৃতদার, অমায়িক এবং নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত। বাঙালীদের সমুদয় ক্রিয়াকর্মে যোগ আছে ঘনিষ্ঠ। কীর্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ফ্লীট ষ্ট্রীটে আছে খবরের কাগজ, সেভিল রো'তে দরজী। নয়াদিল্লীর রিডিং রোডেও তেমনি

মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। শুধু আকারে নয়, গঠন পরিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলতায় এর জুড়ি আছে বলে জানা নেই। দূর দূরান্ত থেকে আসে লোক। শুধু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, খ্রিস্টান। আসে য়ুরোপীয় ও এমেরিকান টুরিস্ট। সকালে সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে খালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতৃনাম চিহ্নিত করে যুগলকিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির যেখানে হিন্দুমাত্রেরই থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড়লাদের আদিবাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, ক'জন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী,—শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শত সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব বাস করেছে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজ। শিরিতে ছিল সম্রাট কুতবুদ্দিন, লাল কেল্লায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক হুনদল, পাঠান, মোগল একদেহে হলো লীন। ভাবীকালের ভারতবর্ষেরও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না ওয়ার্ধা।

উনিশ শ' বত্রিশ সালে শুরু হলো মন্দিরের নির্মাণ কার্য। বহু এঞ্জিনিয়র, বহু কর্মী, শত শত রাজমিস্ত্রী, মুটে মজুর খাটতে লাগলো ছ'বছর ধরে অবিশ্রাম। উনিশ শ' আটত্রিশ সালে সম্পূর্ণ হলো মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার স্থান, ধনকুবের বিড়লা ভ্রাতৃবর্গের জনক রাজা বলদেও দাস বিড়লার নামে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠনভঙ্গিটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। লাল পাথরের চূড়া, ধারগুলিতে আছে গৈরিক। মনে হয় যেন লাল জমিতে গেরুয়া পাড়। রাজপথ থেকে শ্বেত পাথরের অতি বিস্তীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেখান থেকে উঠেছে মন্দির। মেঝে ও দেয়ালে বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের-সমাবেশে রচিত বর্ণাঢ্য আলিম্পন ও পুষ্পসম্ভার। প্রাচীর গাত্রে আছে অজস্র ফ্রেস্কো পেইন্টিং। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সে-সব চিত্র। তাদের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনচাতুর্য প্রশংসনীয়। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ—কোশল মুখার্জি—তিনি বাঙালী; নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার উদ্ভাবক নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর গুপ্ত প্রভৃতির সতীর্থ। বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায়ও আর একজন বাঙালী স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে, এ কথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে আমাদের।

মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ আছে শ্বেতপাথরের। প্রত্যহ অগণিত নরনারীর কুসুমার্ঘে প্রায় আচ্ছন্ন তাঁর চরণ ও পাদপীঠ। দ্বারে লৌহ-পেটিকা, উপরের ছিদ্রপথে ভক্তেরা রাখে প্রণামী। মন্দিরের বাম পার্শ্বে বিরাট ধর্মশালা, সেটি বিড়লা জননীদের স্মৃতিরক্ষার্থে। ধর্মশালার সংলগ্ন নাট মণ্ডপ। তাতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভজন সংগীত করেন সুকণ্ঠ গায়ক। সহস্রাধিক শ্রোতা অনায়াসে বসতে পারে সে সভায়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বাইরে সর্বসাধারণের শ্রবণায়ত্ত করার ব্যবস্থাও নিখুঁত। মন্দির-প্রবেশের বহু দূরে থাকতেই কানে এল সে গান—শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভব ভয় দারুণম।

মন্দিরের পিছনে একটি বৃহদাকার পার্ক। এটি পরবর্তী রচনা। সাধারণ লোকের চমক লাগার মতো অনেক আয়োজন আছে এই পার্কে। পাথরের বিরাটকায় হস্তী, তার শুড় দিয়ে ফোয়ারার জল ঝরছে ঝর ঝর ধারায়। আছে পাথরের কুমীর, তারও মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে জল। ফোয়ারা, পুষ্পবীথিকা, কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি একাধিক আকর্ষণ আছে বালক, বালিকা ও দেহাতীদের। প্রতিদিন অপরাহ্ণ বেলায় ভিড় জমে তাদের। কেউ বসে বিশ্রামবেদীতে, কেউ দোলে দোলনায়, কেউ বা পরিক্রমণ করে এদিক থেকে ওদিক। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি শেঠ যুগলকিশোর। যুদ্ধপূর্বকালের অর্থমূল্যে মন্দির ও পার্কের নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা।

বিড়লা পরিবারের তিনজন, পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি তিনজন এবং স্থানীয়

সনাতন ধর্মসভা থেকে তিনজন মিলে এক ট্রাস্ট। তাঁরাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন মন্দির এবং তার সংলগ্ন উদ্যান, ধর্মশালা প্রভৃতি। আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রতিনিধিরা প্রতি তিন বৎসরান্তে নির্বাচিত হন। ছোটখাটো ব্যাপারেও আধুনিকতার ছাপ আছে।

মন্দির প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে রাখবার ব্যবস্থাটি চমৎকার। সিঁড়ির ঠিক গোড়াতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। দেয়ালে জুতা রাখার র‍্যাক। সেখানে জুতা জমা দিতে হয়। মালিককে দেওয়া হয় সংখ্যাযুক্ত কার্ডবোর্ডের একটি চাকৃতি। অনুরূপ আর একটি চাকৃতি এঁটে রাখা হয় জুতার গায়ে, যাতে একজনের হাইহিল লেডিস সু'র সঙ্গে অন্যজনের কাবুলী চপ্পল বদল না হয়ে যায়। চাকৃতি ফেরত দিলেই ঠিক নিজের জুতাজোড়া এনে হাজির করে জুতাঘরের কর্মচারী যেমন স্যাভয়, গ্রভনর বা কলকাতার গ্রেট ইস্টার্নে টুপী, ছাতা কিংবা লাঠি।

মহাত্মা গান্ধী দ্বার উদ্ঘাটন করেন এ মন্দিরের। তাঁর চাইতে যোগ্যতর পুরোধা ছিল না এ-অনুষ্ঠানের। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও হরিজনের সমান প্রবেশাধিকার যে মন্দিরে, তার দরজা তিনি খুলবেন না তো খুলবে কে? বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রইল এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাত্মার নাম।

বিড়লা মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তৃতীয় মন্দিরটি মূলতঃ বিড়লাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্মিত। সেটি বৌদ্ধদের। বাঙালী কালীমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মন্দিরটির অবস্থিতি ও গঠন কারুর দৃষ্টি এড়াবার নয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি। পীতবসন ভিক্ষু আছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবির স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন মন্দিরাঙ্গনে। রবি-বকুল বৃক্ষ রোপণানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন বাঙালী ঐতিহাসিক। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভারত সরকারের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষক, কিপার অব ইম্পিরিয়েল রেকর্ডস।

সেন মহাশয় এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁর গবেষণার মূল্য ঐতিহাসিক মণ্ডলীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। স্ফীত বেতনের সরকারী চাকুরীতে অনায়াস জীবন যাপন করেও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যচর্চা করেন এবং অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পাওয়ার পরেও যে স্বল্পতর ঐতিহাসিক বাংলায় ইতিহাস রচনা করেন, বঙ্গবাণীর সে সেবকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেন বিশিষ্ট। এঁর পৈতৃকবাস বরিশাল জেলায়। বাচন ভঙ্গীতে তার আভাস পাওয়া যায়।

রিডিং রোডের একপাশে মন্দির, অন্যদিকে কোয়ার্টার। গভর্নমেন্টের কেরানী ও অনুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L অক্ষরের মতো একপ্রান্ত প্রসারিত, কোনটার বা E'র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়তিটুকু বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনোখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চল্লিশটি পরিবারের বাসব্যবস্থা। অল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়া দিল্লীর ইস্ট য়েন্ড।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক দশমাংশ ভাড়া। মাসের শেষে আপিস থেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্রেটারিয়েটের কেরানীদের সর্বনিম্ন বেতন ষাট টাকা। সুতরাং ছ'টাকা ভাড়ায় বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নার, একটি ভাঁড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জলের কল আছে, বাথরুম আছে, আছে ইলেকট্রিক আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান। বাড়িতে রোদ আসে, বাতাস আসে এবং ধূলিরও বাধা নেই। কলকাতা শহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ি কোটিকে গুটিক মিলে না।

শুধু বাড়ি নয়। ফার্নিচারও। বিবাহ-সভায় সালঙ্কারা কন্যার মতো গভর্নমেন্টের বাড়িও আসবাবপত্রসহ পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল পি· ডব্লিউ· ডি'র ফার্নিচার। দু'টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায় দু'খানা তক্তাপোশ, একটি আলমারি, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনে খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা 'স্কোয়ার'। অধিকাংশই

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দ্বারা গৌরবান্বিত। ক্লাইভ স্কোয়ার আছে সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের নামে যিনি পলাশীর আম্রকাননে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। যিনি আশী টাকা বাৎসরিক বেতনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীরূপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালীরূপে। ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ৯ই মে যখন সেনানায়ক ক্লাইভ রূপে প্রত্যাবর্তন করলেন ইংলন্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টসমাউথ বন্দরে, তখন ইংলন্ডের এ্যানুয়েল রেজিস্টারে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য ছিল,—"এই কর্নেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দু' কোটি, তাঁর স্ত্রীর গহনার বাক্সে মণিমুক্তা আছে দু' লাখ টাকার। ইংলন্ড, স্কটলান্ড ও আয়র্ল্যান্ডে তাঁর চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহৌসীর নামে, যিনি একে একে পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারত সাম্রাজ্যে, জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাতারা, কেড়ে নিলেন ঝাঁসী, নাগপুর, নিজামের বেরার, নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র কাছ থেকে অযোধ্যা।

স্কোয়ার আছে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নামে, যিনি কাশীনরেশ চেৎসিংহের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যায় বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কুশাসন ও কুকার্যের সুদীর্ঘ তালিকা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিচারসভায় অভূতপূর্ব বাগ্মিতায় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন এড্‌মণ্ড বার্ক। সে অপকীর্তির রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্লামেন্টকক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী যুদ্ধের ছোট বড় মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক স্কোয়ার, আউটরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকল্‌সন্ স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজর জেনারেল হিউয়েটের নামে যিনি ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে লাঞ্ছিত করেছিলেন। সেদিন নিরুপায় ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবমাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। সে আগুন সহজে নেভেনি।

পরদিন রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামল মীরাটের ছাউনিতে। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরী হয়েছে চার্চ-প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যরা করছে কী? বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এল,—

গুড়ুম!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছে বৃটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্ববিহীন অসঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাবিহীন পদ্ধতি, বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আওরঙ্গজেবের রণকুশলতার লেশ ছিল না এই বৃদ্ধ মুঘল সম্রাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশ-বিদ্বেষকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজেরই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর প্রাচীরের উপরে চৌকাটী বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। তা ছাড়া আছে আরও ষাটটি ছোট ছোট কামান। আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ;—বেশীর ভাগই দু'দিন পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত।

ওরা য়ুরোপীয় যুদ্ধরীতিতে সুশিক্ষিত, সুনিপুণ এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এঞ্জিনিয়রেরা যারা আধুনিকতম এঞ্জিনিয়রিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত ব্রিটিশবাহিনীর মনে। লেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিল না দুর্গপতনের।

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারল। দিল্লী দখল করল ইংরেজ। ভারতে মুস্লিম রাজত্বের ঘটল সমাপ্তি। দ্বিশতাধিকবর্ষ পূর্বে নির্মিত সম্রাট সাজাহানের লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ পতাকা।

নগরপ্রান্তে 'রীজের' ইংরেজ-শিবিরে সৈন্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এরা সবই য়ুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহুল্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজানুরাগী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাঁদের জন্য আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ সাত করে তোপধ্বনির বিধি আছে।

কর্নাল থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করল 'রীজে', যেখানে এখন দিল্লী য়ুনিভার্সিটি। বর্তমান সবজীমন্ডীতে ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্থায়ী আবাস ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির বা ইকনমিক্সের নোট টোকে। তারই অনতিদূরবর্তী একটি ভবনে উনিশ শ' চব্বিশ সালে তিন সপ্তাহের অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী,—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্পে। প্রথম সর্বদল মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পন্ডিত মালবীয়জি।

ইংরেজ জানতো, অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্বস্ব পণ করল তারা। জিতি তো বাদশাহ, হারি তো ফকির। ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইল্‌সন তখন ব্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা অতীত, শরতের প্রথমার্ধও বিগতপ্রায়। অর্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য জ্বর, উদরাময় ও অন্যান্য ব্যাধিতে রুগ্ন। পাঞ্জাব থেকে সেনাপতি লরেন্স ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত পত্র পাঠাচ্ছেন,—আর কতদিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলম্ব কত? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অনুগত, আম্বালার সেনানিবাসে দেখা যায়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তি রক্ষা কঠিন হবে। দিল্লী, দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে জন্ কোম্পানীর ভাগ্য।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র এসে পৌঁছল 'রীজে'র ছাউনীতে। ব্রিটিশ-সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, মনে এল সাহস। সেনাপতি উইল্‌সনকে অতিক্রম করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন্ নিকল্‌সন।

চৌদ্দই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করল দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী ছয় দিন দিবারাত্রি ব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর প্রাচীর বিধ্বস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে,—মূল আক্রমণের মুখবন্ধরূপে। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান গর্জনে দুরু দুরু কম্পিত হলো দূর দূরান্তের গৃহগবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আভায় সীমন্তিনীর সিঁথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চলল প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল ধূলায়।

এঞ্জিনিয়র বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নি সংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশ্মীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজের ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আটজন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নদ্বার পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশবাহিনী প্রবেশ করল ভীমবেগে। বিপক্ষকে আক্রমণ করল দ্বিগুণ তেজে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেনাপতি নিকল্‌সন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করল তাঁকে। মুহূর্তে আর্তনাদ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল নিকল্‌সন। গুলি লেগেছিল তাঁর কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আত্মগোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের সমাধি সৌধে। সেখানে এক মুসলমান ফকিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই ফকিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী হডসনের হাতে।

হামা আজ দস্তে
গয়ের নালা কুনান্দ,
শাদী, আজ দস্তে
খেশ্‌তান ফরিয়াদ্।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, হে শাদী, অপরের হাতে মার খাওয়া নিয়ে আর খেদ করে লাভ কী!

বন্দী সম্রাটকে হড্‌সন্ পালকী করে নিয়ে এল দিল্লীতে। সেখানে বিচার হলো তাঁর। দণ্ড হলো নির্বাসন। ব্রহ্মদেশে। সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দীদশায় জীবনান্ত ঘটল তাঁর। হতভাগ্য বাহাদুর শাহ্,—ভারতের শেষ মুস্লিম সম্রাট!

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, হুমায়ুন'স টুম্বেই পরদিন হডসন গ্রেপ্তার করল আর তিনটি পলাতক। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিলেন। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদেরও বিচার হবে বাহাদুর শাহের মতো।

হডসন তাঁদের একটি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল দিল্লীতে। দিল্লী গেটের কাছে এসে হডসন থামাল সে গাড়ি। বন্দুক নিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলি করল বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে। রাজরক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলিধূসর পথে। মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনী রূপে রাখা হলো তিন দিন। সম্রাটবংশধরদের বিকৃত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল, পথচারীর দল, বারংবার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জনা করল নিঃশব্দে।

সাত

সাধ্বী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল অনুজ এবং প্রভুপ্রাণ সেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ ইতিহাসে একাধিক। জনকতনয়া সীতা, দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামানুচর হনুমানের কাহিনী জানে এদেশের আপামর সাধারণ। কিন্তু পত্নী-অনুগত স্বামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বাগ্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথবাবুকে। ইন্দুমতীচরণ-চারণ চক্রবর্তী শ্রী প্রিয়নাথ রায়।

প্রাক্‌বৈবাহিক্ জীবনের পরিচয়লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাসগুপ্তা। গোখলেতে পড়েছেন ইংরাজী, সঙ্গীত সম্মিলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল স্লিভসের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় করেছেন গান—প্রভু, তুমি আমাদের পিতা। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিস্টর।

ইন্দুমতীর বাবার সিন্দুকে রূপা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে রূপ ছিল না একটুকুও। ফলে কয়েক বছর আই· সি· এস, বিলাত ফেরত, ডেপুটি প্রভৃতির জন্য অযথা অপেক্ষার পর অবশেষে যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে এক শুভ মাঘে মাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কন্যালগ্নে হলেন প্রিয়নাথবাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে

সুপারিন্টেন্ডেন্ট। পয় আছে বটে আমাদের ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথবাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে —। থাক সে কথা। আমি তো আর তাঁকে জামাই করছি নে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িটি 'বি' টাইপ কোয়ার্টার। নয়া দিল্লীতে বাজারে ডিম থেকে শুরু করে বসত বাড়ি পর্যন্ত সবই গ্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঔজ্জ্বল্যে, মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে। পি· ডব্লিউ· ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ি। পাঁচ শ' থেকে ছ' শ' টাকা মাহিনার কর্মচারীর জন্য 'এ' টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ' ওয়ালারা পায় 'বি'। ছ' শ'র উপরে মাইনে যাদের তারা পায় বাংলো। তারও শ্রেণী বিভাগ আছে। শুধু গঠন বা ব্যবস্থায় নয়, অবস্থানেও। ঠিকানা শুনেই বলে দেওয়া যায় লোকটার বেতনের পরিমাণ। হেস্টিংস রোডের বাসিন্দা পায় তিন থেকে চার হাজার, তোগলক রোডে তার নীচে। এক হাজারের বেশী না পেলে বাংলো মেলে না রাইসিনা রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সন্ধান করলেম বাড়ির। বারান্দার পাশের ঘরে আধময়লা গেঞ্জি গায়ে একটি ভৃত্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে একখানা চকোলেট রং-এর বেনারসী শাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম, "এইটে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ, মিস্টার রায়ের বাড়ি।"

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল বাবু সম্বোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণসুখকর নয়। সুতরাং ভ্রম সংশোধন করতে হলো।

"মিস্টার রায়কে একটু খবর দিতে পার?"

"আমিই মিস্টার রায়।"

গড সেভ দি কিং! মিসেস ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ি ইস্ত্রি করবেন তা কল্পনা করব কেমন করে? কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। নর্মাসিমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। মিস্টার রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দেশ লাভ করে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসালেন। 'উনি' চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আশ্বাস দিলেন।

ড্রয়িং-রুমটির মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা, তার উপরে ছোট মির্জাপুরী কার্পেট। টিপাই-এর উপরে পুষ্পহীন জাপানী কাঁচের ফুলদানী। এক কোণে একখানা ভাঁজ করা কেম্বিসের ইজিচেয়ার। মাথার কাছটা উপবেশনকারীদের তৈলসিক্ত শিরের অজস্র চিহ্নের দ্বারা মলিন। দেয়ালে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো খান দুই সূচীশিল্পের নমুনা। এই সিবন কারুকর্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় ঘটে সেজন্য বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে 'ইন্দু'। একটাতে একটা ঝুড়ি তাতে কয়েকটি গোলাপ ফুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রং-এর যদৃচ্ছ এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার; 'ভিবজিওর' বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা —গড ইজ গুড। বোঝা গেল গৃহস্বামিনী ধর্মশীলা, কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়র প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। আলাপ অর্থে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রায় সবটাই 'উনি' প্রসঙ্গ। উনি আবার বিছানায় এক পেয়ালা গরম চা না পেলে উঠতে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেন না। নয়াদিল্লী বঙ্গ মহিলা সমিতির যা কিছু তা তো সব উনিই করেন। লেডী মিত্র তো উনি ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্দুমতী রায়ের প্রবেশ। মিঃ রায়ের উত্থান। এটা ইংরেজী রীতি।

গৃহস্বামিনী রায় আসন পরিগ্রহণ করলেন। প্রথমে গৃহে স্থানাভাবের বিকৃত বর্ণনা দিলেন। তবে ছ'মাস পরেই গুরুদোয়ারা রোডে বাংলো পাওয়ার আশা আছে। এ-বাড়িতে বরাবর ইচ্ছেমতো সাজাতে পারেননি। তবুও তো সিমলা থেকে যে আসবাবপত্র এনেছেন তার সব এখনও প্যাকিং খোলা হয়নি (সিমলা থেকে এসেছেন এই পাঁচমাস হলো)। ফি বছর দিল্লী-সিমলা করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এই প্রথম। এবার গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈল-বিহার বন্ধ। নতুন কমাণ্ডার-ইন-চীফ নাকি বলেছেন, সিমলা গেলে যুদ্ধ জয়ে বিঘ্ন ঘটবে। শোন একবার যত অনাসৃষ্টির কথা! আরও বেশী গরম পড়লে কিন্তু তিনি সিমলা না গিয়ে পারবেন না, তা বাপু, তোমরা যাই বল না কেন।

বেবী—অর্থাৎ ন' মাসিমা এখন আছে কোথায়? তার মেয়ের বিয়ে কত দূর? ছেলে পড়ে কোন ক্লাশে? তাঁর নিজের চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস কম। অবসরও পান না। কত কাজেলা! এই তো আজ চারটায় আছে এক পার্টি। হ্যাঁগা শাড়িটা ইস্তিরি করে রেখেছ তো? প্রিয়নাথবাবুর প্রতি।

হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

এখনই উঠবে? হ্যাঁ, বেলা হয়েছে বটে। আছ ক'দিন? দিল্লী থেকে যাবে কোথায়? বিলেতে কী হলো? যুদ্ধ না থামলে তো আর যেতে পারছ না। বমিং-এর সময় লণ্ডনে ছিলে বুঝি? সেখানকার অবস্থা কি রকম? বাজারে ড্রিন স্যাম্পু পাওয়া যায়? ট্যাঙ্গি লিপষ্টিক? এখানে তো ছাই কিচ্ছু মিলে না! আচ্ছা, একটু চা টাও তো খেলে না। ওর আবার আপিসের বেলা হচ্ছে, আচ্ছা আর একদিন এসে খেয়ে যেও কিন্তু।

আরও একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার ফরমাশ ছিল। ঠিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথবাবু, থুড়ি, মিস্টার রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ভি· আর· ভেঙ্কটশরণের বাড়িটা কোথায় জানেন? কোন্ ডিপার্টমেন্টের যেন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী?"

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ" বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। সেটা ঠিক কি রকম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ রায়ের অবস্থা দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারলেন।

"এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী! ভেঙ্কটশরণ বলেছে বুঝি? চাল, কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে, আপনি নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, হুঃ। রিটায়ার করার দু'-এক বছর আগে যে হতে পারে সে তো ভাগ্যবান। এখন যুদ্ধের বাজার। তাই সেকেণ্ড ডিভিশন ক্লার্কেরা পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হচ্ছে। নইলে মশাই, এ্যাসিস্ট্যান্ট হতেই যে চুলে পাক ধরে। আমি যেবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলেম, উডহেড সাহেব, সার জন উডহেড, পার বাংলাদেশের গভর্নর অবধি উঠল,—ডেপুটি সেক্রেটারী। ডেকে বললেন, "রয়, তোমার মতো এমন কাজের লোক—"।

অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। অনিচ্ছাক্রমে এবং নিজের অজ্ঞাতেও যে অপর লোকের মনস্তাপের কারণ হতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত।

ভেঙ্কটশরণের গৃহ আছে, গৃহিণী নেই। থাকলে বিপদ ছিল। তিনি প্রাচীন-পন্থী হলে তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হতো, আধুনিকা হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন ও পরে বাংলা সিনেমার নায়িকা। মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা যায় অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক ইন্ডিফারেন্সে—যে কাছেও টানে না—দূরেও ঠেলে না—শুধু ভুলে থাকে।

ভক্তেরা বলেন, ধ্যান, জ্ঞান নিদিধ্যাসন সমস্তই ভগবানে উদ্দিষ্ট না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটে না।

বরদারাজলু ভেঙ্কটশরণ ভগবান প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই আরাধনা করছেন সেক্রেটারিয়েটের। আপিস, আপিস, আর আপিস। কাজ, কাজ আর কাজ।

সকালে সাড়ে ন'টায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে তখন এসে বসেন টেবিলে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার আঁধারে, ঊর্ধ্ব ও অধস্তন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বাসায়, সহকর্মীরা একে একে করে প্রস্থান। একা ভেঙ্কটশরণ কাজ করে যান অনন্যমনা। বাড়ি ফেরেন কখন রাত আটটায়, কখনও বা তারও পরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ঐ একই ধারা। ছুটি নেই, ক্যাসুয়েল লীভ নেই। রবিবারে দুপুরে অনেক দিন চলে আসেন আপিসে। ফাইল নিয়ে লেখেন নোট, ফ্লাগ দিয়ে দাগ দেন "ফ্রেশ রিসিট" অথবা "পি· ইউ· সি·—পেপার আন্ডার কনসিডারেশন।" বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা করে বলে, ভেঙ্কট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা ভোগ করবে কখন?

ভেঙ্কটশরণ হাসেন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বোধ হয় মনে মনে বলেন, কী আহাম্মক! হোয়াট্টে ফুল-অ! ভোগ? হুঃ, থার্ড ডিভিশন ক্লার্ক থেকে সেকেন্ড, সেকেন্ড থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট, এ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সুপারিন্টেন্ডন্ট থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পাল্লা। ভোগের জন্য জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশন,চাই উন্নতি। চাকুরি রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ভেঙ্কটশরণের এক অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই· সি· এস· মানসে। সেখানেই পরিচয়। ভাই-এর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি তাঁরও চরিত্রে। আশা করি, একদা সিভিল লিস্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে।

ভেঙ্কটশরণের স্বজাতিয়েরা নয়াদিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে যে বাড়িতে এখন বাংলার লাট থাকেন, সেখানে বসতি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের। তখন সেক্রেটারিয়েটে বাঙালী ছিল বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থেকে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্রাস, অতঃপর পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকরির মসনদ। সে অভিযানে মাদ্রাজীরা সর্বাগ্রে। তারা খাটে বেশি, কথা কয় কম, ফাঁকি দেয় কদাচিৎ।

নয়াদিল্লীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সঙ্ঘ আছে, স্কুল আছে। বোর্ডিং হাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেস্কের মতো ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদলীপত্রে আহার। চার আনায় মিলে স্বাথম, কুট্টু, সম্বর ও আপ্পালম। একজন তামিল বা অন্ধ্র দেশীয়ের নিয়মিত খাদ্য। কোনোদিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়রপত্‌চত্তি অর্থাৎ নারকেলের কুঁচি সহযোগে দৈ। সেদিন তো রীতিমতো ভূরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাক্ষিণাত্যের লোক। একখানা চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফতুয়া গাত্রাবরণ। কাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল। ব্যস্। আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছন্দচিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোনদিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহুল্যবর্জিত। ভূষণ পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙালী স্বামী চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরুণীদের রূপ নেই, কিন্তু রুচি আছে। তাদের গৃহদ্বার সকালে সন্ধ্যায় আলিম্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরীবন্ধন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সদ্য পরিচিত একজন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা

মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন সেবে রসনার বদলে চক্ষু জর্জরিত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পারদর্শিতা আছে বীণা বাদনে। অপূর্ব সুর সৃষ্টি করলেন তারযন্ত্রে। তাঁর বাদ্য রইল অভুক্ত শ্রবণ হলো মধু-তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তাঁর ভোজন-সভার বাহুল্য আয়োজন।

মাদ্রাজীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তফাৎ এইখানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্জাবীরা শুধু মডার্ন নয়, আলট্রা মডার্ন। যুবক, বৃদ্ধ সবাই মিলে করছে উর্দ্ধশ্বাসে বিলাতীর নকল। শুধু ছেলের হলে ক্ষতি ছিল না। মেয়েরাও।

রেস, ক্লাব ও কার্নিভাল—অতি আধুনিকতার এই তিন তীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা! তাঁরা চার রাউন্ড শেরী সাবাড় করতে পারেন হাসতে হাসতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্যন্ত ফক্সট্রট নাচতে পারেন অক্লান্ত চরণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে সত্তার অধিক। তাঁরা বিত্তের আদিতে তন্বী, অন্তে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর, কিন্তু আনন লালিত্যহীন। চাকর-চাকরাণীদের শাসনকার্যে স্বহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না এতটুকুও। দেহে কিংবা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটল বাংলা দেশে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করল বাঙালী। সে-যুগের বাঙালীর প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর, প্রতিভা ছিল প্রখর। ইংরেজের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সে গলাধঃকরণ করল না, করল গ্রহণ। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে সে আত্মসাৎ করল। পশ্চিমের চিন্তাধারাকে সে ধার করল না, ধারণ করল। তাই বাঙালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহিত্যে শিল্পে ও ললিতকলায় বাংলাদেশ সূচনা করল সমৃদ্ধিযুক্ত নবযুগের, আনল দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব প্রেরণা। যৌবনকে দিল অভয়মন্ত্র, নারীকে দিল আত্মচেতনা। সেদিন সর্বভারতীয় অধিনায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বঙ্গজননী।

য়ুরোপের সংস্পর্শে সর্বশেষে এসেছে পাঞ্জাব। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে লর্ড ডালহৌসী দখল করেছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু য়ুরোপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পায়নি, শুধু বাইরে থেকে করেছে অনুবর্তন। য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসরণ করেনি, অনুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য, দেয়নি সঙ্গীত, দেয়নি বিজ্ঞান। দিতে পারেনি দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তার দান একদল পি· ডব্লিউ· ডি'র এঞ্জিনীয়র, সৈন্যদলের সুবেদার এবং আই· এম· এসের ডাক্তার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়া পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। কিন্তু এখানকার গোলমার্কেট সার্থকনামা। সেটা গোলই বটে। চারটি রাস্তার সংগম স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপের মতো এ-বাজারটি। দোতলা বাড়ি। উপরে দরজীর দোকান, নীচে শাকসব্জী, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। পৃথক পৃথক কক্ষ। ইংরেজীতে লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি—কোন্‌টাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশপথগুলিতে সূক্ষ্ম তারের জাল-আঁটা দরজা। স্প্রীং দেওয়া আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে উঁচু সিমেন্টের বেদীতে রাখা হয় মাছ, তার উপর দিয়ে গেছে জলের কলের সছিদ্র পাইপ। ছিদ্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে জল। আপনি ধুইয়ে নিচ্ছে বেদীটি। আইসচেস্টের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাছির উপদ্রব নেই, কর্দমাক্ত জল সিঞ্চনে পঙ্কিল হওয়ার আশঙ্কা নেই ক্রেতাদের বসন। মার্কেটের দু'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙালীর দোকান আছে কয়েকটি, তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও অন্যান্য বাঙালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে আছে লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূন্য একমাত্র

মহিলা মেডিকেল কলেজ। বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে এ্যাংলোইন্ডিয়ান আছে, মাদ্রাজী আছে, মারাঠী আছে, আসামী আছে। বাঙালী নেই একটিও। পাঞ্জাবী এক অধ্যাপক বন্ধুর শ্যালিকা পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। সুদর্শনা। বাংলার বাইরে কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলে। রূপের অভাবটাই সেখানকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কারণ নয়। পড়াশুনাটা নয় বিয়ের আগের স্টপ্ গ্যাপ্।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জারীতে আগ্রহ বেশী। পাশ করে হবেন সার্জেন। সর্বনাশ!

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সম্মার্জনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সর্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের দ্বারা সংসারযাত্রাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হস্তে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হৃদয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অতি আধুনিকারা যদি ধরেন ফরসেপস্ তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে।

রসবোধ আছে তরুণীর। কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জে বাঙালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিকা আছেন একজন। মহিলার এক ভাই আই· সি· এস, এক ভাই এম· এস, দু' ভাই একাউন্টস সার্ভিসে উচ্চপদস্থ অফিসার। এক বোন শিল্পী। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জার্নেল অব সাইন্টিফিক আন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ'-এর চিত্রসম্পাদিকা। অন্য ভাই বোনেরা সকলেই কৃতী। তিনি নিজে ডব্লিউ· এম· এস· অর্থাৎ আই· এম· এসেরই মহিলা সংস্করণের অন্তর্ভুক্তা। মাইনে পান অনেক, ডাক্তারী করে আয় করেন যথেষ্ট, ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সহৃদয় আচরণ। লেডী ডাক্তারী গন্ধ নেই কোনখানে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়ার্টার। সেখানে গৃহসজ্জায় গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচয় পরিস্ফুট।

নয়াদিল্লীতে মহিলা ডাক্তার আছেন একাধিক। যুক্তপ্রদেশের আছেন জন দুই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি দক্ষিণ দেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে সুপরিচিত, জননী য়ুরোপীয়। তাঁরা উভয়েই জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মহিলা বিয়ে করেছেন একটি বাঙালী। এরা দুজনেই ডাক্তার। স্বামী স্ত্রী দুজনেই রাজনীতিক বা স্কুল মাস্টার হওয়ার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইকনমির মতো দাম্পত্যেও ডিভিশন অব লেবার আছে। সেখানে স্ত্রীর অংশ কথা বলার, স্বামীর অংশ কথা শোনার। দুজনেই বক্তা হলে গার্হস্থ স্বাস্থ্য রক্ষায় নিদারুণ বিঘ্ন ঘটে।

কনট প্লেসকে বলা যায় দিল্লীর চৌরঙ্গী। সাহেবী এবং সাহেবী ধরনের দোকান পসার সেখানে। স্যুট বানাবার দর্জী, ফটো তোলার স্টুডিও, প্রভিসনসের স্টোর, চুলে ঢেউ খেলাবার বিউটিপার্লার, লাঞ্চ খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখবার ছবিঘর,—সবই এই কনট প্লেসে। শুধু চৌরঙ্গী নয়, ক্লাইভ স্ট্রীটও। ব্যাঙ্ক ও আপিসপাড়াও এইটেই। বার্ড কোম্পানীর পেটেন্ট স্টোন, মার্টিনের টাইলস, ডালমিয়ার সিমেন্ট কিনতে হলে আসতে হবে কনট প্লেসেরই আশেপাশে।

কনট প্লেসের নামকরণ হয়েছে রাজা পঞ্চম জর্জের পিতৃব্য পরলোকগত ডিউক অব কনটের নামে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মসের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদ সৃষ্টি হলে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে ভারতে আসেন তিনি। জালীয়ানওয়ালাবাগের নরঘাতন নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তখনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃদ্ধ ডিউকের উদ্বোধন বক্তৃতায় তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, ছিল আন্তরিকতার সুর,—"দু'পক্ষেই ভুল ত্রুটি ঘটেছে বিস্তর। আজ তার পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই অতীতের কথা বিস্মৃত হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি। ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।"

কিন্তু ফরগেটমেনস তো চলে শুধু সমানে সমানে। শাসক-শাসিতের মধ্যে তার স্থিতি পদ্মপাতে জলবিন্দুর মতোই ক্ষণিকের। মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন করে স্মরণের কারণ ঘটে এক পক্ষের ক্ষমতাগর্বিত আস্ফালন ও অপর পক্ষের নিরুপায় নিষ্ফল আর্তনাদ। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভুলতে না ভুলতে আসে হিজলী, তার স্মৃতি শূন্যে মিলাবার আগে ঘটে কাঁথি বা তমলুক।

কনট প্লেসের আকৃতি গোলাকার। বৃত্তের ভিতরের দিকে মুখ করে এক সারি দালান। তার পিছনে আছে অনুরূপ আর এক সারি। তাদের মুখ বাইরের দিকে। সেটার নাম কনট সার্কাস। রোমান পদ্ধতির বিরাটাকার থামের উপরে প্রসারিত বারান্দা। সেখানে অপরাহ্ণ বেলায় ভিড় জমে সুবেশ নরনারীর, সওদা করে সৌখীন ক্রেতারা, আলোকোজ্জ্বল শো-কেসে বিচিত্র দ্রব্যের দর্শন পায় কৌতূহলী জনতা।

দালানের পরেই প্রশস্ত রাজপথ। তার ঠিক মাঝখানে সাদা দাগ দিয়ে পার্কিং-এর নির্দেশ, সেখানে থাকবে অপেক্ষমান মোটরকার ও টাঙ্গা। দু'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ পার্ক। লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা ফুটপাথ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে বিশ্রামার্থীদের জন্য আছে বেঞ্চি, ক্রীড়াচঞ্চল শিশুদের জন্য আছে তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন এবং পুষ্পবিলাসীদের জন্য আছে অজস্র ফুলের আয়োজন।

ঘাস জিনিসটার মূল্য যে কত তা জানা নেই বাংলাদেশে, যেখানে দু'দিন না হাঁটলে পায়ের তলায় গজায় ঘন ঘাসের বন। অপদার্থ ব্যক্তিকে ঘাস খেতে বলে গাল দেওয়ার উপায় নেই উত্তর ভারতে। ভাতের চাইতে সেটা অনেক বেশী দুর্ঘট। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ যেখানে এক শ' তেরো ডিগ্রিতে ওঠে এবং সারা বছরে যে দেশে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সে-দেশে ঘাস জন্মাতে প্রয়াসের প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কনট প্লেসের প্রত্যেকটি ঘাস হাতে করে বোনা এবং হাতে ধরে বাঁচানো। তার জন্য সরকারী হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে পরিমাণ যত্ন, জল ও অর্থ ব্যয় করা হয়, সে হিসাবটা যে কোনো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনার উপাদান হতে পারে।

ফুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালীরা যথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং চাঁদের আলো একমাত্র কলেজ ম্যাগাজিনে কিশোর বয়স্কদের প্রথম পদ্য রচনা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে বলে তো জানা নেই। আর্টিস্টিক জাতি বলে বাঙালীর মনে যে আত্মাভিমান আছে সে নিয়ে তর্ক চলে কিন্তু তথ্য মিলে না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত ইংরেজ পরিবারেও খাওয়ার টেবিলে বা বসার ঘরে সামান্য কিছু ফুলের সন্ধান মিলে নিশ্চিত। অতি সচ্ছল বাঙালীর গৃহে পুষ্পগুচ্ছের চিহ্ন দেখা যায় কদাচিৎ। অর্থের প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন। বেশীর ভাগ বাঙালী পরিবারে ফুলের প্রয়োজন হয় জীবনে মাত্র দু'বার,—ফুলশয্যার রাত্রিতে এবং শবাধার সজ্জায়।

পুরাকালে পরিবারে গৃহদেবতার পূজার রীতি ছিল। সেজন্য প্রয়োজন ছিল গন্ধপুষ্পের। বাড়িতে থাকতো দু'-একটি ফুলের গাছ। আধুনিকতায় গৃহদেবতার স্থান নেই। পূজা যদি করতেই হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাংসের দেবতাদের তুষ্ট করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফল মিলে হাতে হাতে। তাই এ-যুগে আমাদের ভজন-পূজন হয় আপিসের বড় সাহেব, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের। আমাদের ঠাকুর ঘরের জায়গা দখল করেছে ড্রয়িং-রুম। কিন্তু জবা, দোপাটি ও নাগকেশরের স্থান কার্নেশন, ডালিয়া বা গ্ল্যাডিওলাস এসে পূর্ণ করেনি। সখীপরিবৃতা আধুনিকা শকুন্তলাকে পুষ্পবীথিকায় তরু আলবালে জল সিঞ্চনরত দেখার সম্ভাবনা-মাত্র নেই। তার দর্শনাভিলাষে এ যুগের দুষ্মন্তকে যেতে হবে লাইট হাউস সিনেমায় নয় তো লেকে। কলকাতায় যে লোক ফুল ঘরে রাখে সে নেহাতই ফুলবাবু।

এ শহরে ফুলের অভাব নেই। পথের দু'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। পথচারণে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার চৌমাথায় বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আছে ফুলের কেয়ারী।

ডাকঘরের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে, ফুটে রয়েছে প্রচুর মরসুমী ফুল। কনট প্লেসে আছে 'ক্যানা' ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে পুষ্পাভরণের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভগ্নাবশেষ দেখেই।

নয়াদিল্লীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হতাশ্বাস, মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছত্রছায়া, তা:. শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহু বিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল। প্রণয়ীযুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে নয়াদিল্লীতে। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার জনবিরল, ধ্বনিবিরহিত গন্ধ-আমোদিত পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সদ্যবিবাহিত তরুণ-তরুণীর হৃদয় হয় উদ্বেল, কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, চুপি চুপি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোনো কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে একজনের ঝুমকা-দোলানো কানের অত নিকটে আর একজনের মুখ-আনতে গেলে তা' দু'-একবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়াও একেবারে বিচিত্র নয়।

আট

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো একটি মেয়ের চেঁচানিতে। শুধু আজ নয়, প্রত্যহই ভাঙে। অবশ্য আমি বলি চেঁচানি। মেয়ের মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবীতে সঙ্গীত কে কখন সৃষ্টি করেছেন জানিনে। কিন্তু এতকাল এইটুকু বিশ্বাস ছিল, যিনিই করুন, তাঁর মনে কোনো নিষ্ঠুর অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সে ধারণা বজায় রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটির গলায় সুরের লেশ মাত্র নেই, অথচ জোর আছে অসুরের। সেটা আরও সাংঘাতিক। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা,—এই পাকা দু'টি ঘণ্টা সে প্রত্যহ সঙ্গীতাভ্যাস করে। সপ্ত সুরের সঙ্গে কুস্তি করে বললেই ঠিক হয়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও নন্‌ভায়োলেন্ট আছে সেটা গান্ধীজির শিক্ষায় নয়, একান্ত নিরুপায় হয়েই। সভ্যতার অনেক দণ্ড আছে। তার মধ্যে এও একটা।

য়ুরোপ আমাদের অনেকগুলি মন্দ জিনিষ দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কোন্‌টা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাক্তারেরা বলেন সিফিলিস, গুরুজনেরা বলেন ফ্রি-লভ এবং গান্ধীজি বলেন কলকারখানা। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে য়ুরোপের সবচেয়ে ক্ষতিকর আমদানি হারমোনিয়ম। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর নিদারুণ অত্যাচারের এমন দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। আশ্চর্য নয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন, জনসভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করার আগে কেউ যখন হারমোনিয়ম বাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত শুরু করে তখনই তাঁর অদম্য অভিলাষ হয়, জনতার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ বাদ্যযন্ত্রটাকে পদাঘাতের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।

জড় পদার্থের একটা সুবিধা আছে। তার সহনশীলতা অপরিসীম। সে বিদ্রোহ করে না। দিনের পর দিন দু'ঘণ্টা বেসুরো চিৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আওয়াজ বের করা একমাত্র হারমোনিয়মের পক্ষেই সম্ভব। গত দশদিন ধরে সেই এক সুরে—'বঁধু, তুমি যে চলে গেলে, ফিরে তো নাহি এলে'। বঁধু লোকটা যে কে, ঠিক জানিনে। যেই হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ থাকলে হাতজোড় করে বলতেম,—বাছা, চলে যে গেছে, সে নেহাত প্রাণের দায়েই গেছে। এবং তোমার ঐ গান না থামলে সে আর ফিরছে না এও নিশ্চয়। প্রেম যত গভীরই হোক প্রাণের মায়া, অর্থাৎ কানের মায়ার চাইতে সে বড় নয়।

মেয়েটির অপরাধ নেই। তার মাকে দোষ দেওয়া বৃথা। তিনি জানেন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পাত্রপক্ষ কনে দেখতে এলে গানের পরীক্ষা আছেই। সুতরাং তার জন্য মেয়েকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাই কিনতে হয় হারমোনিয়ম, রাখতে হয় গানের মাস্টার, মেয়েকে প্রাণান্তকর কসরৎ করতে হয় কণ্ঠস্থলীর।

এদেশে সর্বগুণান্বিতা হবার দাবী মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুধীরা ও গৃহকর্মনিপুণা। যে মেয়ে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি· এস· সি· পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ফোড়ন দিয়ে মোচার ঘন্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের সামনে কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোর ভঙ্গিতে মাদুরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে' ইত্যাদি।

বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। ডাক্তার বরের মাসিক আয়ের খোঁজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশি থাকেন, তার ক্রীড়া-দক্ষতা, অভিনয় পারদর্শিতা কিংবা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয়তো ইনকেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোনো একটা মাত্র কৃতিত্বে নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রূপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাঙ্কব্যালেন্সের পরিমাপে।

পুরাকালে রাজকন্যারা নিজেরা পতি নির্বাচন করতেন। পুরুষের হতো পরীক্ষা। বীর্যবত্তার পরীক্ষা। পুরুষকে তখন স্বয়ম্বর সভায় নারীর বরমাল্যের যোগ্য হওয়ার সাধনা করতে হতো। একালে মেয়েরা সহজলভ্যা। তাদের জন্য হরধনু ভাঙতে হয় না, প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যচক্ষ বিদ্ধ করতে হয় না। তাদের লাভ করতে বাঁধা মাইনের একটা চাকুরি হলেই যথেষ্ট। একালে রাজপুত্র, কোটালপুত্রদের কুঁচবরণ কন্যার খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশে বেরোতে হয় না। দুধসাগরের জলের নীচে যে রূপার কৌটায় কালো ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সন্ধান করতে হয় না। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে হয় না। সরকারী দপ্তরখানার অফিসারের তকমা এঁটে তারা বীরদর্পে প্রজাপতি ঋষিকে দুয়ারে হাঁক দিয়ে বলেন—লে আও নিপুণিকা, চতুরিকা মালবিকার দল। তোমার রেণুকা সেন, মাধুরী রায়, ডলি দত্ত বা অরুন্ধতী চ্যাটার্জীদের। একালের কেশবতী রাজকন্যারা নব্বই ভরি সোনা আর তিনপ্রস্থ ফার্নিচারের খেয়া নৌকা চেপে আপনি এসে উত্তীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পণের টাকায় কারেন্সী নোটের মালা বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

আমার কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারিণী সঙ্গীত-অভিলাষিণীকে চোখে দেখিনি। শুনেছি একেবারে রূপহীনা নন। লেখাপড়ায়ও ভালো। তা' হোক। কিন্তু গান তাকে শিখতেই হবে। আমরা হতভাগ্য প্রতিবেশী,—আমাদের ললাটে দুঃখ আছে; খণ্ডাবে কে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে আর একবার নিদ্রার উদ্যোগ করলেম। বৃথা এবার গান নয়, কার্ড। দর্শনপ্রার্থী এক ভদ্রলোক। কার্ডের উপরে ছাপা—পি· সি· সমাদ্দার, বি· এ·, ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার। ভদ্রলোক আজ সকালে আসবেন কথা ছিল বটে। কিন্তু সকালে মানে যে সাড়ে ছটা তা ভাবতে পারিনি।

এই যে, নমস্কার। ঘুমুচ্ছিলেন না কি? বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। আমি? আমি মশাই ঠিক পাঁচটায় উঠে খানিকটা হেঁটে আসি। বারখাম্বা ধরে' ফিরোজ শা রোড, উইন্ডসর প্লেস, কুইনসওয়ে হয়ে বাড়ি মাইল দুই হবে। আছি ভালো মশাই! ডিসপেপ্‌সিয়াটা অনেকটা চাপা আছে। চা? আচ্ছা দিন এক কাপ, একবার অবশ্য হয়ে গেছে। আপনার বুঝি এখনও হয়নি। সাতটার আগে বিছানা ছাড়েন না? খাসা আছেন মশাই। দশটা-ছ'টা আপিস করতে হয় না, কারো তোয়াক্কা নেই। হাই সার্কেলে মুভ করেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি নেহরুকে ঐ ডিয়ারনেস এলাউন্সের কথাটা।

নেহরু মানে, বি· কে· নেহেরু। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারী। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। ভদ্রলোক নিজে আই· সি· এস· এবং স্ত্রী বিদেশিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি দুজনারই সত্যিকার টান আছে।

ত্রুটি স্বীকার করতে হলো। স্মরণ ছিল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, আজ একটু মনে রাখবেন। শুনেছি তো সাড়ে সতেরো পারসেন্ট করার কথা হচ্ছে।

কিন্তু কত মাইনে অবধি এলাউন্সটা দেবে সেইটেই আসল কথা। পাঁচ শ' টাকার উপরে মাইনে হলে দেবে না বলে কেউ কেউ বলছে। দেখুন তো একবার অন্যায়টা। কেন, আমাদের অপরাধটা কী? জিনিসপত্রের দাম তো আর শুধু পাঁচ শ'র নীচেওয়ালাদের জন্যে বাড়েনি। দুধের দাম টাকায় ছ' সেরের জায়গায় এক সের নিতে হচ্ছে তাকেও আমাকেও। বলুন সত্যি কি না? তবে কেন ডিয়ারনেস এলাউন্সের বেলায় আমরা বাদ পড়ব? এসব ইনজাস্টিসের জন্যই তো মশাই গবর্নমেন্টের কাজে ঘেন্না ধরে যায়। গান্ধী মহারাজ কি আর অমনি শয়তানী গবর্নমেন্ট বলেন? গান্ধীজী ভক্তকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হলো যে, গান্ধীজী পাঁচ শ' টাকার বেশী কারোর মাইনেই রাখতে রাজী নন।

না, না, সেটা ঠিক নয় মশাই। তিনি মহাত্মা, তাঁর কথা আলাদা। ঋষিতুল্য লোক। একটু ছাগলের দুধ পেলেই হলো। আর পাঁচজনের তো তা নয়। এই ধরুন না আমারই কথা। আপনি তো ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলতে আর কী? আট শ' টাকা পাই। ইনকাম ট্যাক্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড কেটে নিয়ে হাতে আসে সাত শ' তেরো টাকা পাঁচ আনা। ফি মাসেই শেষের দিকে টানাটানি হয়! কোনটা না করলে হয়? গাড়ি আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে হবে। পাঁচ শ' টাকার সীমা কিছু কাজের কথা নয়। স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বাড়াতে হবে, তা না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি নেই। দেখুন না বিলেতে, এমেরিকায়। হ্যাঁ, সাহেবগুলিকে তাড়িয়ে দিন না। ওরা করে কী? শুধু দস্তখত। যা কিছু তো আমরাই লিখে পড়ে দিই। কিন্তু পাঁচশ'র উপরে যদি মাইনে না থাকে, তবে চাপরাশীর মাইনে যে মাসে আট আনায় দাঁড়াবে! দাঁড়াবে না? বরং এখনকার চাইতে আরও বাড়বে? অবাক করলেন মশাই? কি জানি; আপনাদের কংগ্রেসীদের কী বিচার-বুদ্ধি আপনারাই জানেন।

কংগ্রেসীদের বিচার-বুদ্ধি ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য বা সময় কোনোটাই ছিল না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ক্রীপস্ আলোচনার কথা তুললেম। দেখা গেল তাতেও আগ্রহের একেবারে অভাব নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হবে মনে হচ্ছে কি? হলে বাঁচা যায় মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের আচ্ছা শিক্ষা হয়। ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদরিয়া সাহেব। যথার্থ মা-বাপের মতো! আমি তখন সবে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছি। আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মহাতপ বাবু। মহাতপ ঘোষ, খড়দায় বাড়ি। বুড়ো হয়েছেন, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সার্ভিস বুকে লেখা আটচল্লিশ। পেন্সনের আরও সাত বছর বাকী। চোখে একেবারেই দেখতে পান না, লিখতে হাত কাঁপে। একদিন ফাইলে টাইপকরা লেখার উপরেই দস্তখত করে বসে আছেন। আমরা ভয়ে সারা। আজ আর রক্ষে নেই। মারে,—সার অ্যালেকজান্ডার মারে—সাহেব ছিলেন আমাদের সেক্রেটারী। ডেকে নিয়ে বললেন, মহাটপ, ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই। কাল নিয়ে এসো ভর্তি করে দেবো। তুমি এবার রিটায়র কর। অনেক খেটেছ এখন ডিসার্ভ ওয়েলআর্নড রেস্ট। আর এখন মশাই আমার মেজ শ্যালক কলকাতা য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। দু'বছরের চেষ্টায় ঢোকাতে পারছি নে।

শুধু মেজ শ্যালকের চাকরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থ নয়। নিজের প্রমোশন সম্পর্কেও অভিযোগ ছিল। স্বরাজ না হলে আর চাকরি করে সুখ নেই মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের কাছে এখন মুসলমানেরা হচ্ছে বড় পিয়ারের। তাদেরই পোয়া বারো। কাজ জানুক আর নাই জানুক, মাথায় ফেজ থাকলেই হলো। পেটে বোমা মারলে এক কথা শুদ্ধ ইংরেজী বেরোয় না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসেছে। খান-বলে' আমাদের এক নতুন কন্ট্রোলার এসেছে। আকাট মূর্খ। সেদিন এক ফাইলে রেফারেন্স লিখতে দুটো r দিয়ে বসে আছে। গত মাসে দু'বছরের জুনিয়র একজন মুসলমান আমাদের চার জনকে ডিঙিয়ে ডেপুটি চীফ হয়ে গেল। এসব অবিচার কি আর চিরকাল সইবে? ইংরেজদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবে হ্যাঁ, এও বলি, হবে নাই বা কেন? মুসলমানদের ফেলো-ফিলিং আছে। চাকরি নিয়ে, প্রমোশন নিয়ে তাদের লীডারেরা সব সময় লড়ছে। পান থেকে চুন খসেছে কি, অমনি এসেম্বলীতে পাঁচজন মুসলমান মেম্বার পাঁচটা প্রশ্ন করবে, উইল দি অনারেবল মেম্বার বি প্লিজড টু স্টেট। একটা মুসলমান চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো

মিনিস্টারেরা কৈফিয়ত তলব করবে। আর আমাদের হিন্দুরা ? সব কংগ্রেসী। তারা কেবল উচ্চাঙ্গের কথা বলে বলেই গেলেন। স্বরাজ, স্বাধীনতা ; কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স। আরে চাকরি-বাকরিগুলি সবই যদি অন্যের হাতে গেল তবে স্বরাজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? আমি স্পষ্ট কথা বলবো মশাই, আমাদের কংগ্রেসের কর্তারা প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স একেবারেই বোঝেন না তাই জীবন কাটাচ্ছেন শুধু জেলখানায়।

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই, তর্ক করা নিরর্থক। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অতি পরিচিত আবহাওয়ায় মানুষ। চাকরিকে জানেন জীবনের অনিবার্য অবলম্বন, গবর্নমেন্ট পোস্টকে আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। তাঁর ধ্যান, ধারণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সমস্তই এই চাকরিকে কেন্দ্র করে। ক্যারেক্টার রোল নিয়ে তার আরম্ভ, পেন্সন নিয়ে তার শেষ ! এবং এই আদি অন্তের মাঝখানে প্রমোশন দিয়ে তার বিস্তার।

আপিসের বেলা হচ্ছিল। সমাদ্দারবাবু গাত্রোত্থান করলেন। আচ্ছা এখন তাহলে উঠি। আপিস আছে। আজ আবার এ মাসের এরিয়ার স্টেটমেন্টটা পাঠাতে হবে। বিকেলের দিকে আর একদিন আসব। বিকেলে বাড়ি থাকেন না ? তাহলে সকালেই আসব। আচ্ছা, চলি এখন। ঐ ডিয়ারনেস এলাউয়েন্সের কথাটা কিন্তু আজ একবার কাইন্ডলি—।

বিকালের দিকে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাব টি পার্টি দিচ্ছেন সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে। ক্রীপস্ চা, লাঞ্চ ও ডিনারের বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রেস ক্লাব ছাড়া আর কোনো আমন্ত্রণই তিনি গ্রহণ করেননি। বললেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা চক্রে তিনি যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকের প্রাঙ্গণে চা পার্টির আয়োজন। স্বদেশী ও বিদেশীয় সাংবাদিকদের নিয়ে নিমন্ত্রিত প্রায় শ'দেড়েক। কয়েকজন মহিলাও আছেন। অবশ্য তাঁরা সবাই বিদেশিনী।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙালী। ঊষানাথ সেন। ভারতে সাংবাদিকদের গুরুস্থানীয় ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কে· সি· রায়ের সহকর্মী ছিলেন। বর্তমানে এসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম কর্ণধার, দিল্লী আপিসের কর্ম-সচিব। বয়স ষাটের উপরে, শরীর সুগঠিত। বিরলকেশ তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল দৃষ্টি। কথাবার্তা, চালচলন ও বেশভূষায় প্রখর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন আছে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। নয়াদিল্লীতে কোনো দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই হবেন সর্বজনসম্মত পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট।

টি-পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রেস কনফারেন্স। সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কনফারেন্সে ক্রীপস্ তাঁর পরিকল্পনা সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর ক্ষিপ্রতা, তাঁর অক্লান্ত উদ্যম উপস্থিত সমুদয় সাংবাদিকদের প্রশংসা অর্জন করল। তাঁর রসবোধও আছে। মাঝখানে একবার হঠাৎ বললেন, সবুর। তারপর গায়ের কোটটা খুলে রেখে আস্তিন গুটিয়ে বললেন, এবার আসুন ! বিপুল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠল কনফারেন্স।

সার স্ট্যাফোর্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীদের অন্যতম। আইনব্যবসায়ী মহলে তাঁর বার্ষিক উপার্জনের পরিমাণ বহু লোকেরই ঈর্ষাজড়িত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই সাংবাদিক বৈঠকে যুক্তিতর্কে ব্যারিস্টার ক্রীপসের অসামান্য দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ধৈর্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত অপরিহার্যভাবেই ক্রীপস্‌ও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভদ্র প্রশ্নে অবশেষে কঠিন স্বরে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ধৈর্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কৃতিত্বও কম

নয়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তাঁরা যে রাজনীতিক নন একথাটা তাঁরা কদাচিৎ স্মরণে রাখেন। প্রেস না হলে পলিটিক্স চলে না, কিন্তু পলিটিক্স না হলেও প্রেস চলে। যথা—হরিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার হয়েই খুশি থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণীর পলিটিসিয়ানও হতে চান। তাই অনেক সময়েই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তাঁদের অপরাধ নেই। স্পেশিয়েলাইজেশনে এদেশে বিশ্বাস নেই। এখানে যে ডাক্তার জ্বরের চিকিৎসা করেন, তিনি ফোঁড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন।

ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। প্রস্তাবটির সমস্ত গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি ক্রীপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন a post-dated cheque অতি উৎসাহী কোনো কোনো সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য যোগ করলেন, on a crashing bank. মুখে মুখে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিও গান্ধীজির মূল উক্তি বলেই চলতে লাগল। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনবধানতায় সত্যবিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে!

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু নিয়ে গেলেন এক ক্লাবে।

নয়াদিল্লীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই· ডি· জি। ইম্পিরিয়েল দিল্লী জিমখানা। ক্লাব বর্ণাশ্রমে দ্বিজোত্তম। প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা নয়, লিখিত অনুশাসনের দ্বারা। এ্যাডমিশন ফি ও মাসিক চাঁদা দুই-ই গুরুভার। তাছাড়া আই· সি· এস·, আই· পি·, অডিট একাউন্টস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর চাকরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারও পক্ষেই আই· ডি· জি-র সদস্য হওয়ার উপায় নেই। বে-সরকারী ডাক্তার, জার্নেলিস্ট, ব্যারিস্টরদের পক্ষে ঠিক এরকম বাধা না থাকলেও নতুন সদস্য গ্রহণের সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমাত্র তাঁরাই মেম্বার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা যাঁদের শীর্ষস্থানীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে এ-ওয়ান। ক্লাবের কৌলিন্য যাতে কলুষিত না হয় সেজন্য সজাগ দৃষ্টি আছে কর্তৃপক্ষের।

ক্লাবের টেনিস লন আছে, সুইমিং পুল আছে, ব্যান্ড আছে। মায় নিজস্ব ধোবা পর্যন্ত। নয়াদিল্লীতে এইটি একমাত্র ক্লাব যেখানে শুধু পান, ভোজন ও অবসর বিনোদনের নয়, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থাও আছে। আই· ডি· জি· কেবলমাত্র খেলা বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, পুরোপুরি ক্লাবই বটে।

দু' নম্বর ক্লাব,—চেমসফোর্ড। সেক্রেটারিয়েটের কাছাকাছি রাইসিনা ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের সঙ্গমস্থলে এই ক্লাবটি সব চেয়ে সরগরম। প্রথমতঃ এর দক্ষিণা তেমন সাঙ্ঘাতিক নয়, দ্বিতীয়তঃ এর অবস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক এবং তৃতীয়তঃ এখানে অভারতীয় অল্প। সদস্য গ্রহণেও অতটা কড়াকড়ি নেই। চেমসফোর্ডের সুইমিং পুলে ফি বছর এখানকার সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে, গ্রীষ্মকালে বাইরে। বাইরে অবশ্য কাঠের ফ্লোর নয়, শান বাঁধানো। বাগবাজারের রসগোল্লার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের পকৌড়া—অর্থাৎ ফুলুরিরও নাম আছে।

মহিলাদের এখানে পৃথক চাঁদা দিতে হয় না। স্বামীর গরবে গরবিনীরা স্বচ্ছন্দে এসে বসেন পুরুষ বন্ধুদের তাসের টেবিলে। সুদক্ষ পার্টনার পেলে কেবলই ডামি হন। না পেলে তিন রঙের তিনখানা অনার্স কার্ড সম্বল করে মিহি সুরে ডাকেন,—টু নো-ট্রাম্পস্। দেনার সুদের মতো হারের হার বাড়ে হু হু করে। খেলার শেষে খাতায় সই করে আসেন নিঃশঙ্কে। মাসের শেষে স্বামী বেচারা কম্পিত হৃদয়ে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ করি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অফিসারই চেমসফোর্ডের সদস্য। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ—কোনো দেশীয়ই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক দিয়ে পাঞ্জাবীরাই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তাঁরা বিকালে এসে তিন সেট টেনিস খেলেন, সন্ধ্যায় পাঁচ

রাবার ব্রিজ। তিন পেগ হুইস্কি ও চার কোর্সের ডিনার খেয়ে তাঁরা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তার আগেই ইংরেজী ক্যালেন্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে। তাঁদের পৃষ্ঠপ্রদর্শকও পিছনে পড়ে থাকবার পাত্রী নন। ক্লাবে পাঞ্জাবী দম্পতিদের দেখলে সহধর্মিণী কথাটার মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।

বন্ধুদের ক্লাবটি শহরের অপর প্রান্তে। এর চাঁদা সামান্য, সভ্য সংখ্যাও বেশী নয়। বাঙালী আছে, মাদ্রাজী আছে, আসামী আছে এবং আছে আরও অন্যান্য প্রদেশের লোক। এটিও ছেলে এবং মেয়েদের সম্মিলিত ক্লাব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে খ্রীস্টিয় সমাজের।

ক্লাবের রেজিস্টারে যাই থাক, ঘরে মেয়েদের সংখ্যাই যেন বেশী। প্রায় পনেরো জনই কুমারী। গায়ের রং কালো, নখের রং লাল এবং গালের রং ছাই-ছাই। বলা বাহুল্য শেষের দুটো ভগবান প্রদত্ত নয়। তার পেছনে বিলাতী প্রসাধন কোম্পানীর অনেকখানি হাত আছে। বিচিত্র বসন, বিচিত্রতর ভূষণ। একটি মহিলা পরেছেন গোলাপী রঙের একটি সায়ার উপরে একখানা মশারীর নেট, তাতে সাটিনের পাড় বসানো। আর একজনের লেস-বসানো ব্লাউজে সূতোর ব্যবহারে এত কঠোর মিতব্যয়িতা যে, তার দিকে চোখ তুলে তাকালে কান আপনিই লাল হয়ে ওঠে।

বয়স বেশীর ভাগই ত্রিশের ঊর্ধ্বে। দেহে কারো বা ইউক্লিডের সরল রেখা, কেউ বা অঙ্ক শাস্ত্রের ইলিপস্। আমাদের মেয়েদের ভূগোলে নাতিশীতোষ্ণের স্থান নেই,—হয় উত্তর মেরু, নয়তো দক্ষিণ। কেউ করেন মাস্টারী, কেউ নার্স, কেউ বা স্টেনোগ্রাফার।

ক্লাবে ব্যাডমিন্টন আছে, ক্যারম আছে, পিং পং আছে। কিন্তু খেলার চাইতে চং এবং কথার চাইতে ন্যাকামির পরিমাণ বেশী। একটি পঁয়ত্রিশ বছরের বিপুলা মহিলা কোনো এক সাহায্য অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ও আচরণ দেখে বারংবার ইচ্ছা হচ্ছিল, আলাপ করে বলি, ভদ্রে আপনার নিশ্চয়ই ধারণা যে, আপনার ষোলো বছর এখনও পার হয়নি। কিন্তু সেটা যে কুড়ি বছর আগেই কেটে গেছে সে কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।

জানি, এদের উপরে রাগ করে লাভ নেই। ভগবান এদের রূপ দেননি, ভাগ্য দেয়নি বিত্ত। এদের পিতৃকুল আভিজাত্যের খ্যাতিতে গৌরবান্বিত নয়। বয়স ঊর্ধ্বগামী, যৌবন অপগতপ্রায়। এদিকে ঠিকুজি মিলিয়ে অভিভাবকদের পাত্র স্থির করার দিন প্রায় কেটে গেছে। স্কুলে ছাত্রীকে জিরান্ডিয়েল ইনফিনিটিভ মুখস্থ করিয়ে দেহে ও মনে নেমেছে ক্লান্তি, রাত জেগে অনাত্মীয় অপরিচিত রোগীকে থার্মোমিটার আর আইসব্যাগ দেওয়ার কাজে ধরেছে বিরক্তি, আপিসে "উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নম্বর" টাইপ করে করে জীবনে এসেছে বিতৃষ্ণা।

প্রিয় ও পরিজন নিয়ে নীড় রচনার চিরন্তন মোহ আছে নারীর রক্তে। একখানি ছোট গৃহ একজন প্রেমাসক্ত স্বামী ও একটি দুটি সুস্থ সবল শিশু—এই কল্পনা সে যুগযুগান্ত ধরে পেয়ে আসছে মায়ের কাছ থেকে, মাতামহীর কাছ থেকে, জগতের আদি মানবী আদমপত্নী ইভের কাছ থেকে। সে কল্পনা সত্য হতে পারল না, সে কামনা সার্থক হলো না। অতৃপ্ত বাসনার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জর বক্ষে সে বৃথাই প্রতীক্ষা করেছে এই দীর্ঘকাল। তার দেহে একদিন রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু আজ তার শ্রী গিয়েছে ঘুচে, স্বাভাবিক কমনীয়তা হয়েছে দূর এবং নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ যে লজ্জা তা' হয়েছে লুপ্ত। অবশেষে বঞ্চিত হৃদয়ের অপরিসীম বেদনাকে ঢাকতে সে প্রাণপণে প্রয়াস করছে নানাভাবে। কেউ করছে মহিলা সমিতি, কেউ করছে রেডিওতে বক্তৃতা, আর কেউ বা রুজ, পাউডার ও লিপস্টিক মেখে পুরুষের সঙ্গে করছে নির্জলা ফ্লার্ট।

ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কলেজের ছাত্র আছে, সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারী আছে, ইমার দালাল আছে, ডাক্তার আছে। প্রায় সবাই তরুণ। বিবাহিত সদস্যেরা বেশীর ভাগ খ্রীস্টান এবং কুমার সভ্যেরা বেশীর ভাগ হিন্দু। কারণ সুস্পষ্ট।

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ

বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি, নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে আমরা শুধু মাত্র পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিম্বা শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণী জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সবপ্রধান। সেদিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল ফেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরাণীর মর্যদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারে কর্ত্রী হলেন জননী নয় গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউ-এর আঁচলে আত্মসমর্পণ করল।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই। শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক, নভেলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুক্ত অভিযোগ আজও জেগে আছে বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ ও এমেরিকার সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পর ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিংবা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার চিহ্নের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিব সখীমিথ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পার্বণে প্রয়োজন ছিল ভার্যার। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেকশনে ভোটসংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এ-যুগে সহধর্মিণীর চাইতে সহকর্মিণীকে নিয়ে বেশী রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্য আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান সন্ততিদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিল, বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেনস্ হোমের উদ্ভব হয়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশীটা বান্ধবী। সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিল ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এ-যুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। দরকার হলে তারা আপিসে খেটে টাকা আনতে পারে।

তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ কর্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটেছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সখী ; নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পারো, মনু পরাশর উদ্ধৃত করে মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে পারো। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরম গুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তাঁরা সখীত্বের অবকাশ রাখতে পারেননি। ট্রান্সফারড এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বৌদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

সীতার সাথী ছিলেন লক্ষ্মণ, তাঁর অপর আর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না। বুড়ো হ'লেও ঋষি বাল্মীকি সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকতেও একটি দেবরের অভাব ঘোচেনি। তাই বেদব্যাসকে আনতে হলো,—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্রৌপদীর সখা,—সংকটে শরণ্য, সম্পদে স্মরণীয়।

এযুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে লোক দু'শ টাকা পায় তার পক্ষে বউ কাছে রাখাই কঠিন, বৌদি দূরে থাক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশা করে ফল নেই। একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয়বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথমে যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে পার্টিতে বিলাতফেরত ও বড় চাকুরেদের ড্রইংরুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, আর কাউকে বলে বীণাবউদি কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস' বা 'মিসেস' জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস গুপ্ত, মিস আয়েঙ্গার বা মিসেস সোনেরা জাহীর।

নয়

তিরিশে মার্চ সন্ধ্যায় ফিরোজশাহ-কোটলায় মুনলাইট-পিকনিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইডিয়্যাল হোস্টেস বলে নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুন্দরী, পরিহাসপটু এবং প্রিয়ভাষিণী। বন্ধুসমাগমে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তাঁর।

ফিরোজশাহ-কোটলা দিল্লীর পঞ্চম নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের সময়ে দিল্লী নগরী ছিল বর্তমান কুতুবের নিকটস্থ মেহরৌলীতে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ কিছু কাল পূর্বে এই রাজধানীর নগর প্রাচীর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ প্রিয়তমা কন্যার যমুনা দর্শনাভিলাষ পূরণার্থে পৃথ্বীরাজ তৈরী করেছিলেন কুতুব মিনার। প্রত্যহ অপরাহ্ণ বেলায় প্রসাধন সমাপনান্তে রাজনন্দিনী আরোহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দূরবর্তী যমুনার জলধারা। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিমত, পাঠান সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক নির্মাণ শুরু এবং আলতামাস শেষ করেন জগতের সর্বোচ্চ বিজয়স্তম্ভ এই মিনার।

দ্বিতীয় দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। তাঁর রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মুঘল দস্যুদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, হত্যা ও লুণ্ঠনের দ্বারা বহু নগরনগরী বিধ্বস্ত করে উপনীত হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমতল ভূমিতে তাদের প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। সম্রাট পশ্চাদপসরণ করলেন কুতুবে। মুঘলেরা দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে আত্মীয় ওমরাহদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করল এবং সাধারণ কৃষকদের শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করল। অবশেষে দিল্লীর অসহনীয় গ্রীষ্মের প্রখরতায় ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্যুদল দিল্লী পরিত্যাগ করল। আলাউদ্দিন এই দস্যুদলের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে নির্মাণ করলেন সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নব নগরী, নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে সুলতান নির্মাণ করেছিলেন নিজের জন্য এক মহার্ঘ প্রাসাদ তার কক্ষ সংখ্যা ছিল এক সহস্র। আজ সে প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র নেই।

আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন অসমসাহসিক যোদ্ধা। রাজ্য-জয়ের নেশা ছিল তাঁর রক্তে। তিনি রাজপুতদের পরাজিত করে চিতোর অধিকার করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুস্লিম অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। সেই বিজয় গৌরবকে চিরস্মরণীয় করতে নির্মাণ শুরু করলেন দ্বিতীয় কুতুব। প্রথম কুতুবের চাইতে এর আকার হবে দ্বিগুণ,—এই অভিলাষ ছিল সুলতানের মনে। কিন্তু আরব্ধ কাজ শেষ করার মতো আয়ুর মিয়াদ ছিল না তাঁর। অর্ধসমাপ্ত এই নব পরিকল্পিত কুতুবের চিহ্ন আজও দর্শকজনের কৌতূহল উদ্রেক করে। বর্তমান সিরির স্মারক আছে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং কিছুটা বিরাট নগর প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক। রাজার নামে রাজধানীর পরিচয় মুস্লিম রাজত্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের মুস্লিম নৃপতিদের মধ্যে ফিরোজশাহ তোগলক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর তিনি প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন। দিল্লীর মুস্লিম বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেব ব্যতীত আর সবার চাইতেই তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পরে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের উর্ধ্বে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন্ তোগলকের নাম অব্যবস্থিতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী নৃপতির উদাহরণ রূপে কুখ্যাত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর চরিত্রে বহু রাজোচিত সদ্‌গুণেরও সমাবেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ, কবি, গণিতজ্ঞ এবং সুদক্ষ লিপিকার ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা এবং সহৃদয় দাতা বলেও তাঁর সুনাম আছে। আবার নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দারও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ আরবী পর্যটক ইবন বতুতার আত্মচরিতে সম্রাট মহম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথার্থ বর্ণনা আছে।

"দান করা এবং হত্যা করা এই দুই ব্যাপারেই রাজা মহম্মদ তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। যে পথ দিয়ে তিনি যান সে পথে কোনো না কোনো অতি দরিদ্রকে তিনি ধনী বানিয়ে যান, কোনো না কোনো জীবিত ব্যক্তিকে তিনি পরলোকে পাঠিয়ে দেন। একাধারে তাঁর মহানুভবতার ও নিষ্ঠুরতার শত শত গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরছে।"

ইবন বতুতা নিজে মহম্মদের অধীনে কয়েক বছর দিল্লীর কাজী অর্থাৎ প্রধান বিচারক ছিলেন।

মহম্মদের নানা উদ্ভাবনী বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বহু বিষয়ে পরীক্ষা করায় তাঁর ঝোঁক ছিল। বেশীর ভাগ পরীক্ষারই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে একাধিকবার রাজধানী স্থানান্তরিত করা, দিল্লী এবং দৌলতাবাদের মধ্যে রাজধানীর সমুদয় অধিবাসীর গমন ও প্রত্যাগমন, রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন, চীন জয়ের প্রয়াস ইত্যাদি মহম্মদের সর্বনাশা উদ্যোগের একাধিক কাহিনী স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বাল্যকালে আমরা পড়েছি।

জীবনের শেষভাগে মহম্মদ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বর্তমান করাচীর নিকটবর্তী থাট্টায় এক দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। একদিন প্রভাতে সেখানে এক ধীবর সিন্ধুনদে হঠাৎ এক অদ্ভুত মৎস্য শিকার করেছিল। সে মৎস্য রাজসমীপে উপস্থিত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত আকৃতির এই মৎস্য মানুষের রসনার পক্ষে সুস্বাদু কিনা সে পরীক্ষার বাসনা জাগল মহম্মদের মনে। পাত্রমিত্রের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে সে মৎস্য সম্রাট আহার করলেন। ইহলোকে সেই তাঁর শেষ পরীক্ষা। সেদিনই জীবনান্ত ঘটল তাঁর।

মহম্মদের প্রতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সময়ে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজধানী সিরি ও প্রাচীন মেহরৌলীর মাঝখানে দিল্লীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের বহু প্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু যথোচিত রক্ষাব্যবস্থার অভাবে মুঘল দস্যুদের আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে সেগুলি মুক্ত ছিল না। মহম্মদ তাঁর নিজ প্রাসাদ রচনা করলেন সেখানে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন সিরি থেকে মেহরৌলী। নব নগরীর নামকরণ করলেন 'জাহানপন্না'—বাংলা ভাষায় যার মানে হলো জগতের আশ্রয়। প্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে বৃহৎ এক হ্রদ খনন করেছিলেন পানীয় জলের সংস্থানে। কুতুবের অদূরবর্তী বর্তমান খিরকী গ্রামে আজও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের

অবশিষ্টাংশ। তার গায়ে হ্রদে জল প্রবেশ-ব্যবস্থার চিহ্ন আজও পরিস্ফুট।

বর্তমান কুতুব রোডের নিকটে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে মহম্মদের স্নানাগার, তাঁর জেনানা ও তাঁর বিখ্যাত মক্ষ, যেখানে বসে প্রত্যহ তিনি তাঁর সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। আলাউদ্দিনের সহস্রস্তম্ভ কক্ষের অনুরূপ মহম্মদও একটি বিরাট কক্ষ নির্মাণ করেছিলেন, যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও কৌতূহলী দর্শকদের বিস্মিত করে।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে ফিরোজশাহ তোগলক সম্রাট হলেন। মহম্মদের তিনি আত্মীয় এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিন্ধু থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। রাজ্যের গঠন কার্যে মনোনিবেশ করলেন অবিলম্বে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, ফিরোজশাহই ভারতের সর্বপ্রথম নরপতি যাঁর ধমনীতে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশে ছিল। তাঁর জননী ছিলেন রাজপুতানী।

দুই বিভিন্ন ধর্মের সম্মিলিত প্রভাব তাঁর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক স্পৃহা ছিল। মুস্লিম যুগের প্রথম কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ফিরোজশাহ। অধুনা ওয়েস্টার্ন যমুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনিই খনন করেন। কর্নালের নিকটস্থ যমুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এর এক শাখা এসেছে দিল্লীতে, অপর শাখা গেছে হিসারে। ফিরোজশাহের আমলে এই খালের পরিধি বিস্তৃততর ছিল। সম্রাট সাজাহানের আদেশে তৎকালীন পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ আলী মর্দান খাঁ এই খালের সংস্কার সাধন করেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সম্রাট সাজাহানের রক্তেও হিন্দু প্রভাব ছিল। তাঁর জননী যোধপুরী বেগমও রাজপুতানী ছিলেন। আহম্মদশাহ আব্দালী কর্তৃক দিল্লী অবরোধ কালে এ খালটি দ্বিতীয়বার বিনষ্ট হয় এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজ শাসকগণের চেষ্টায় তার পুনঃ সংস্কার ঘটে।

সৌধ নির্মাণে ফিরোজশাহের গভীর অনুরাগ ছিল। এদিক দিয়েও সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল। কুতুব মিনারের ঊর্ধ্বতন যে দুটি তলা শ্বেত পাথরে গড়া তা ফিরোজশাহেরই কীর্তি। ভূমিকম্পে কুতুবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই করেছিলেন। দিল্লীর হিন্দুরাও হাসপাতালের সংলগ্ন 'রীজে' এখনও তাঁর নির্মিত মৃগয়াগৃহের ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

সিরি, বিজয়মন্ডল ও কুতুবে তিন তিনটি নগরী থাকা সত্ত্বেও ফিরোজশাহ যমুনার ধারে আর একটি নূতন নগরের পত্তন করলেন। একেবারে যমুনার ঠিক গায়ে নির্মাণ করলেন রাজপুরী ফিরোজশাহ-কোটলা। আজ তোরণপথে ঢুকলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন। একদা সেখানে ছিল ফিরোজশাহের দরবার গৃহ। আজ আমাদের পিকনিক পার্টির আসর বসল সেখানে।

দলটি ক্ষুদ্র নয়। ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনায়িকা আহার্য যা এনেছেন, তা দিয়ে অনায়াসে তার ডবল লোকের উদর পূর্তি করা যেতে পারে।

পিক্‌নিকে সব চেয়ে যিনি মনোযোগের যোগ্য, তিনি মিস্টার খোশ্‌লা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে মহিলা মহলে। মেয়েরা এগজিবিশন করেছেন, তার দরজায় ভলান্টিয়ারী করেছেন কে? মিস্টার খোশ্‌লা। মহিলা সমিতি দামোদর বন্যার সাহায্য ভাণ্ডারে টাকা তুলেছেন। মেয়েদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন কে? মিস্টার খোশ্‌লা। চাঁদনী চক থেকে মিসেস মুখার্জীর উল কিনে আনছেন, মিসেস স্বামীনাথনের জন্য পাঁচ দোকান ঘুরে পন্ডস্ ক্রীম যোগাড় করছেন। সমস্তই মিস্টার খোশ্‌লা। নয়াদিল্লীতে মেয়েরা আছেন অথচ মিস্টার খোশ্‌লা নেই, এমন কোনো সভা, সমিতি, পার্টি, পিক্‌নিক কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

সাধারণ পাঞ্জাবীর তুলনায় বেঁটে, দোহারা চেহারা। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। নির্বাক যুগের চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস-এর অনুকরণে দীর্ঘ জুলপি গালের মধ্যপথ পর্যন্ত প্রসারিত। হিটলারের মতো গোঁপের কায়দা। পরিধানে ব্রাউন রঙের কর্ডরয়ের প্যান্ট, পায়ের গোড়ালির কাছটা সরু। প্যান্টের পিছনে হিপ্-পকেট। তাতে মনোগ্রাম-করা লম্বা রুপার সিগারেট কেস থাকে

গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট রাখা চলে। গায়ে গ্যাবার্ডিনের কোট। প্রায় আজানুলম্বিত! নীচের পকেট দুটি ঈদের চাঁদের আকৃতিতে কাটা। সিল্কের সার্ট। টকটকে লাল রঙের টাই, তাতে নীল রং-এর লতাপাতার ছাপ। মাথায় একটি সবুজ ফেল্টের টুপি, নীচের দিকে নামিয়ে পরেন। পায়ে কখনও কম্বিনেশন সু, কখনও বা বাক্‌লস আঁটা সুয়েডের জুতা। দিনের বেলায় চোখে এক জোড়া মোটা শেলের ফ্রেমযুক্ত সানগ্লাশ। রোদ থাক আর নাই থাক। মেয়েদের হাতে রিস্টওয়াচের মতো মিস্টার খোশ্‌লার প্রকৃত পেশা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে তিনি কনট্রাক্টর, কেউ বলে তিনি দু' তিনটে বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, আর কেউ বা এমন কিছু বলে যার ইংরেজী তর্জমা করলে কথাটা দাঁড়ায়,—স্রেফ লোফার। তিনি নিজে কার্ডে নামের পিছনে লেখেন একটি শব্দ যা দিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার থেকে শুরু করে বাবুগঞ্জের হাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার পতিতপাবন সাহাকে পর্যন্ত বুঝানো যায়। মার্চেন্ট। কিন্তু কাজ তাঁর যাই হোক, ব্যস্ততার অভাব নেই। এই দারুণ পেট্রোল রেশনিং-এর দিনেও সারাদিনই দেখা যায় তিনি তাঁর বেবী অস্টিন নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পথে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বলেন "আচ্ছা ভাই, এখন বড্ড ব্যস্ত। আবার দেখা হবে, শ্যাল সি ইউ এগেন।"

পিক্‌নিকে খোশ্‌লা বিপুল উদ্যমে মেয়েদের আহার্য পরিবেশন করলেন। স্যান্ডউইচের প্লেট নিয়ে ছুটতে গিয়ে প্রায় আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। সন্দেশের থালা নিয়ে হন্তদন্ত হলেন, কোনো মহিলাকে "প্লিজ" কোনো মহিলাকে বা "ফর মাই সেক", বলে দুটো বেশী পেস্ট্রী খাওয়ালেন। একটি তরুণী অন্য কার কাছে এক গ্লাশ জল চাইছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিস্টার খোশ্‌লা। তাঁর কানে যেতেই "জল, জল, মিস উপাধ্যায়ের জন্য জল" বলে এমন উতলা হয়ে জলের অন্বেষণে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো, হাতের কাছে অন্য কোথাও না পেলে তিনি বুঝিবা তৎক্ষণাৎ ভগীরথের ন্যায় গঙ্গা আনয়নের জন্য কৈলাসে ছুটবেন!

শ্রীমতী সুব্বা রাও প্রস্তাব করলেন চারিদিকে ঘুরে দেখবার। দেখার মধ্যে যা আছে তা ফিরোজশাহ নির্মিত একটি মসজিদ। সুলতান পাত্রমিত্র নিয়ে জুম্মার দিনে প্রার্থনা করতে আসতেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, সেদিন এই মসজিদের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। যদিও আজ ভগ্নদশা দেখে তার বিগত সৌষ্ঠব বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু তার গঠন'-পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতো। ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রোপোরশন'—ফিরোজশাহ-কোটলার মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষে তা বিশেষভাবে বর্তমান।

ফিরোজশাহের আমলে সর্ব প্রথম ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুস্লিম পদ্ধতির সিন্‌থেসিস ঘটেছিল। প্রাক্‌মুস্লিম যুগের উত্তর ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। অতি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে এখনও তার চিহ্ন আছে। বর্তমানে জৈন পদ্ধতি নামে অভিহিত এ স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় রাজপুতনার মাউন্ট আবু পর্বতোপরি বিখ্যাত মন্দিরটি।

সেদিনের হিন্দু স্থাপত্যে আর্চ—অর্ধবৃত্তাকার গঠন—ছিল না। তার বৈশিষ্ট্য ছিল চতুষ্কোণ স্তম্ভে। এই স্তম্ভগুলি কারুকার্যখচিত! কোনোটাতে দেবদেবীর মূর্তি, কোনোটাতে পুষ্পসজ্জা, কোনোটাতে বা ঘণ্টা কিংবা গাছ। প্রস্তরে গঠিত এই স্তম্ভগুলির অলঙ্করণের মধ্যে মিলত সেদিনকার স্থপতিদের মণ্ডন-চাতুর্যের পরিচয়। সেকালের স্থাপত্যে গম্বুজেরও অস্তিত্ব ছিল না। চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড একটির পর একটি সাজিয়ে দু'দিক থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে আনা হতো মাঝখানে। দ্বার, গবাক্ষ ও প্রবেশপথের উপরাংশে আর্চের পরিবর্তে এই গঠন অনেকটা যাগ-কাটা সিঁড়ির মতো দেখায়। আর্চের ভারবহন ক্ষমতা অধিক এবং তার ব্যবহার য়ুরোপ ও মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল।

এই স্থাপত্যের প্রথম পরিবর্তন ঘটল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। দাস বংশের কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীতে এসে প্রথম তৈরী করতে চাইলেন একটি মসজিদ যেখানে বসে তিনি আল্লার কাছে পাঠাতে পারবেন প্রচুরতর অর্থ প্রবলতর প্রতাপ এবং প্রভূততম শান্তি কামনা করে প্রাত্যহিক আবেদন। বলা বাহুল্য তাঁর নিজ জন্মস্থান আফগানিস্থানে যে-ধরনের মসজিদের সঙ্গে

তিনি আশৈশব পরিচিত তারই অনুরূপ ভজনালয় নির্মাণ করা ছিল তাঁর বাসনা। সে-মসজিদ পয়েন্টেড আর্চের, অনেকটা গণিত শাস্ত্রের দ্বিতীয় বন্ধনীচিহ্নের মতো খিলানের উপর তৈরী।

রোমানরা ব্যবহার করতো বৃত্তাকার আর্চ। আরবীয়রা পছন্দ করতো পয়েন্টেড আর্চ। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পয়েন্টেড আর্চ সম্বলিত স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইরাকের অন্তর্গত সামাররার মসজিদটি। হিন্দু স্থপতিদের জানা ছিল না তার নির্মাণ কৌশল। কাবুল কান্দাহার থেকে মুস্লিম কারিগর আনাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুস্লিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোঁজামিলন। কুতুব মিনার সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে। সে মসজিদের বারান্দায় ও দ্বারপথে অর্ধবৃত্তাকার গঠন সত্যিকার খিলানের উপর নয়। তাতে 'কী-স্টোন' নেই।

মুস্লিম স্থাপত্যে দেবদেবীর মূর্তি বা পুষ্প ও বৃক্ষলতা উৎকীর্ণ করার রীতি ছিল না। কোরাণের বচন উদ্ধৃত হতো মসজিদের প্রাচীরের গায়ে ও আর্চের উপরে। আরবী লিপি ও কোরাণের বচনা সম্পর্কে কুতুবুদ্দিনের মসজিদ নির্মাণরত ভারতীয় রাজমিস্ত্রীদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাই কৃত্রিম আর্চের উপরে তারা বৃক্ষ অঙ্কন করে তার আশেপাশে আরবী বচন উৎকীর্ণ করার প্রয়াস করেছে কোনো মতে। হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন মসজিদের সংলগ্ন মণ্ডপে আরও অধিকতর প্রকট। তার স্তম্ভগুলি নিঃসন্দেহে কোনো হিন্দু মন্দির থেকে আহৃত। সেকালের মুস্লিম নরপতিরা লুণ্ঠনকে লজ্জার বিষয় মনে করতেন না। বরং অপহৃত দ্রব্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা বিজয়স্তম্ভ রচনা করে আপন অপকীর্তির সাক্ষ্য রাখতেন পরবর্তীকালের জন্য।

সুলতান আলতামাস কুতুবুদ্দিন রচিত মসজিদের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হয়ে গজনী থেকে আনলেন মুস্লিম স্থপতি ও কারিগর। তারা জ্যামিতিক পদ্ধতির মুস্লিম অলঙ্করণ প্রচলন করল ভারতবর্ষে। খিলজী যুগে অধিক সংখ্যক মুস্লিম রাজমিস্ত্রী এল আফগান থেকে। তারা প্রবর্তন করল চতুষ্কোণ স্তম্ভের পরিবর্তে 'কী-স্টোন'-যুক্ত সত্যিকার আর্চ, সমতল ছাদের বদলে গম্বুজ, চলতি ভাষায় যাকে বলে শিকারা, এবং ঘণ্টা, পুষ্প, বৃক্ষ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সজ্জা। ভারতে পুরোপুরি মুস্লিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কুতুব সংলগ্ন আলাই দরওয়াজা ও নিজামুদ্দিনের জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দু প্রভাববর্জিত একান্তভাবে মুস্লিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

তোগলক রাজত্বে, বিশেষ করে ফিরোজশাহের নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ ও অন্যান্য অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্ব্যবহার দেখা গেল। সে যুগের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চুন সুরকির আস্তর দিয়ে তা তৈরী,—খিলজী আমলে ও পরবর্তী মুঘল যুগে ব্যবহৃত লাল বা শ্বেত পাথরের চিহ্ন বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রভৃতিতে ফিরোজশাহের পূর্ববর্তী রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল, ব্যয়বহুল প্রস্তর ব্যবহার আর সম্ভব ছিল না। মহম্মদ তোগলক কর্তৃক বারংবার দিল্লীর অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিস্ত্রীর অভাব ঘটাও বিচিত্র নয়।

ফিরোজশাহের সৌধাবলীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, চতুষ্কোণ স্তম্ভের ব্যবহার, দ্বারপথে ও বারান্দায় আর্চের বদলে হিন্দু পদ্ধতির গঠন এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ প্রাচীর-সজ্জা। ফিরোজশাহ নির্মিত হাউজ খসের পরবর্তী অংশগুলিতে আছে এর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মসজিদের গায়ে যে অট্টালিকার উপর অশোক স্তম্ভটি আছে তার আরোহণপথ খুব কঠিন নয়। সিঁড়ির ধাপগুলি কিছুটা উঁচু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গী নারীবাহন মিস্টার খোশলা থাকতে মেয়েদের চিন্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটি মহিলা নিরাপদে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তিনি নীচে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন। বেশী পরিচিতাদের হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন এবং সদ্য পরিচিতাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "মে আই—।"

অশোক স্তম্ভটি প্রাসাদের যে অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজশাহের অন্দরমহলের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত। স্তম্ভটি প্রস্তর নির্মিত। আম্বালার নিকটবর্তী এক গ্রামে সম্রাট অশোক কর্তৃক এই স্তম্ভটি

স্থাপত হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে। একদা মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তা' ফিরোজশাহের চোখে পড়ল। পুরাকীর্তিতে ফিরোজশাহের গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সেখান থেকে স্তম্ভটি তুলে নিয়ে এলেন তিনি দিল্লীতে, তাঁর রাজধানী ফিরোজশাহ-কোটলায়।

বিয়াল্লিশ চাকার গাড়িতে চাপিয়ে শত শত মজুর টেনে এনেছিল এই স্তম্ভটিকে। স্তম্ভটির শীর্ষে একটি স্বর্ণ নির্মিত আচ্ছাদন ছিল। পরবর্তী যুগে জাঠ দস্যুরা দিল্লী লুণ্ঠনকালে তা' আত্মসাৎ করেছে। বহুবর্ষ পরে স্তম্ভের গায়ে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। অহিংসা ও সর্বজীবে দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে যে বহুশত অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, এই স্তম্ভে তারই একটি সাক্ষ্য রয়েছে।

অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরবর্তী যমুনার জলস্রোত। ফিরোজশাহের আমলে যমুনার ধারা কোটলার পাদদেশ স্পর্শ করত সে কথা বুঝতে আজও কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

নীচে নেমে সদলবলে বসা গেল খোলা মাঠের মধ্যে। পাশে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, বাউলী। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সুলতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্রাম করতেন এর তীরবর্তী পাষাণ-বেদিকায়।

কে একজন বললেন, "তাস সাথে থাকলে একহাত খেলা যেত।"

আমাদের অধিনায়িকা অমনি তাঁর তোরঙ্গ থেকে বার করলেন দু'প্যাকেট সুদৃশ্য ঝক-ঝকে তাস, নম্বর লেখার ছাপানো প্যাড ও পেন্সিল।

সবাই জয়ধ্বনি করে বলল—"একেই বলে দূরদৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা যিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, তাঁরই নাম অনাগতবিধাতা।"

ডাক্তার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। আর্মিতে লেফটেনেন্ট কর্নেল। অত্যন্ত রসিক লোক। মাথার পাকা চুল দিয়ে মনের কাঁচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইল দশেক দূরবর্তী ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছেন পিক্‌নিকে যোগ দিতে। কন্ট্রাক্টব্রিজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। খুশি হয়ে বললেন, "ক্রীপস্ আলোচনা চলছে। স্বরাজ হলে আমরা ওঁকেই প্রেসিডেন্ট করব। স্বাধীন ভারতে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, মিসেস বিজয়া ব্যানার্জী। বিজয়া ব্যানার্জী কী—"

সবাই মিলিত কণ্ঠে উচ্চধ্বনি করলেন, "জয়।"

বাধা দিয়ে বললেম, "কর্নেল, প্রেসিডেন্ট বললেই মনে হয় পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা। তার চাইতে বলুন মহারাণী।"

কর্নেল তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন ; "ঠিক বলেছ ভায়া। মহারাণীই ভালো। দিল্লীর দ্বিতীয় মহিলা সম্রাজ্ঞী। সুলতানা রিজিয়ার পরে সুলতানা বিজয়া। জয় মহারাণী বিজয়া কী জয়। বন্দে মাতরম, আল্লা হো আকবর, হিপ্ হিপ্ হুররে।"

ভাবী সুলতানা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "একসঙ্গে তিনটাই বলেন নাকি আপনি ?"

"নিশ্চয়। গান্ধী মহারাজ, জনাব জিন্না ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে খুশি রাখতে হয়। যখন যাঁর হাতে ক্ষমতা আমি তাঁরই দলে আছি। অবস্থা অনুযায়ী যার যত তাড়াতাড়ি মত বদলায় ইংরেজীতে তাকেই তো বলে তত প্রগ্রেসিভ।"

মিস্টার জুবেরী সদ্য আই· সি· এস· হয়েছেন। বিলেতে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে কিছুকাল পড়েছিলেন। সোশ্যালিজমে এখনও ভক্তি আছে। বললেন, "মহারাণী তো মনার্কিজম। ডেমোক্রেসির যুগে তা' চলবে না।"

কর্নেল বললেন, "খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনার্কিজম চলছে, আর ঘরের বাইরে গভর্নমেন্টে চলবে না ? ভায়া হে, তোমার বয়স অল্প, শিখতে এখনও ঢের বাকী। ডেমোক্রেসি বস্তুটা আছে শুধু হ্যারল্ড ল্যাস্কির বইতে। আমাদের মিস্টার ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তাঁর বাড়িতে তাঁর জানলার পর্দা নীল হবে কি সবুজ হবে, সকালে সুক্তো রান্না হবে কি ছেঁচকি রান্না হবে—এসব সিদ্ধান্ত ব্যানার্জীর ভোট নিয়ে ঠিক হয়, না মহারাণীর হুকুমে চলে ? বিয়ে করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, হার মেজেস্টিস্ গভর্নমেন্টে আর যাই থাক, লীডার অব দি অপোজিশন নেই।"

প্রবল উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো সভায়।

লজ্জাজড়িত আত্মপ্রসাদে মহিলার গৌর গণ্ডদ্বয় রক্তিম হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর কথা নয়। আসুন এবার খেলা যাক।"

হাত জোড় করে বললেম, "মাপ করবেন ও বিদ্যে আমার একেবারে জানা নেই।"

"বলেন কী? আচ্ছা তা হলে খেলা থাক। গান করুন।"

"কী সর্বনাশ! তার চাইতে বরং কুতুব মিনারের উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে বলুন। না হয় আপনার খাতিরে তাই চেষ্টা করে দেখব। গান করলে অবশ্য লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা হবে আপনাদের।"

ব্যানার্জী বললেন, "তবে আবৃত্তি শোনান, রবি ঠাকুরের কবিতা।"

জবাবে বললেম, "ছোটবেলায় সংস্কৃত শব্দরূপ আর বড় হয়ে জুরিস্‌প্রুডেন্সের ধারা মুখস্থ করে করে কবিতা মনে রাখবার আর সময় পেলেম কখন?"

মিসেস বললেন, "আচ্ছা, তা হলে গল্প বলুন।"

ডাক্তার অধিকারী অ্যামেন্ডমেন্ট যোগ করলেন,—"প্রেমের গল্প।" হেসে বললেম, "কর্নেল, প্রেমের হলে সেটা যে গল্পই হবে, সত্যি হবে না, সে তো জানা কথা। কিন্তু সে গল্পও আমার জানা নেই। চান তো ভূতের গল্প বলতে পারি। জানেন, এই বাউলীর ধারে ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র যেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজরক্তের দাগ আছে? সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরকে এখানে হত্যা করা হয়।"

"ও মাগো!"—বলে ত্রিং করে লাফ দিয়ে সরে একেবারে দলের মাঝখানটিতে এসে বললেন মিসেস মিত্র। বার বার নিজ শাড়ির দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সত্যিই রক্তের দু' একটি ছিটে ফোঁটা তাঁর বসনে লেগেছে কিনা সেই আশঙ্কায়। সবাই খানিকটা হেসে নিল। কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও যে একটু চঞ্চল না হলেন তা নয়।

মিস্টার খোশ্‌লা মিসেস মিত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেয়েদের ভয় দেখানো মোটেই উচিত হয়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে শক্ লাগলে সাঙ্ঘাতিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিনায়িকা দমবার পাত্রী নন। বললেন, "বেশ, বলুন ভূতের গল্প। সত্যি ভূতের হওয়া চাই কিন্তু। বানানো নয়।"

"মিসেস ব্যানার্জী, ভূত চিরকালই বানানো হয়ে থাকে। ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাও আমি জানি নে।"

মহিলা সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আপনি কেবলই ফাঁকি দিচ্ছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, গল্পও নয়। একটা কিছু করুন।"

কর্নেল বললেন, "তাই তো হে, তোমার কেস খারাপ হচ্ছে। তুমি যদি কোনো কিছুই না পার তবে মহারাণীর গভর্নমেন্টে তোমার জায়গা হবে না।"

মহিলা বললেন, "সত্যি তো! আপনাকে নিয়ে করব কী? গান গাইতে জানেন না যে, বৈতালিক হবেন! পদ্য কইতে পারবেন না যে, সভাপণ্ডিতের চাকরি দেব। গল্প বলতে পারেন না যে, বয়স্য করব। এমন অকর্মা লোক আপনি, হবেন কী?"

যুক্তকরে বললেম, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।"

বিপুল হাস্যরোল।

দশ

আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগীর অত্যাসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরেও যে প্রফেসন্যাল নির্লিপ্ততা নিয়ে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে যান, ক্রীপস্ আলোচনা সম্পর্কেও বর্তমানে আমাদের সেই মনোভাব উপস্থিত। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে সমবেত জার্নালিস্টদের মনে এখন আর সংশয় নেই। প্রশ্ন এখন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবার নয়, প্রশ্ন কবে আলোচনার অসাফল্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

অথচ মাত্র সপ্তাহ দুই পূর্বেও ক্রীপস-দৌত্যের এই পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ ছিল না। বরং এই রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা সম্মানজনক মীমাংসার ফলে ভারতে জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশাই বেশীর ভাগ লোকে পোষণ করেছে।

উনিশ শ একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান বৃটেন ও এমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথম দিনেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলো। তিন দিন পরে বৃটিশ নৌবহরের অন্যতম গর্ব ও নির্ভর প্রিন্স-অব-ওয়েলস ও রিপালস্ জাপানী বোমার আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে সলিল সমাধি লাভ করল। দেখতে দেখতে হংকং ও মালয় জাপানীরা কেড়ে নিল। ষোলই ফেব্রুয়ারী সুদৃঢ় প্রাচ্যে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি—যা দুর্ভেদ্য বলে সবার ধারণা ছিল—সিঙ্গাপুরের পতন।

দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনকালে এই প্রথম জল এবং স্থলপথে ভারতবর্ষ শত্রু আক্রমণের সম্মুখীন। কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ, সাধারণের মনে ভীতি এবং সহজবিশ্বাসপ্রবণ অজ্ঞজনের অসংবদ্ধ রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক রটনার সৃষ্টি হলো।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাউস অব কমন্সে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন—ওয়ার ক্যাবিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি ন্যায়সঙ্গত ও চূড়ান্ত সমাধান—জাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সলিউশন—স্থির করেছেন এবং লর্ড প্রিভিসীল সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ নিজে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতি সংগ্রহের জন্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবটি নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতের দাবি। বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব। মাসখানেক পূর্বে মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ব্রিটেনকে ভারতীয়দের হাতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তার পরেই সুস্পষ্ট ভাষায় চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, অ্যাটলান্টিক চার্টার সমগ্র পৃথিবীর জন্য, কেউ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অষ্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী এভাট সেখানকার পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে বললেন, সে দাবির প্রতি অষ্ট্রেলিয়ানদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সম্মিলিত জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান অনুকূল মনোভাব ও প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা ব্রিটেনের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ বিব্রত হচ্ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায়। সে কারণ সহৃদয়তার নয়, অনুরোধ উপরোধ বা উপদেশজাত নয়। কারণ কঠোর বাস্তব ঘটনা পরম্পরার। আটই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হলো, ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটল। ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত ও ইংরেজের অনুকূল করার প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্বে এমন আর কখনও অনুভূত হয়নি। এগারই মার্চ চার্চিল ক্রীপস্ মিশনের কথা ঘোষণা করলেন।

তবুও একথা মানতেই হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এদেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের এই নব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করল। বোধ হয় এতদিনে সত্য সত্যই ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যার সত্যিকার সমাধানে উৎসুক। ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃত।

ভারতে এই অনুকূল মনোভাবের পশ্চাতে ছিল মন্ত্রিসভার ভারপ্রাপ্ত আলোচনাকারী ব্যক্তিটির প্রতি ভারতবর্ষের আস্থা। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতবর্ষ বর্তমান শতাব্দীর মুষ্টিমেয় ভারতহিতৈষী ইংরেজের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করে থাকে। ক্রীপস্ ইতিপূর্বে দু'বার ভারতবর্ষে এসেছেন। কংগ্রেস নীতি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিনি একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একাধিকবার ভারতে ইংরেজ শাসনের ত্বরিত সমাপ্তি কামনা করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। বেশী দিনের কথা নয়, য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার সাত সপ্তাহ পরে হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়ব্যঞ্জক স্বরে ক্রীপস বলেছেন, "কংগ্রেসের নয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত

বলতে যা বুঝায় ভারতবর্ষের তেমন কোনো সেনাবাহিনী নেই। ভারতে সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে পেশাদার সিপাহীদল থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই সিপাহীদের সংগ্রহ করা হতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একের পর এক করে কোম্পানী নগর, প্রদেশ ও রাজ্য দখল করেছে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করেছে সিপাহীদল, বেতনের আকর্ষণে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার নিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সেনাবাহিনীও সম্রাজ্ঞীর অধীন হলো। শুরু হলো পরিবর্তন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করলেন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতি দুটি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন এক ব্রিটিশ বাহিনী, যাতে কোনোদিন কোনো কারণে ভারতীয় বাহিনী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হলে অবিলম্বে দমন করা চলে তাদের। সিপাহী বিদ্রোহেব আগে ছয়টি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি মাত্র ব্রিটিশ বাহিনী থাকতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে একটিও ভারতীয় নেওয়া হয়নি উনিশ শ পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অফিসার র‍্যাঙ্কে ভারতীয় যাঁরা ছিলেন তাঁদের আঙুলে গোনা যায় এবং যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ মেজরের উপরে ওঠেনি। সামরিক বিচারে বোধ করি তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের মেজরিটি প্রাপ্তি ঘটেনি।

সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হলো সৈন্যদলের লোক নির্বাচনে। 'সামরিক' ও 'অসামরিক' জাতি, এই কৃত্রিম শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ভারতীয় বাহিনী থেকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সব দেশের লোককে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে যাঁদের কিছুমাত্র দখল আছে তাঁরাই জানেন ভারতে ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের এক প্রধান অংশ সম্ভব হয়েছিল বর্তমানে 'অসামরিক' জাতি বলে উপেক্ষিত বাংলা ও মাদ্রাজের সিপাহী সান্ত্রীদেরই বাহুবলে। বর্তমানে অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণে যে সকল ইংরেজ রাজনীতিক মুসলমানদের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় গদগদ এবং ইংরেজের অবর্তমানে ভারতে গৃহ-যুদ্ধ ঘটলে হিন্দুদের অসহায়ত্ব নিয়ে যাঁরা প্রায় অশ্রু-বর্ষণ করেন, সেই ভারতবন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের কালে যারা শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং যাদের কাছে ইংরেজ সর্বাধিক প্রতিরোধ পেয়েছে, তারা মারাঠা ও শিখ। এদের প্রথমটির ধর্মমত অবিমিশ্রিত হিন্দু, দ্বিতীয়টিও হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারোত্তর রূপ। একটিও ইসলাম নয়।

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতি সেনা বিভাগের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কী? কেউ বলেন, উত্তর ভারতের লোকেরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ও দৈহিক গঠনে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নত। কিন্তু সেটাই সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গুর্খাদের তাহলে কোনকালেই খাকী পরতে হত না। বিশেষ করে সৈন্যদের কৃতিত্ব যে-যুগে তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করতো, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতিপ্রথা সৃষ্টি করা চলে। সামরিক বৃত্তি অনেকাংশে পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমি স্বার্থবোধ জাগে। নিজেকে তারা সে বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অংশবিশেষ বলে জ্ঞান করে। ঠিক যেমন করে কলকাতার বড় বড় বিলাতী কোম্পানীগুলির ক্যাশিয়ার, বড়বাবু, বা বেনিয়ানরা। বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসনযন্ত্রের প্রতি শাসিতের এই মমত্ববোধ সৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।

তার চাইতেও বড় কারণ আছে। সে কারণ রাজনৈতিক। স্বীকার করতেই হবে যে, কিছুকাল পূর্বেও ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত ছিল রাজনৈতিক চেতনাহীন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরেনি। আধুনিক কালেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গদর দল ও কোমাগাটামারুকে নিয়ে যাঁরা পাঞ্জাবের দেশপ্রাণতার প্রশস্তি রচনা করেন তাঁদের স্মরণ রাখা

প্রয়োজন যে, সে পাঞ্জাবীরা বিদেশে গিয়েই দেশাত্মবোধের ধ্বজা উড্ডীন হয়েছিল, দেশে থাকতে নয়। সাধারণ পাঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা মাইনে, অজস্র আহার ও নতুন পোষাক পেলেই খুশি থাকে, দেশ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিং-এরা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতীয় সেনা বিভাগে বাঙালীরাই সব চেয়ে বেশী অবাঞ্ছিত। অবশ্য মনুসংহিতায় তারা হরিজন। আশ্চর্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে তারই ভাবতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে অবিরত, সংগ্রাম করে আসছে অমিত তেজে। ভারতের আধুনিক জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে এইখানে। জাতীয় যজ্ঞে এখানে মায়েরা আহুতি দিয়েছে পুত্র, মেয়েরা দিয়েছে প্রেরণা, ছেলেরা দিয়েছে প্রাণ। এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে কার্জন করেছে বঙ্গ-ভঙ্গ, হার্ডিঞ্জ স্থানান্তরিত করেছে রাজধানী, ম্যাকডোনাল্ড কায়েম করেছে কমিউনাল এওয়ার্ড। সর্বনাশ! এদের সেনাদলে নিলে রক্ষা আছে? এইখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল বাংলাদেশেরই এক ছাউনিতে। ব্যারাকপুরে।

'সামরিক জাতির' প্রতি এই পক্ষপাত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। অভাব অভিযোগের ফলে পাছে তাদের ব্রিটিশ-অনুরক্তি হ্রাস পায় সেজন্য ব্রিটিশ শাসকেরা এই 'সামরিক জাতির' পার্থিব কল্যাণ সাধনে অনেকটা তৎপর হয়েছেন, সে কথাও সত্য। সেনা বিভাগের বেতনের হার ও পেন্সন সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। তা ছাড়া বার্ধক্যে অবসর গ্রহণকালে অনেকে জায়গীরও পেয়েছে।

পাঞ্জাব সেনাবিভাগের সৈন্য ও অশ্ব যোগায়, তাই পাঞ্জাব সর্বদাই কর্তৃপক্ষের অধিকতর সস্নেহ মনোযোগ লাভ করে এসেছে। কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নয়ন-পরিকল্পনা পাঞ্জাবে হয়েছে বেশী। সমবায় আন্দোলন ও কৃষিবিদ্যার গবেষণা শুরু হয়েছে সেখানে এবং ভারতে ব্রিটিশ যুগের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ব্যয়বহুল কৃত্রিম সেচকার্যের নিদর্শন আছে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষীরই ক্ষেতে ধান, গোয়ালে গরু এবং ঘরে আর্মির মেডেল আছে। সেখানে সাহেবকে বলে হুজুর, দারোগাকে বলে ধর্মাবতার, গভর্নমেন্টকে বলে সরকার বাহাদুর। সেখানে স্বরাজের গরজ থাকবে কার?

কিন্তু বন্যা যখন আসে, তখন তাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় কদিন? সমুদ্র যদি কানুনের আদেশ মেনেই চলতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? সমস্ত প্রতিষেধক ও সাবধানতা ব্যর্থ করে দেশাত্মবোধের ধারা এগিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোথাও কোনো প্রান্তে তার আর বাধা রইল না। পশ্চিম সীমান্তে খান আব্দুল গফুর খান এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।

এই বহু অনুগৃহীত অঞ্চলের রাজনীতির সম্পর্কবর্জিত সরল অধিবাসীদেরও তাদের স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এখন আর আগের মতো নিরাপদ নয়। বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, উনিশ শ ত্রিশ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে একদল হিন্দু গাড়োয়াল সৈন্য পেশোয়ারে মুস্লিম স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে গুলীবর্ষণে অস্বীকৃত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। সে সংবাদ এদেশের খবরের কাগজে প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে উনিশ শ একচল্লিশ সাল পর্যন্ত এই সেনাদলের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ ছিল মুসলমান, তেইশ ভাগ শিখ ও বিয়াল্লিশ ভাগ হিন্দু। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ হিসাব থেকেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহুপ্রচারিত সামরিক অযোগ্যতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খুব সামান্য হলেও ভারতবর্ষের সামরিক নীতির প্রথম পরিবর্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর। একান্তভাবে য়ুরোপীয় অফিসার পরিচালিত বাহিনীর সামান্য অংশ ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতীয়েরা সেনাবিভাগে ক্রিংস কমিশন প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয় এবং ভারতীয় সেনানায়কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ভারতীয় স্যান্ডহার্স্ট-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বর্তমান যুদ্ধে এই ভারতীয়করণ দ্রুত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রতি মমত্ববোধে নয়। ইংরেজের নিজ প্রয়োজনের তাগিদে। অসামরিক জাতি বলে সেনাবিভাগে ইতিপূর্বে যাদের প্রবেশের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, তারাও এখন অফিসার হতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপক অনুপ্রবেশের

ফলে সেনাবিভাগে বাঙালীর সংখ্যা এখনও খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার বিশ্বাস নেই, যদিও বিমানবহরে তাদের সংখ্যা তেমন হতাশাজনক নয়। সুদক্ষ বৈমানিকরূপে কয়েকজন বাঙালী তরুণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন।

এতকাল ভারতবর্ষে দেশরক্ষার ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। কমান্ডার-ইন-চীফের সবগুলি কামানের মুখ ছিল আফ্রিদিদের দিকে। একচক্ষু হরিণের মতো পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হওয়ার পরে সেনাপতিরা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন, বিপদ ঠিক সে দিক থেকেই উপস্থিত যে দিকে তার সম্ভাবনা তাঁরা কল্পনাও করেননি।

যুদ্ধ শাস্ত্র মতে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন নৌবহর। তা নেই। জলপথ সবটাই শত্রুর দখলে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় যে পেশাদার সেনাবাহিনী ভারতে বর্তমান, তা আধুনিক যুদ্ধযন্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত নয় এবং তাদের ঘাঁটিগুলি সম্ভাবিত রণক্ষেত্র থেকে বহু শত যোজন দূরে দেশের অপর প্রান্তে।

এই আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার উপায় কী, এ প্রশ্ন সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছে কিনা জানার উপায় নেই। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রহীন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতাশূন্য জনসাধারণের মনে এ জিজ্ঞাসা জেগেছে। অবশেষে একজন এই প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করলেন। তাঁর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন জওহরলাল। কাশ্মীরী পণ্ডিতের বংশধর তিনি। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ রাজকাউল ছিলেন প্রখ্যাতনামা পার্শি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু ছিলেন মুঘল দরবারে নামকরা ব্যবহারজীবী। এডভোকেট জনকের সন্তান জওহরলাল নিজেও মসিজীবীরূপেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। দেশরক্ষার আয়োজনে তিনিই সর্বপ্রথম পরিকল্পনা করলেন সর্বসাধারণের অসিচালনার। জনগণের কথা যিনি ভাবেন তাঁকেই তো আমরা বলি জনগণ-মন-অধিনায়ক।

অস্ত্র? চাই বৈকি। অবশ্যই চাই। পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র যোগাতে দেশে নতুন কলকারখানা স্থাপন ও পুরাতন কলকারখানার বিস্তার প্রয়োজন। সেটা সময়সাপেক্ষ। শত্রু তো তার জন্য অপেক্ষা করবে না। পণ্ডিতজী অত্যন্ত নিকটে থেকে গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন স্পেন ও চীনের গণবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধরীতি। স্পেনে চাষী মজুরদের সমিতি থেকেই গড়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী। তার মধ্যে থেকেই উদ্ভব হয়েছে একাধিক সেনাপতির যারা প্রথম জীবনে কেউ চালিয়েছে লাঙ্গল, কেউ বুনেছে তাঁত। চীন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার লোক আনার পরিকল্পনা করলেন জওহরলাল।

গতিশীলতা ইংরেজীতে যাকে বলে মোবিলিটি, সেই হলো এই বাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুবিধা। রাইফেলের অভাবে হাত বোমা দিয়ে এর কাজ চলে। সর্বত্র এদের সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীরা হতো ব্যগ্র। ক্ষুধায় অন্ন এবং বিপদে আশ্রয় জোগাতো তারা। দেশপ্রাণতার প্রেরণায় এই বাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতো। য়ুরোপীয় পরিচালনায় বেতনভুক সৈন্যদলের মতো তারা আদেশ পালনের যন্ত্রমাত্র হতো না।

জনশ্রুতি এই যে, কোনো কোনো ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষও এই পরিকল্পনা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিলাত থেকে মেজর টম উইনট্রিংহ্যাম ভারতবর্ষে এসে এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবও শোনা গেছে। উইনট্রিংহ্যাম স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রীতির চোখে দেখবেন এ আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা যাই হোন মানবচরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। তাঁদের জানা উচিত ছিল, ব্রিটিশ প্রস্তাবে সৈন্যসামন্ত বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকে না। থাকে পেট্রোল, স্টেশনারী ও ক্যান্টিন্। রুল্ ব্রিটেনিয়া, ব্রিটেনিয়া রুলস্ দি ওয়েভস্।

ইম্পিরিয়াল গোটেল থেকে ফিরছি সন্ধ্যানে। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি হঠাৎ ব্রেক কষে সশব্দে একটি গাড়ি দাঁড়াল একেবারে ঠিক সামনে। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে

আরোহীটি বললেন, "তাই তো, আমাদের বোঁচকা যে ! এখানে কী করছিস ? আয় উঠে আয় !"

বোঁচকা আমার পিতৃ বা মাতৃদত্ত নাম নয়। পারিবারিক সম্বোধনও নয়। কিশোর বয়সে সহপাঠীদের দ্বারা আবিষ্কৃত উত্তাক্ত করার একটি অভিধা মাত্র। লাটিমের অধিকার, আমলকের অংশ ও বিস্কুটের বণ্টন নিয়ে মতভেদজনিত কলহের পরিণামে বিক্ষুব্ধ পক্ষ ঐ শব্দটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা আমার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করত এবং বহুল পরিমাণে সফলকাম হতো। মনে আছে, অনেকদিন খেলার মাঠে বা ক্লাশে ঐ নামটা শুনে ক্রোধে ও অপমানে প্রচুর অশ্রুপাত করেছি।

নামটা একেবারে আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে।

প্রথমে যেদিন বৃন্দাবন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ, সে দিন দিদিমা একখানা শান্তিপুরী জড়িপাড় ধুতি ও সিল্কের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পোশাকটা গুরুগৃহগামী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীর চাইতে সদ্য বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে আগত জামাতা বাবাজীর পক্ষেই অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপদ দেখা দিল বস্ত্রটি নিয়েই। প্রথমতঃ তার অবস্থান যথাস্থানে রাখা রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তার উপরে সযত্নে কুঞ্চিত লম্বমান কোঁচার প্রান্তভাগ মাধ্যাকর্ষণের ফলে কেবলই নিম্নাভিমুখি হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়। এক হাতে শ্লেট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয়, অপরহাতে ধৃত শিথিলবন্ধন বসনের প্রান্তভাগ। কোনোরকমে তালপাকানো অঞ্চলভাগ, দেখতে পোঁটলা আকৃতি।

গোঁসাইদের বাড়ির সিধু ছিল পাঠশালার সর্বাপেক্ষা বখা ছেলে। বয়সে অন্য ছাত্রদের চাইতে অনেক বড়। লেখাপড়ায় বৃহস্পতি। বার দুই ধরে এক ক্লাশেই আছে। এরই মধ্যে বিড়ি ধরেছে। কাছে এসে অত্যন্ত নিরীহের মতো প্রশ্ন করল, "হাতে বোঁচকাটি কিসের বাপু, মুড়কির না বাতাসার ?"

ক্লাস সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। সেই থেকে শুরু হলো বোঁচকা। খাতা নিয়ে, পেন্সিল নিয়ে ঝগড়া হলেই বলে, বোঁচকা। সিধুকে কত সাধ্য সাধনা করেছি। এন্তার মার্বেল, রাশি রাশি জলছবি ঘুষ দিয়েছি। আর যেন কোনদিন না বলে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জিনিসগুলি পকেটে পুরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, "ক্ষেপেছিস ? আর বলি কখনো বোঁচকা ? তোর ঐ লাল পেন্সিলটা কিন্তু আমায় দিতে হবে।"

কিশোর বালকের পক্ষে সেদিন ঐ লাল পেন্সিলটা দান করা কর্ণের কবচকুণ্ডল দানের চাইতে কোনো অংশে কম কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতেও স্বীকৃত হয়েছি। অত্যন্ত অনুনয় করে বলেছি, "দেখ ভাই। অন্য ছেলেরা যেন আর না বলে, বারণ করে দিয়ো।"

সিধু পেন্সিলটার ডগায় জিভের লালা লাগিয়ে কাগজে মোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখতে লিখতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল, "হুঁ, বলুক দেখি সহস্র আছে কোন্ শা—"

সিধুর বিবাহের নিকট বা সুদূর কোনো সম্ভাবনাই তখন ছিল না। কিন্তু তার সম্ভবপর পত্নীর কাল্পনিক সহোদরের উল্লেখ না করে কোনো একটা বাক্য সমাপ্ত এবং আরম্ভ করা তার পক্ষে কঠিন। ঐ বয়সেই ভাষায় তার এমন শব্দসম্ভার যা এ বয়সেও উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান ও তা পালনের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন নিয়ে সিধুর কোনো চিন্তা ছিল না। এ বিষয়ে তার রেকর্ড প্রায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমতুল্য। পরের দিনই ক্লাশে পণ্ডিত মহাশয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও পিছনের বেঞ্চি থেকে পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বরে আওয়াজ এল, বোঁচ্—আমনি চারিদিক থেকে অন্য ছাত্রেরা শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করলো—হিঃ হিঃ হুঃ হুঃ, ফিক্।

কাছে এসে দেখি সিধুই বটে। যদিও চেনা খুব সহজ নয়। পরনে লাইট গ্রে রঙের শার্কস্কিনের মহার্ঘ সুট, পায়ে দামী বিলাতী জুতা যার চকমক করা পালিশে প্রায় মুখ দেখা যায়। দুই হাতে গোটা চারেক আংটি, পকেটে পার্কার ফিফটি ওয়ান কলম ও পেন্সিলের সেট, যা একমাত্র এমেরিকান সেনানায়কদের কাছে ছাড়া এদেশে এখনও আর কেউ দেখেনি বলেই হয়। এই কি

সেই সিধু যে পাঁচ বছর আগে পটলডাঙার পাইস হোটেলের নীচের তলায় এক টাকা বারো আনা ভাড়ায় আর দু'জন লোকের সঙ্গে একটা অন্ধকার কুঠরিতে থাকতো ? কোন তেলের কলের কি কালেক্টর ছিল, মাইনে আঠারো টাকা। চিবুকের নীচে কালো বড় আঁচিলটা না থাকলে সিধু বলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো।

"তুই এখানে কেন ? বিলাত থেকে ফিরলি কবে ? বিয়ে থা করেছিস তো ?" এক সঙ্গে তিনটে প্রশ্ন করল সিধু।

"সে-সব পরে হবে, তোমার খবর কি বল দেখি ?"

"আমার খবর ভালো। মিলিটারি কনট্রাক্ট করছি। হাতে দু'পয়সা আসছে রে।" সে-কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন ছিল না।

তার কাহিনী যা শোনা গেল, সংক্ষেপে তা এই ঃ—তেলের কলের সেই চাকরি ছেড়ে সে অনেক কিছু করেছে। সাবানের ক্যানভাসারি, এক টাকার ইনসিওরেন্সের দালালী, মায় কাগজের প্যাকেটে চানাচুর বিক্রি পর্যন্ত। কোনোটাতেই কিছু হয় না। মাসের মধ্যে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না অনেকদিন, এমন অবস্থা। হঠাৎ বাধলো যুদ্ধ। এরোড্রাম তৈরী করে এমন এক কনট্রাক্টরের অধীনে কুলি-তদারকের কাজ নিয়ে চলে গেল আসামের কোন জঙ্গলে। সেখানেই কপাল ফিরল। কিছু হাতে নিয়ে এসে বসল কলকাতায়। প্রথমে ছোট-খাটো জিনিস সাপ্লাই, পরে বড় বড় কনট্রাক্ট। এখন দিল্লীতে এসেছে ডিপার্টমেন্টের কোন এক বড় সাহেবকে ধরতে।

পুরানো দিল্লীর সুইস হোটেলে তার আস্তানা। সেখানে এসে গাড়ি থেকে নেমে নিয়ে গেল তার ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, "থাকিস কোথায় ? কুইনসওয়ে ? আচ্ছা গাড়ি তোকে নামিয়ে দেবে সেখানে। এই দেখো ড্রাইভার, আভি ঠাহরো। এ সাবকো কুইনসওয়ে ছোড়নে পড়েগি।" কুলির তদারক করে হিন্দীটা রপ্ত করেছে সিধু মন্দ নয়।

বাধা দিয়ে বললেম, "না, না, আমার জন্য ভাবনা নেই। আমি বাস নেবো এখান থেকে।"

"ক্ষ্যাপা নাকি ? বাসে যা ঝাঁকুনি আর যা ভিড় ! ভদ্রলোকের ওঠা দায়। গাড়ি থাকতে সে দুর্ভোগ কেন ? ভাড়া তো তাকে পুরো দিনের জন্যই দিচ্ছি।"

এতক্ষণে বুঝলেম, গাড়িটা ট্যাক্সি এবং সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। নয়াদিল্লীর ট্যাক্সিতে মিটার নেই, তার নম্বরও 'টি' দিয়ে আরম্ভ নয়। না জানলে বুঝবার সাধ্য নেই যে, ভাড়াটে গাড়ি। কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত পাইনে। ঝাঁকুনি আর ভিড়ের জন্য সিধুর ন্যায় ভদ্রব্যক্তির বাসে ওঠা দায়। মনে আছে, পটলডাঙ্গা থেকে দুপুর রোদে পায়ে হেঁটে একদিন টালিগঞ্জে দেখা করতে এসেছিল এই সিধু। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বয়কে হুইস্কি হুকুম করল সিধু। নিষেধ করলেম। হেসে বলল, "ভাবছিস বুঝি 'সোলান' কিংবা 'মারি' ? ওসব দেশী মাল ছোঁবে এমন শর্মা নয় সিধুচন্দ্র। চেখেই দেখ না। খাস স্কচ। খাসা। বাবা খাবো তো খাঁটি জিনিস খাবো, নয়তো নয়।"

"সে জন্য নয়। কিন্তু স্কচ পাও কোথায় ? বাজারে তো শুনেছি—।"

"হ্যাঁ, সাদা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী ? ভাইরে, সবই টাকার মামলা। ঝন্‌ঝনে ফেলো, জিনিস দেবে না কোন শা—"

স্বচক্ষে দেখলাম কথায় এবং কাজে তফাত করে না সিধু। তিন বোতল সোডা কিনে এনে একটা পাঁচ টাকার নোটের অবশিষ্ট ফেরত দিচ্ছিল বেয়ারা। "ঠিক হ্যায়, লে যাও" বলে' অত্যন্ত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সমস্তটাই বকশিস করল তাকে। লোকটা আভূমিপ্রণত সেলাম করে প্রস্থান করল।

সিধু তার বর্তমান দিল্লী আগমনের কারণ ব্যক্ত করল। কলকাতায় ছোট সাহেব নাকি তার নামে লাগিয়েছে অনেক কিছু। এখান থেকে তাই তার ফ্যাক্টরী দেখতে যাবে কোনো একজন অফিসার। সুতরাং একটু ভাবনায় ফেলেছে।

ভাবনাটা কিসের ঠিক বুঝতে পারলেম না। দেখে আসুক না ফ্যাক্টরী, ক্ষতিটা কিসের ? সিধু বিরক্ত হয়ে বললো, "আরে ফ্যাক্টরী থাকলে তো দেখবে ? ফ্যাক্টরীই নেই যে।"

"ফ্যাক্টরী নেই, তবে মাল যোগাচ্ছ কেমন করে ?"

"তুই এখনও সেই বোঁচকাই আছিস। বিলাত ঘুরেও বুদ্ধি খুলল না এতটুকু। আরে মাল যোগাবার জন্য ফ্যাক্টরী থাকার দরকার কী? অন্য লোকের ফ্যাক্টরী নেই? সেখান থেকে তৈরী করিয়ে নিজের লেবেলে চালাতে আটকাবে কোন শা—? ছাপাবার কিছুটা খরচ আছে। খানকয়েক চালান ফরম, লেটার হেড, রাবার স্ট্যাম্প, ব্যস। অর্ডার কি ফ্যাক্টরী দেবে হয়? অর্ডার তো হয়" বলে মুখে চোখে এমন একটা ইঙ্গিত করল যে, তার অর্থ কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা ঝাপসা হয়ে আমার কাছে একটা প্রহেলিকা সৃষ্টি হলো।

জিজ্ঞাসা করলেম, "মাল যোগাচ্ছ এত দিন, এর মধ্যে তোমার ফ্যাক্টরী আছে কি নেই সে-খোঁজ হয়নি?"

"হবে না কেন? তিন চার বার ইন্সপেকশন হয়ে ভালো রিপোর্ট চলে গেছে। এরাও কি যেত না? শা—ছোট সায়েব ব্যাটার খাই বেড়েছে এত যে, আর মিটাতে পারছি নে। তাই না এ-ঝামেলা। যাক, পরোয়া করি নে। জানতে পারব সবই।"

"কেমন করে?"

"কেন, আপিসের কেরানীরাই খবর দেবে। দেবে না? আরে ভাই দেবে কি আর অমনি? সংসারে বিনিপয়সায় পরহিতার্থে আর কাজ করে কোন শা—? আশী টাকার কেরানী, একসঙ্গে পাঁচ শ' টাকা দেখেছে এর আগে? খবর তো খবর, দরকার হলে ফাইলকে ফাইল গাপ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই পর্যন্ত জানি। এই যে মধুবাবু, আসুন আসুন। কী খবর? আচ্ছা এক মিনিট বোস ভাই, এঁর সঙ্গে একটু প্রাইভেট,—চলুন মধুবাবু বারান্দায়।" সদা অগত অগাস্তকরে নিয়ে বাইরে গেল সিধু।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এসে বলল,—"মোটা হাতে কিছু ঢালতে হবে দেখছি। তাক পরে পুষিয়ে নেবো।"

বিস্মিত হওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। শুধু জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা এসব কি শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে? ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকেরা কি জানতে পারে না?"

"কেমন করে জানবে? এই যে এসেছিলেন ভদ্রলোক, খবর দিয়ে গেলেন কোন সায়েব যাচ্ছে এখান থেকে তদন্ত করতে, কবে যাচ্ছে ইত্যাদি। আপিসে যখন যাবো তখন উনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, না কিছু? এমন ভাব দেখাবেন যে, জীবনে এর আগে কখনও আমাকে চোখেও দেখেননি। ব্যাস, তা হলেই হলো। সব কাজেরই সিস্টেম আছে তো?"

একজন বেয়ারা গোটা দুই বিরাট প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, "ফেরাস্ কোম্পানি পাঠিয়েছে।" সিধু বললে, "ঠিক হ্যায়। কাল দোকানে সওদা করেছি কিছু। তাই পাঠিয়েছে। দেখ তো জিনিসগুলি। তোরা মডার্ন টেস্টের লোক, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের খবর রাখিস। হাঁ, সাট। এক ডজন। ছাব্বিশ টাকা পনেরো আনা করে একটা। ওদের সেই পনেরো আনার কারবার জানিস তো? পুরা সাতাশ টাকা লিখবে, না কিছুতেই। রুমাল! হাঁ, পিওর লিনেন? ডজন সত্তর টাকা। পাওয়া যে যাচ্ছে এই ঢের, সত্তর হলেই কী, আশী হলেই কী? এটাকে কী বলে রে? দেখছি আজকাল এমেরিকান সাহেবরা পরে খুব। ডার্...? ডার্কিন নয়? তবে কী? জর্কিন? বর্ষীয়-জ-য়ে আকার তো? দোকানে তো আর জিনিসের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি নে। তাবার কী? কিনলেম তো, কখন পরবো সে পরে দেখা যাবে। দাম বেশী নয়। দু'শ আশী টাকা। চামড়াটা ভালো কোয়ালিটির।" বিল দেখলাম আরও খুঁটি-নাটি অনেক কিছু মিলিয়ে সাত শ' টাকার উপরে। সায়েব তার ওয়ালেট খুলে দু'খানা পাঁচ শ' টাকার নোট বেয়ারার হাতে বিল সহ ফিরিয়ে দিতে।

চুপ করে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেম, এর আগে ঠিক কখন সিধুর পায়ে তালিহীন জুতা দেখেছি।

প্রচুর আদর আপ্যায়ন করল সিধু। বাল্যবন্ধুর প্রতি তার এই সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত। তার চালচলন দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমাকে দশ বছর মাইনে-করা কর্মচারী করে রাখার মতো অর্থ আছে তার ব্যাঙ্কে। কিন্তু কর্মচারীর বদলে অংশীদার করতে চাইল। বলল,

"আরে ব্যারিস্টার হবি যখন হবি। এখন খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে আর ক'টাকা আসবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে জুটে যা, নেহাত মন্দ হবে না। আমারও সুবিধে হবে, চিঠিপত্র লেখা, সায়েব–সুবোর সঙ্গে কথাবার্তা বলা তো আমার আসে না।"

হেসে বললেম, "তার দরকার কী? তুমি যা বলছ তাতে কনট্রাক্ট পেতে ওসবের যে কিছু দরকার আছে তা তো মনে হয় না। তোমার হয়ে তোমার টাকাই কথাবার্তা কইবে।"

"নেহাত মিথ্যে বলিসনি। যে-পূজার যে-বিধি তা না হলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ইংরেজী বলতে কইতে পারে, লিখতে পারে এমন লোক থাকলে আরও সুবিধে। তোকে পেলে আমি এখন যা পাচ্ছি তার ডবল আয় করতে পারি। বলেছিলাম নিত্যানন্দকে। মনে নেই তাকে? সেই যে পুরুত ঠাকুরের ছেলে নিতাই রে। পাঠশালায় একদিন তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। আর কথা কইতে পারে না। কেবলই হাত দিয়ে ইশারা করে জবাব দেয়। শেষে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে পৈতে ধার করে কথা বলল। নালিশের ফলে শাস্তি পেলেম দু'ঘণ্টা দুই কানে ধরে বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা। সেই নিত্যানন্দ এখন ডেপুটি হয়েছে। মাঝে ক'দিন সাপ্লাইর কাজে ছিল। রাস্তা বাতলে দিলেম, কী করলে দু'পয়সা হবে। বলে কিনা, 'সিধু, ছেলেবেলায় ইস্কুলে অনেক অকাজ কুকাজ করেছিস, বড় হয়ে এখন আর করিস নে।' শোন কথা একবার! টাকা উপায় করতে আমি করছি ঠিকাদারী, তুই করছিস চাকরি। যাতে দু'পয়সা উপরি আসে তার চেষ্টা করব, তাতে কুকাজটা কোন্‌খানে? হরিনাম জপতে তুইও আসিসনি, আমিও বসিনি।"

যাক্, তবু ভালো। সংসারে তাহলে দু'একটা লোক এখনও আছে যারা ব্যাঙ্কের পাশ বইর উপরে দৃষ্টি রাখাটাই জীবনের চরম মোক্ষ মনে করে না।

সিধু বলল, "হ্যাঁ লাভটা কি হচ্ছে? ওর সঙ্গে কাজ করতো আর এক অফিসার, সে লেক রোডে বাড়ি কিনেছে দু'খানা, গাড়ি কিনেছে। তার বউ-এর গায়ে হীরার গয়না। আর আমাদের নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে বসে আছেন। বাদুড়-ঝোলা হয়ে ট্রামে চেপে আপিসে যায়, ওয়াছেল মোল্লার সুট পরে। আহাম্মুক এক নম্বরের।"

তাতে আর সন্দেহ কি!

জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা ভাই, যুদ্ধের বাজারে কি অনেস্টি বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই?"

"অনেস্টি? তার মানে সততা? ভায়া হে, ওসব ভালো ভালো কথা যা আমরা ছেলেবেলায় কপিবুকে লিখেছি—না, লিখেছি বলা ঠিক নয়; আমি তো লেখাপড়ার ধার ধারতেম না, কেবল মাস্টারের বেতই খেয়েছি—তোরা লিখেছিস, ওসব ছাপার বইতে থাকে,—ছেলেবেলায় মুখস্থ করতে মন্দ লাগে না। কিন্তু সংসারে ওসব ফালতু। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি বোঁচ্‌কা, জানবি, এমন লোকই নেই যাকে কেনা যায় না। দামের কম বেশী নিয়ে কথা। কেরানীবাবুকে দিতে হয় দশ, বড়বাবুকে পঁচিশ, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পঞ্চাশ, ইন্সপেক্টরকে এক শ'। যত বেশী মাইনের অফিসার, তত বেশী তাঁর দক্ষিণা। টাকায় না হয় এমন কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজি টাকাটা নিতে ভয় পায়। তাদের বেলায় বিলাতী হলে পাঠাবে এক কেস্ 'হোয়াইট লেবেল,' দেশী হলে মেয়ের বিয়েতে দেবে বেনারসী শাড়ি।"

সিধুচন্দ্রের ওখানে ডিনার খেয়ে তারই ভাড়া করা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরলেম অনেক রাত্রে। অনেকগুলি সিগারেট ভরে দিয়েছিল আমার সিগারেট কেসে। 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট।' শাদা আর কালো। শাদা বাজারে তার দর্শন এখন দুর্লভ! কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? দেশে অভাব কী সিধুচন্দ্রের?

এগারো

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজদর্শনেও পুণ্যলাভ। অমাত্যদর্শনেও পুণ্য আছে কিনা জানিনে। বোধ হয় আছে। নইলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়িতে প্রত্যহ ভিড় জমে কেন। ভিড় জনতার নয়, আই-সি-এস-এর।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অপরাহ্ণ গৃহস্বামী বসেন বিশ্রম্ভালাপে। হাতের কাছে ছোট টিপাইর উপরে টেলীফোন, সুদীর্ঘ তারের সাহায্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কক্ষে প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সুইচ আছে। কে কখন বলেন এবং কি কথা বলেন তার গুরুত্ব বিচার করে সেক্রেটারী সুইচের দ্বারা মনিবের টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। খান দশ বারো চেয়ার। বেতের। সবুজ রঙের ভালস্পার এনামেলে স্প্রে-পেইন্ট করা। বাগানে কাঠের চেয়ার ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত সৌরমণ্ডলের ন্যায় আই-সি-এস-পরিবৃত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভাতল। অমাত্যের প্রাত্যহিক আসর। সে আসর গুণিজনের নয়, ধনীজনের।

পরিধানে শাদা শার্টিন জিনের ট্রাউজার্স ও হাতকাটা হাফসার্ট। টাই নেই, কোটও না। নয়াদিল্লীতে গ্রীষ্মকালে ঐটেই রীতি। আপিস থেকে ডিনার পর্যন্ত ঐ পোশাকই সর্বজনগ্রাহ্য। যাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁরা সার্টের বদলে পরেন স্পোর্ট সার্ট। সেটা আরও বেশী স্মার্ট। মোজাহীন চরণে শাদা কাবুলী চপ্পল। আর্মিতে খাকীর মতো সিভিলিয়নদেরও য়ুনিফর্ম আছে। সে য়ুনিফর্ম লিখিত অনুশাসনের নয়, অলিখিত ফ্যাশনের। ঠিক যেমন বিয়ের বরযাত্রীদের গিলে-কোঁচানো ধুতি আর সোনার বোতামওয়ালা পাঞ্জাবি। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী,—সব আই-সি-এস-এরই এক বেশ, এক ভাষা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটাও তাদের স্বজাতীয় নয়।

যে-বন্ধুকে কাণ্ডারী করে এই সভার্ণবে প্রবেশ করা গেল তিনি গভর্নমেন্টের একজন পদস্থ অফিসার। প্রৌঢ়, অপত্নীক এবং অত্যন্ত সদাশয়। বহুপরিচিত ব্যক্তি। এমন গৃহ অল্প যেখানে তাঁর গতি নেই, এমন গৃহিণী অল্পতর যার ডিনার পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই।

পুরুষ মাত্রেরই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। কারো তাস, কারো থিয়েটার, কারো দেশোদ্ধার, আর কারো বা সাহিত্য কিংবা স্বামীজি। এ-ভদ্রলোকের বাতিক পোশাকের। সবচেয়ে ভালো পোশাকের সাহেব—বেস্ট ড্রেসড ম্যান—বলে নয়াদিল্লীতে তাঁর পরিচিতি। গল্প আছে যে চার দিনের জন্য একবার হঠাৎ তাঁকে ট্যুরে যেতে হয়। তাড়াতাড়িতে জামাকাপড় বেশী সঙ্গে নেওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে মাত্র দুটো ওয়ার্ড্রোব ট্রাঙ্ক ও একটা সুটকেশ নিয়েই নাকি তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেগুলির গর্ভে শুধু গোটা পনেরো সুট, দেড় ডজন সার্ট, দশটা টাই ও কুড়িখানা রুমাল ছিল। ভাঁজভাঙা সার্ট বা ক্রীজহীন প্যান্ট পরতে দেখেনি তাঁকে কেউ কোনোদিন। সকালবেলা গয়লা, খবরের কাগজওয়ালার মতই তাঁর বাড়িতে প্রত্যহ নিয়মিত ধোবা আসে বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, স্লিপিং সুট ও জামা কাপড় প্রেস করে দিতে বছুরা ঠাট্টা করে পরামর্শ দেন, আপিসে একটা ইলেকট্রিক আয়রন রাখতে—বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবার আগে একবার তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা ইস্তিরি করে নিতে পারবেন।

জামাকাপড়ের প্রতি ভদ্রলোকের মনোযোগ আছে, কিন্তু আসক্তি নেই। সুদৃশ্য টাই, মনোরম মাফলার অকাতরে দান করেন আপন বন্ধুদের। গৃহে সর্বদা আতিথ্যের অকৃপণ আয়োজন। এমন অমায়িক প্রকৃতির লোক বেশী চোখে পড়ে না।

ইনি হচ্ছেন সেই স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম যাঁদের সাহেব সম্পর্কে কোন দুর্বলতা নেই। একবার বম্বের পথে মাঝ রাত্রিতে এক স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক সাহেব দরজা-জানালা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। হাঁকাহাঁকিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দ্বার খুলে দেখলেন কালা আদমী। 'ভাগো' বলে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করলেন। কিন্তু এ কালা আদমীটি অন্য জাতের। সাহেব দেখেই পুষ্পাদপসরণের পাত্র নন। স্টেশন মাস্টার এসে অন্য গাড়িতে তাঁর জায়গা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। সাহেব তো গোটা কামরাটা রিজার্ভ করেনি, সুতরাং ঐ কামরাতেই তাঁর যাওয়া চাই।

এতে সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। একটা নেটিভের স্পর্ধা দেখ একবার। না হয় টাকা আছে, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই কিনেছে। কিন্তু তা বলে একেবারে একজন খাস বিলাতী সাহেবের সঙ্গে এক কামরায়! মাই গড্, ইন্ডিয়ার হলো কী? সেই আদ্য ন্যাংটো নেটিভ ইন্ডুর

গ্যাঙটাক কি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়েছে ? উইলিংডন কি নেই ? সাহেব তাঁর চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ির দরজা রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখছ চাবুক ?"

ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে রিভলবার বের করে বললেন, "দেখছ পিস্তল ?"

সাহেব মিনিটখানেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর পানে, তার পরে আস্তে আস্তে দোর খুলে দিয়ে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এ-জাতের লোকদেরই সাহেবরা পুলিশের কর্তা হয়ে লাঠিপেটা করেন, হাকিম হয়ে পাঠান জেলে, কিন্তু মনে মনে করেন গভীর শ্রদ্ধা। এঁদেরই জন্য বিদেশে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারা যায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

আর্মির এক কর্নেল কিছুকাল এই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা ছিলেন। পাঞ্জাবী হাবিলদার ও সিপাহীদের ধমকিয়ে তিনি চুল পাকিয়েছেন। জানেন ভারতীয়দের দিয়ে কাজ করাবার ঐ একমাত্র উপায়। সে-উপায় প্রয়োগ করছেন একদিন এঁর উপরে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বরে বললেন, "কর্নেল, একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার রীতি এটা নয়। মনে রেখো, তুমি চোখ রাঙালে আমিও পাল্টে চোখ রাঙাতে পারি—ইফ্ ইউ সাউট লাইক দ্যাট্, আই ক্যান সাউট ব্যাক্ টু।"

শুনেছি এই কর্নেলই পরে এঁকে নিজের বাড়িতে ডিনার খাইয়েছেন বহুদিন। অসুখ হলে নিজে বাড়ি এসে আরোগ্য কামনা জানিয়েছেন এবং রিটায়ার করার কালে প্রমোশন সুপারিশ করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়!

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সান্ধ্য সভায় আলোচনার মধ্যপথে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেম আমরা দুজনে। বন্ধুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম গৃহস্বামী ও উপস্থিত পারিষদবর্গের সঙ্গে। সুদৃশ্য গ্লাশে সুস্বাদু পানীয় পরিবেশন করল উর্দি পরিহিত বেয়ারা। রূপার সিগারেট বাক্স থেকে সিগারেট। গৃহস্বামী নিজে বিরামহীন ধূমপায়ী, ইংরেজীতে যাকে বলে চেইন-স্মোকার। একটা নিঃশেষ হতেই বাক্স থেকে আর একটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে চাপেন। কে আগে তাতে দেশলাই জ্বেলে অগ্নি সংযোগ করতে পারেন, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বিলাতপ্রত্যাগতদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে এ দেশে। তার উপর বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তো কথাই নেই। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য মহোদয় অমায়িক আচরণ ও অজস্র ধন্যবাদের দ্বারা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন।

খণ্ডিত আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বোঝা গেল, বিষয়টি নয়াদিল্লীর গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিত। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ভারত গভর্নমেন্টেরও বার্ষিক শৈলযাত্রা আছে। এপ্রিলের গোড়াতে দপ্তর স্থানান্তরিত হয় সিমলা পাহাড়ে। শরৎকালে উল্টোরথে প্রত্যাবৃত্ত হয় দিল্লীতে। বছরে দু'বার করে সিমলার কার্ট রোড আর নয়াদিল্লীর পাহাড়গঞ্জের পথে গরুর গাড়ি বোঝাই বাক্স পেঁটরা লটবহরের মিছিল দেখা যায়। এই প্রথম শৈলবিহার স্থগিত হয়েছে সরকারী হুকুমে।

নবনিযুক্ত অস্থায়ী সেনাপতি জেনারেল মোলস্ওয়ার্থ দাবি করেছেন, এবার সিমলা যাওয়া চলবে না। গরমে জাপানীদের সঙ্গে সৈন্যরা বর্মার বনে জঙ্গলে লড়তে পারে, আর সেক্রেটারিয়েটের সিভিলিয়ন সাহেবরা একটু গরমও সইতে পারবেন না ? এত বাবুয়ানায় যুদ্ধ জেতা যায় না।

আর্মির প্রয়োজনের উপরে কথা নেই। সুতরাং সেইটেই শিরোধার্য করতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছুক চিত্তে। সেক্রেটারী সায়েবেরা বিচলিত—উঃ বাবা মার্চের শেষে যা গরম, মে-জুনে না জানি কতই বেশী হবে!

ডেপুটী সেক্রেটারীরা বেশীর ভাগই ভারতীয়। কাজেই তারা এক ধাপ উপরে উঠে বলেন, বেশী ? মে-জুন মাসে মেডিক্যাল লীভ নিয়ে পালাতে হবে।"

তাঁদের স্ত্রীরা আরও সাংঘাতিক। স্বামীরা আপিসে চলে গেলে দুপুর বেলা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন, "শুনেছ ভাই, নূতন কমান্ডার-ইন-চীফের কীর্তি ? গরমে নাকি এবার দিল্লী থাকতে হবে। মাই গুডনেস্! তার চেয়ে চল আমরা মেয়েরাই না হয় সিমলাতে গিয়ে মেস করে থাকি, ওরা থাকুন দিল্লীতে গরমে সেদ্ধ হয়ে মরতে!"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করলেন, "গরম কি এখানে খুব বেশী হয় ?"

একজন অমনি বললেন, "ভয়ানক ! থাকতেই পারবেন না এখানে।"

আর একজন বললেন, "গরমে গায়ে ফোস্কার মতো হয় অনেকের।"

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "এপ্রিল থেকেই তো লু চলবে।" 'লু' মানে গরম হাওয়ার ঝড়।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বললেন, "তা দেখুন, সেক্রেটারিয়েটের ঘরগুলি সবই এয়ার-কন্ডিসন্ড। দুপুরবেলা সেখানেই থাকব। এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বোধ হয়।"

চতুর্থ জন, যিনি এতক্ষণ কিছু বলার সুবিধা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, "তা নিশ্চয়ই যাবে। গরমে কি আর দিল্লীতে লোক থাকে না ?"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর রাত্রিতে তো লু বইবে না।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "যা বলেছেন সার, রাত্রিগুলি সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া এইচ· এমদের বাংলোতে একটা করে ঘর এয়ার কন্ডিসন্ড করে দেওয়া হবে। এমন কিছু কষ্ট হবে না।"

'এইচ· এম' মানে—অনারেবল মেম্বর বা মিনিস্টার। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই উল্লেখ করা হয় সরকারী মহলে।

প্রথম বক্তা, যিনি গরমের আতিশয্য নিয়ে এতক্ষণ বাগবিস্তার করছিলেন, অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কথাগুলি তাঁরই বলা উচিত ছিল। না বলতে পারায় মনে তীব্র অনুশোচনা ঘটল। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছেন বলে, তাঁর উপরে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন, কেবল খোশামুদি ! এইচ· এম· যেই বলেছেন, গরম এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, অমনি একেবারে প্রমাণ করার চেষ্টা যেন গরমটা কিছুই নয় ! হাম্‌বাগ কোথাকার ! নিশ্চয় জানি এইচ· এম· দিল্লী থাকা অপছন্দ করলে উনি তখন উল্টো সুর গাইতেন ! লোকটা যে একেবারে মোসাহেব প্রকৃতির এবং তিনি নিজে যে কোনো কালেই এমন নির্লজ্জ চাটুকারিতা করতে পারতেন না, এ বিষয়ে মনে মনে নিজেকে আশ্বাস দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করলেন।

গরম থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এইচ· এম· শুরু করলেন সরকারী কাজকর্মের কথা। কাউন্সিলের কাহিনী। কী ভাবে ইংরেজ সহকর্মীদের ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিহত হয়, তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির ফলে কোথায় কখন গভর্নমেন্টে দেশের স্বার্থ সপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারই সালঙ্কার বর্ণনা।

দেখা গেল, এবিষয়ে শ্রোতাদের কাছে অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি না বলতেই তাঁরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এইচ· এম· না থাকলে অভাগিনী ভারতমাতার যে কী দারুণ দুর্গতি ঘটতো সে কথা কল্পনা করে দু'-একজন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। প্রায় অশ্রু-বরিষণের উদ্যোগ।

কান টানলেই মাথা আসে। দেশের কথা তুলতেই কংগ্রেস। এইচ· এম· কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিষ্ফলা নীতির তীব্র নিন্দা করে বললেন, "শুধু জেলে গেলেই দেশ স্বাধীন হয় না।" কী করে হয় তা স্পষ্টতঃ না বললেও সংশয়ের অবকাশ রইল না যে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের প্রচেষ্টা দ্বারাই তা হয়। এবিষয়েও পারিষদ দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ নেই।

এইচ· এম· বললেন তিনি এত ভাবনা চিন্তার ধার ধারেন না, মুহূর্তে মন স্থির করেন। অমনি অনুমোদন শুনলেন, "সার, ভাবনা চিন্তা দেশে অনেক হয়েছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়াই দরকার।"

এইচ· এম· সংশোধন করলেন, "অবশ্য আগে ভাগে না ভেবেচিন্তে হঠাৎ একটা কিছু করে বসাও আবার ঠিক নয় !"

"তাতে আর সন্দেহ কী সার, না ভেবে কাজ করার নাম তো হঠকারিতা," একই ব্যক্তি বলেন অম্লান বদনে।

পরবর্তী সপ্তাহে এক ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকারান্তে এইচ· এমকে বিদায়-সম্ভাষণ পূর্বক নিজান্ত হলেম পথে। সঙ্গী ভদ্রলোক জানালেন তাঁর এক বন্ধু নাকি চমৎকার চাটুচাতুর্যপরায়ণ এই পারিষদদলের নব নামকরণ করেছেন 'হেঁ হেঁ সংঘ'। নামটা সার্থক সন্দেহ নেই।

আসল কথাটা বোঝা কঠিন নয়। এরা আই· সি· এস। দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে স্বর্গোদ্ভূত চাকরে-হেভেন্‌বর্ন সার্ভিস। সিজার পত্নীর সতীত্বের মতো এদের যোগ্যতা প্রশ্নের অতীত। ভবিষ্যৎ অবারিত এবং ক্ষমতা সীমাহীন। এরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাই আজ যিনি বিহারের অখ্যাত মহকুমার এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর, কাল তিনি করাচী পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পরশু তিনি কন্‌ট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং, পরদিন ডিরেক্টার-জেনারেল অব আর্কিওলজি এবং তার পরের পরদিন গভর্নমেন্টের এ্যাগ্রিকালচারেল কমিশনার। তাঁরা জানেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে খুশি রাখতে পারলে পদোন্নতি দ্রুত হয়। তাই কেউ সস্ত্রীক এসে এইচ· এমকে নিয়ে যান সিনেমায়, কেউ নিমন্ত্রণ করেন ডিনারে, কেউ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়ে প্রত্যেক কথায় করেন হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ। 'হেঁ হেঁ সংঘের' সদস্য হতে চাঁদা দিতে হয় না, শুধু যথাস্থানে হাজিরা দিতে হয়।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অপূর্ব সৃষ্টি। এর মোট সংখ্যা এগারো শ'র কাছাকাছি, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয়। পরাধীন জাতির মধ্যে থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সার্ভিস। স্ফীত বেতন এবং লোভনীয় পেন্সনের আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট করেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম নিদর্শন বেছে নিয়ে নিয়োজিত করেন শাসনকার্যে, যে-শাসন দেশের দাসত্বকে করে দৃঢ়মূল ; দারিদ্রাকে করে ক্রমবর্ধমান এবং জাতীয় আন্দালনকে করে বিঘ্নসঙ্কুল।

অসাধারণ মোহ আছে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষরে। I. C. S. নামের পিছনে তাদের অবস্থিতি দ্বারা সাহেব হলে বোঝায় যে, লোকটা পাবলিক স্কুলের ছাত্র, অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজের পাশ এবং কঠিন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একটি ভারতীয় ভাষা শিখেছে, ওভারসিজ এলাউয়েন্স পায়, চাকরি শুরু করেছে এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর রূপে এবং শেষ করবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বা প্রাদেশিক গভর্নর হয়ে। পাঁচ শ' টাকায় আরম্ভ, ছয় কিংবা আট হাজারে শেষ। ষাট বছর বয়সে এক হাজার পাউন্ড পেন্সন নিয়ে ইংলন্ড বা রিভেয়ারাতে বাড়ি, নিশ্চিন্ত অবসর এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা।

ভারতীয় হলে বোঝাবে,—উচ্চ বংশ, কলেজে ভালো ফল, পুলিশের সন্দেহাতীত, স্বদেশীর স্পর্শলেশশূন্য নিষ্কলঙ্ক ছাত্রজীবন, বিলাতের প্রতি ভক্তি এবং চাকরিতে বিচার বিভাগের বদলে এক্সিকিউটিভ বিভাগে কায়েমীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এদের জন্যই বারোয়ারি পূজার মন্ডপে চেয়ারের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব, মাসিক পত্রিকায় অপাঠ্য গল্প রচনার সুযোগ এবং অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার উদ্বিগ্না জননীর আকুলি বিকুলি।

চলতি কথায় এঁদের বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো। স্টীলফ্রেম। এঁদের মধ্যে এমন দু'চার জন লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁরা পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় ও কর্মশক্তিতে যে কোনো ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান গ্রহণের অধিকারী। তাঁরা ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন, ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেছেন, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করেছেন ! জাতীয়তাবাদের গুরু সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র এই সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা হতে হতে ছিটকে পড়েছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রমের দ্বারাই তো নিয়মের প্রমাণ হয়। বেশীর ভাগ আই· সি· এস-ই নিতান্ত সাধারণ, ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিওকর। তাঁরা লেখার মধ্যে লেখেন ফাইল, পড়ার মধ্যে পড়েন গেজেট এবং আলোচনা করেন ফার্লো, প্রমোশন বা রিটায়ারমেন্ট। অন্তিমে নিজের জন্য নাইটহুড, স্ত্রীর জন্য বুইক গাড়ি ও ছেলের জন্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিস তাঁদের চরম উচ্চাভিলাষ।

ইংরেজীতে বলে, কামানের চাইতে সোনার দাম কম। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিতদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখবার অমোঘ অস্ত্র, তাঁদের শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা। সে-তথ্য জানা আছে ইংরেজের। এগারো শ' আই· সি· এসের জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ হয় বছরে আড়াই কোটি টাকা। প্রতি আড়াই লক্ষ ভারতীয়ের মাথার উপরে আছে একজন আই· সি· এস· প্রতি

৮৬৮ বর্গ মাইল এলাকার আধিপত্যে। প্রচুর অর্থ, প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক পারবেশের ফলে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হন তাঁরা। দেশের দায় বিমুক্ত, দশের থেকে বিযুক্ত। আই· সি· এস· একটা পেশা নয়, আই· সি· এস· একটা জাত। হেলি রোম্যান এম্পায়ার যেমন না ছিল হেলি, না ছিল রোম্যান এবং বলা না যায় এম্পায়ার ; ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তেমনি ইণ্ডিয়ান নয়, সিভিল তো নয়ই এবং সার্ভিসের বাষ্প মাত্র নেই তাতে।

বারো

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ দিল্লী পরিত্যাগ করলেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী বেতার-কেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক বেতার-বক্তৃতায় তিনি ক্রীপস্-দৌত্যের ব্যর্থতা ও কারণ বর্ণনা করলেন। বেতার-বক্তারূপে একমাত্র লন্ডন টাইমসের ভূতপূর্ব সম্পাদক উইকহ্যাম স্টীড ছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বোধহয় ক্রীপসের জুড়ি নেই। অপূর্ব তাঁর বাচনভঙ্গী, অসাধারণ তাঁর কণ্ঠ। পরিতাপের কথা, সে দক্ষতা তিনি প্রয়োগ করলেন ভারতবর্ষের, বিশেষ করে কংগ্রেসের অযথা অপবাদকীর্তনে। ইচ্ছাকৃত সত্যগোপন বা সত্যের বিকৃতি সাধন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, পরস্পর-বিরোধী উক্তি এবং কুযুক্তির দিক দিয়ে তাঁর এ বেতার-বক্তৃতাটি রাজনৈতিক অপভাষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে ইতিহাসে।

সমগ্র বক্তৃতাটি এক ক্ষমতাগর্বিত ব্যক্তির আহত অভিমান ও দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞার অভিব্যক্তি। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তি ধনী আত্মীয়ের কৃপামিশ্রিত মুষ্টিভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে দাতার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, সার স্ট্যাফোর্ডের কণ্ঠে তারই পরিচয় ছিল।

ক্রীপস্ বললেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে প্রবল মতবিরোধ বর্তমান, একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার একটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। শ্রোতারা বিস্ময়ে চক্ষু মার্জনা করে ভাবল, এডলফ্ হিটলারের বক্তৃতা শুনছি না তো ? তিনিও তো বলেন, তিনি চিরকাল শান্তি চেয়েছিলেন !

চাকরি বণ্টন, পৃথক নির্বাচন, রাজনৈতিক সুবিধাদান প্রভৃতি একাধিক উপায়ে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং মতবিরোধকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই নাকি মধ্যস্থতা করতে চান। পরিহাস আর কাকে বলে ?

ক্রীপস্ বললেন, যুক্তিশীল ব্যক্তিরাই স্বীকার করবেন যে; যুদ্ধের এ দুঃসময়ে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব নয়। যেন ভারতীয় নেতৃবর্গ এ-কথা স্বীকার করেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু প্রকৃত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাময়িক জাতীয় গভর্নমেন্ট, যুদ্ধের এ দুঃসময়ে যার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সে-গভর্নমেন্ট গঠিত হবে, সে-গভর্নমেন্টকে একটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রিসভার সমমর্যাদা দান করা হবে এবং অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী বড়লাট একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার ন্যায় এ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে বাধ্য থাকবেন, নিজ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না—এই ছিল জননেতাদের দাবি। নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কোন কথাই ছিল না।

কংগ্রেসের প্রতি ক্রোধটাই সবচেয়ে বেশী। বললেন, জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের দাবি দ্বারা কংগ্রেস সকল ক্ষমতা আত্মসাতের প্রয়াসী, দেশের ডিক্টেটর হওয়ার বাসনা সংখ্যাগরিষ্ঠদল কংগ্রেসের। অথচ এগারোই এপ্রিল তারিখের লেখা চিঠিতে মৌলানা আজাদ ক্রীপসকে লিখেছিলেন, কংগ্রেস দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনে ইচ্ছুক। এ ধারণার উপরে ভিত্তি করেই সমস্ত আলাপ আলোচনা চলছে। জাতীয় গভর্নমেন্টের সদস্য সংখ্যা, বিভিন্ন দলের অংশ ইত্যাদি প্রশ্ন পরে নিশ্চয়ই আলোচিত হতো। কংগ্রেস নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যাকুল নয়, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হোক, এই তার দাবি।

দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার আপত্তি সম্পর্কে ক্রীপস্ বললেন, ভারতবর্ষ

রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের এবং মিত্রশক্তি এমেরিকার প্রতি ব্রিটেনের যে-কর্তব্য তা পরিহার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্বে কারও হস্তক্ষেপ যুদ্ধজয়ের অনুকূল নয়। কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোনো অভিপ্রায় ছিল না কংগ্রেসের। বরং সমরমন্ত্রী হিসাবে তাঁর হাতে আরও অধিকতর কর্তৃত্ব অর্পণে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেশরক্ষার চরম দায়িত্ব থাকবে দেশেরই একজন প্রতিনিধির হস্তে। তা না হলে স্বাধীনতার কোনো অর্থ থাকে না।

জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারের হাতে। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষা সচিব অস্ট্রেলিয়ানই ; মার্কিন বা ইংরেজ নয়,—এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন কেউ কেউ। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যুক্তিকে শ্রদ্ধা করেন এমন নজীর নেই।

সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি করলেন সার স্ট্যাফোর্ড জাতীয় গভর্নমেন্টের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে। তিনি বললেন, "কংগ্রেস এমন একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠন করতে চায়, যার উপরে বড়লাটের বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। একবার ভেবে দেখা যাক তার মানে কী। অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভারতের গভর্নমেন্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হবে, যাঁরা কোনো আইনসভা বা নির্বাচকমন্ডলীর কাছে দায়ী নন, যাঁদের কেউ কখনও নাড়াতে পারবে না।" কী সাংঘাতিক কথা। সত্যি তো। এ তো কোনো মতেই হতে দিতে পারা যায় না। আইনসভা, নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য গভর্নমেন্টের একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম নমুনা তো আছে আমাদের বর্তমান বেহুল - ম্যাক্সওয়েল - নুন - ওসমান - রামস্বামী পরিবৃত পরম করুণাময় লর্ড লিনলিথগোর গভর্নমেন্টে!

বেতার-বক্তৃতার উপসংহারে ক্রীপস্ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্দীপনাময়ী উক্তি করলেন—"ঝুঁকি নিতে হবে, নতুন পরীক্ষা করতে হবে, পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে" এমনি সব ভালো ভালো কথা।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিস্টার বলে সার স্ট্যাফোর্ডের খ্যাতি আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ-সকল উক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অসঙ্গতি তাঁর মতো ব্যবহারজীবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। "ঝুঁকি নিতে হবে।" ঠিক কথা। তবে সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে নয়,—নিতে হবে পদানত নিপীড়িত ভারতীয় জনসাধারণকে। "নতুন পরীক্ষা করতে হবে।" অথচ ভারতবর্ষে বহাল থাকবে সেই সনাতন স্বৈরশাসন। "পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে।" শুধু ভারত সম্পর্কে নয়! এই হলো ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক ভারতবন্ধু সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কথিত সুসমাচার !!

বিলাতের ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের অনুরূপ অস্থায়ী যুদ্ধকালীন গভর্নমেন্ট গঠিত হবে, এই ভিত্তিতেই মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরু ক্রীপস্ প্রস্তাবের আলোচনা করেছেন। পরে দেখা গেল, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কখনও কোনো আলোচনায় ক্রীপস্ যে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের আভাসমাত্র দিয়েছেন এমন কথাও স্বীকার করলেন না তিনি। অথচ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন বা তাতে যোগ দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে তিন সপ্তাহ আলোচনা করবেন মৌলানা আজাদ বা পন্ডিত জওহরলাল, একথা একমাত্র উন্মাদ বা বিশেষ অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জোরের সঙ্গে বললেন, ক্রীপস্ ক্যাবিনেট গভর্নমেন্টের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ক্রীপস্ তা বেমালুম অস্বীকার করলেন। যদিও সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ২৩শে মার্চের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন যে, সেখানেও ক্রীপস্ এই ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের কথাই বলেছিলেন।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ একটি অতি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ক্রীপস্ আলোচনার কোনো লিখিত ও অবিসংবাদিত দলিল রাখেননি। বিলাতে ব্যবসায়ীদের দেখেছি, কোনো বিশেষ লেনদেন বা চুক্তি সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার একটি পরস্পর অনুমোদিত লিখিত বিবরণ থাকে।

আলোচনার পরে একজন আলোচনার সমুদয় বিবরণ একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করে অন্যজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি হয় ঐ পত্রে বর্ণিত বিবরণ যথার্থ বলে অনুমোদন করেন, নয় তো সংশোধন করেন। এ ব্যবস্থায় দুই পক্ষের মৌখিক আলোচনায় কোনো সময় একে অন্যের উক্তি বা মনোভাবকে ভুল বুঝলে অবিলম্বে তার সংশোধন হয়। চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে, সেখানে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এরূপ কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেননি—এ শুধু আশ্চর্য নয়, বালকোচিত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সেদিনকার আলোচনার সারমর্ম একটি পত্রে গ্রথিত করে তাতে ক্রীপসের অনুমোদন-স্বাক্ষর রাখলে পরে পরস্পরের প্রতি এই অসত্য ভাষণের দোষারোপ করার অবকাশ ঘটত না।

মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ দীর্ঘ চিঠিতে বলেছেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ও ক্রীপসের মধ্যে আলোচনা যতই এগিয়ে চলেছে, ব্রিটিশ মনোভাবের ততই ক্রমিক অবনতি ঘটেছে। এ মন্তব্য অহেতুক নয়। ব্রিটিশ প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আগমন ও ভারত পরিত্যাগের মধ্যে ক্রীপসের চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্রীপসের এই ব্যর্থতার এবং পরিবর্তনের কারণ কী, তা নিয়ে বহু অনুমান, বহু সংশয়, বহু গবেষণার অবকাশ আছে। ব্যর্থতার সমুদয় দায়িত্ব ক্রীপসের নয়।

লর্ড লিন্‌লিথগো ক্রীপস্-দৌত্যের সাফল্য কামনা করেননি, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে একাধিকবার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহের তিনি ভার নিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে একজন শ্রমিকদলের সদস্য দ্বারা তা সম্ভব হবে এটা তার পক্ষে রুচিকর নয়। ব্যক্তিগত মতবাদে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো যে একজন কন্জার্ভেটিভ ডাইহার্ড সে-কথা অবিদিত নয় কারো কাছে।

জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড ওয়েভেল একজন ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কি না তাও জানার উপায় নেই। ওয়েভেল বর্তমানে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তার সমরনৈপুণ্যের উপরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অবিচলিত আস্থা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার সামরিক ব্যাপারে ওয়েভেলের অননুমোদিত কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাধারণের ধারণা এই যে, লন্ডন থেকে টেলিফোনযোগে সার স্ট্যাফোর্ডকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, তিনি যেন ওয়ার ক্যাবিনেটের লিখিত প্রস্তাবের বাইরে আর এক পাও না যান। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্চিল ও এমারির মনোভাব এতই সুপরিচিত যে, এ অনুমান একেবারে অমূলক মনে হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে ইংলন্ডের রাজনৈতিক গগনে ক্রীপস্ ছিলেন একান্ত নিষ্প্রভ। শ্রমিকদলের সঙ্গেও সে সময়ে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। উনিশ শ উনচল্লিশ সালের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে এলেন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করলেন, বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন, পন্ডিত জওহরলালের অতিথিরূপে পুংখানুপুংখরূপ অনুসন্ধান করলেন এ দেশের জাতীয় আন্দোলন ও তার ধারা সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ থেকে ক্রীপস্ গেলেন চীনে। চীন থেকে রাশিয়া হয়ে ইংলন্ডে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, চেম্বারলেন গভর্নমেন্টের তখন পতন ঘটেছে। প্রধান মন্ত্রীরূপে চার্চিল গঠন করেছেন নতুন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। রাশিয়া ও ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পর্ক সে সময় মধুর নয়, অথচ একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে মিতালীর দ্বারাই তখন য়ুরোপে হিটলারের প্রতিরোধ সম্ভব। কে তার নেবে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রীসাধনের ? ক্রীপসের নাম কে প্রস্তাব করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন পরিত্যাগ করে রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্মৃতপ্রায় ক্রীপস্ অকস্মাৎ একদিন প্রবেশ করলেন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বোধ হয় বললেন, মস্কো পছন্দ কর তুমি, সেখানে ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাও। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। এখনই রওনা হও। ফর্ গড্‌স্ সেক্।

ক্রীপস্ রাশিয়ায় গেলেন এবং অসাধ্যসাধন করলেন। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে তিনি হৃদ্যতার সৃষ্টি করলেন, যা ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব বলে গণ্য হয়েছে। মস্কো ও কুইবাইসেভে নিজ কর্তব্য সমাধান করে উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে যখন ইংলন্ডে ফিরলেন ক্রীপস্ তখন তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দু-ই অপরিসীম। চার্চিল তাঁকে আপন মন্ত্রিমণ্ডলে গ্রহণ করলেন।

ভারতীয় সমস্যার তিনি একটা সন্তোষজনক মীমাংসাসাধনে সক্ষম হবেন, এ বিশ্বাস ক্রীপসের ছিল। ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব যে ভারতীয় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম, একথা কি তিনি বোঝেননি? তা হলে তার বহু-বিজ্ঞাপিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি প্রথম সাক্ষাতের দিনে ক্রীপস্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই প্রস্তাব নিয়ে তুমি ভারতবর্ষে এলে কেন?" উপদেশ দিয়েছিলেন, "এর বেশী আর কিছু যদি তোমার দেবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ফিরতি বিমানে দেশে ফিরে যেতে পার।"

ক্রীপস্ নিশ্চয়ই জানতেন ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর আশা ছিল, ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বর্তমান, তারই সহায়তায় তিনি তাঁদের সম্মতিলাভ করবেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ শিশু নন; ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগের প্রশ্নকে তাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি।

বোধ হয় ক্রীপসের আশা ছিল, অকুস্থলে অবস্থানকারী—ম্যান অন্ দি স্পট—হিসাবে তিনি প্রস্তাবগুলির কিছু কিছু সম্প্রসারণের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে। চার্চিল তাঁকে নিরাশ করলেন। দু'দিক দিয়েই তিনি বিফল-মনোরথ হলেন।

নিজের মতবাদে অবিচলিত ও সততায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, ভারতীয়দের দাবি ন্যায়সঙ্গত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাব আপস অনুকূল নয়, তাঁদের আন্তরিকতা সন্দেহজনক। ক্রীপস্ তা করলেন না। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমর্থন করে কংগ্রেসের প্রতি কটূক্তি করলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই চরম সঙ্কটকালে ক্রীপস্ ন্যায়-নীতি অপেক্ষা মন্ত্রিসভার নিজ সহকর্মী ও প্রধানের প্রতি আনুগত্য কেই শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। ব্রিটিশজাতির প্রয়োজনে তিনি অপভাষণের আশ্রয় নিলেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ আত্মহত্যা করলেন।

চার্চিল জয়লাভ করলেন। শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার প্রচেষ্টায় নয়, নিজ সম্ভবপর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংস সাধনেও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করলেন তিনি।

ইংলন্ডের জনসাধারণ চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বে সুখী ছিল না। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একটির পর একটি করে পরাজয় পার্লামেন্টের সদস্যদের বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁরা তীব্র ভাষায় চার্চিল গভর্নমেন্টের অক্ষমতার আলোচনা করেন। কিন্তু চার্চিলকে অপসারিত করেন না। তার কারণ চার্চিলের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা নয়। একান্ত নিরুপায় তাঁরা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই ইংলন্ডে।

রাশিয়ায় অভাবিতপূর্ব সাফল্য ক্রীপস্‌কে যে সম্মান ও খ্যাতি দিয়েছিল, তাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তার প্রতি। কেউ কেউ বলতে শুরু করল, ইংলন্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারলে ক্রীপসের যোগ্যতায় ব্রিটিশ সর্বসাধারণের আস্থা গভীর হতো, চার্চিলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজনীতিতে ক্রীপসের প্রভাব হতো অনন্য-সাধারণ। ওয়ার ক্যাবিনেটের এক শূন্যগর্ভ প্রস্তাব দিয়ে চার্চিল ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠালেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন গান্ধীজি, আজাদ ও নেহরু কখনও গ্রহণ করবেন না এ প্রস্তাব।

ক্রীপস্ ব্যর্থকাম হলেন। চার্চিলের প্রধান মন্ত্রীত্ব নির্বিঘ্ন হলো। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের একাধিক উপায় আছে। স্ট্যালিন তাদের হত্যা করেন বন্দুকের গুলিতে, চার্চিল তাদের নিঃশেষ করেন কূটনৈতিক চালে। সোস্যালিস্ট ক্রীপস্ ইম্পিরিয়ালিস্ট টোরিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতিতে নিজ হাতে নিজ মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষর করলেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

আহারের নিমন্ত্রণ ছিল এক বন্ধুগৃহে। ভদ্রলোক কলকাতার এক নামজাদা সাহেব

কোম্পানীর কভেনাণ্টেড সার্ভিসের লোক, শ্বেতাঙ্গ পরিচালকগোষ্ঠীতে একমাত্র বাঙালী অফিসার। প্রচুর বেতন, প্রভূত প্রতাপ। যুদ্ধের প্রয়োজনে গভর্নমেন্ট সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছেন আরও বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে। নিজের কোম্পানীতে 'লিয়েন' আছে। যুদ্ধ শেষ হলে সেখানে ফিরে গিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন পূর্বগৌরবে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা জন দশেক। একমাত্র আমিই একক। বাকি সবাই যুগলে ; —মিস্টার এন্ড মিসেস। ডিনার ন'টায়, কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা সাড়ে সাতটার মধ্যে সবাই উপস্থিত। ড্রয়িং-রুম তাঁদের হাস্য, পরিহাস ও আনন্দকলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

আমাদের প্রাচীন ভোজসভাগুলির সঙ্গে এই ডিনার পার্টিগুলির প্রভেদটা সুস্পষ্ট। তফাতটা শুধু আসন পেতে আহার ও ছুরি কাঁটায় খাওয়ার মধ্যে নয়। আমাদের ভোজন আয়োজনগুলি মূলতঃ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কিত। মেয়ের বিয়ে, ছেলের উপনয়ন, নাতনীর ভাত কিংবা ব্রত, পার্বণ উপলক্ষ করে আমাদের নিমন্ত্রণ। তাতে লোক ডাকতে হয় আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সূত্র ধরে, হৃদ্যতার বিচার করে নয়। সুতরাং সংখ্যা হয় অপরিমিত। ছাদের উপর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নীচে এক সঙ্গে আসন পড়ে সত্তর কিংবা আশী। মেয়েদের জন্য শয়নগৃহে খাট-পালঙ্ক বের করে খাবার জায়গা। এতেও একেবারে সমাধা হয় না সমুদয় নিমন্ত্রিতের আহার। বাড়ির সিকি মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যায় কলকোলাহল।

ইংরেজী ডিনারের বিশেষ কোনো উপলক্ষের দরকার নেই। নেই কোনো নির্দিষ্ট দিন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ডাকার অলংঘনীয় দায় নেই গৃহকর্তার। গৃহকর্ত্রী বলাই ঠিক,—কারণ নিমন্ত্রণ করেন গৃহিণীরা।

এক টেবিলে বসে খাওয়ার রীতি স্বভাবতঃই নিমন্ত্রিতের সংখ্যাকে পরিমিত রাখে। বেশীর ভাগই ছ'জন ; উর্ধ্বে বারো। তাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে নিয়ে। বাড়ির গৃহিণী এখানে ভাঁড়ারে ময়দা মাখানো নিয়ে ব্যস্ত নন, ড্রইং রুমে আর পাঁচজন নিমন্ত্রিতার ন্যায় আলাপ-আলোচনায় তাঁরও যোগ আছে। তাঁর বসন হলুদের চিহ্নদ্বারা লাঞ্ছিত নয়, আনন উনানের আঁচে বিশীর্ণ নয়, এবং দেহ পরিবেশনজনিত ক্লান্তিতে পীড়িত নয়। তিনিও সুবেশা, সুসজ্জিতা। তিনি সমুদয় অভ্যাগতদের আহারান্তে অপরাহ্ণ বেলায় সর্বশেষে আহারে বসেন না, তাঁদের সঙ্গেই আহার্য গ্রহণ করেন। গৃহকর্তা কোমরে গামছা জড়িয়ে জলের জাগ বা নুনের হাঁড়ি হাতে ছুটোছুটি না করেও অতিথিদের আদর আপ্যায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁদের সঙ্গে বসেই আহার করেন।

খাওয়াটাই ইংরেজী ডিনারের মূল কথা নয়। সেটা বন্ধুজনের একত্র মিলনের একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই আহারের আয়োজন পরিমিত। সুক্ত থেকে অম্বল পর্যন্ত দশটা তরকারি এবং দরবেশ থেকে রাবড়ি পর্যন্ত পাঁচটা মিষ্টান্নের আয়োজন না হলে সেখানে কেউ ছি ছি করে না। পান্তুয়া গোলায় কৃতিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা নেই ইংরেজী ডিনারে। আমাদের আধুনিক সমাজের ইঙ্গ-বঙ্গের ত্রুটি অন্বেষণে যাঁদের কখনও ক্লান্তি নেই, এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃ তাঁরা যেন আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।

আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা মজলিসী ধরনের লোক। আসর জমাবার দক্ষতা আছে তাঁর। এককালে শিকারে সখ ছিল। বিহারের জঙ্গলে সম্বর শিকারের গল্প করলেন, আসামের অরণ্যে নেকড়ে।

শুধু গল্প নয়, তাসের ম্যাজিক জানেন অনেক রকম। চোখ বুজে প্যাকেটের মধ্য থেকে চিড়িতনের গোলাম বের করে দিয়ে বিস্মিত করলেন সবাইকে, হরতনের নওলাকে হাত ঘুরিয়ে নিমিষের মধ্যে বানিয়ে দিলেন গোলাম এবং এক মহিলার শাড়ির ভাঁজ থেকে ইস্কাবনের সাহেব বের করে তাঁর কাছে কপট তাড়না এবং আর সবার কাছে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ লাভ করলেন। গল্প গুজব ও হাস্য পরিহাসের মাঝে মাঝে শীতল পানীয় এবং ককটেল গ্লাশে টোমাটোর রস পরিবেশন করল বেয়ারা।

আহারের ব্যবস্থা পাশের কক্ষে। বুফে ডিনার। একটা টেবিলের উপরে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো সমুদয় আহার্য। রোস্ট, স্যালাড, চপ্, আবার তার সঙ্গেই পরোটা বিরিয়ানী, পটলের দোলমা।

পুডিং আছে, রসগোল্লাও আছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইঙ্গ-বঙ্গের ছাপ থাকে আমাদের অশনে, বসনে, চিন্তায় ও কর্মে। হাতে দশগাছা জলতরঙ্গ চুড়ির সঙ্গেই আমাদের মেয়েরা পরেন রিস্টওয়াচ ; কোঁচানো ধুতির উপরেই ছেলেরা পরেন ডবল কাফের সার্ট।

সাইডবোর্ডে স্তরে স্তরে একদিকে সাজানো আছে প্লেট, অন্য দিকে চামচে, কাঁটা এবং ছুরি। সবাই প্লেট নিয়ে স্বহস্তে নিজ নিজ অভিরুচি মতো আহার্য তুলে নেন। ছেলেরা বেশীর ভাগ টেবিলের চার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খান। মেয়েরা কেউ বা বসেন চেয়ারে, কেউ বা ছেলেদের অনুসরণে দাঁড়িয়েই। গৃহকর্ত্রী খেতে খেতেই তদারক করেন অতিথিদের। বলেন, "এ কী ভাই; মিলি তুমি কিছু খাচ্ছ না যে ? মিস্টার সেন, আর একটা চপ নিন। মিসেস দেশাই রোস্ট নিয়েছেন তো ?"

মিসেস সাহার নাম শোনা ছিল ইতিপূর্বে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল এই ভোজসভায়। অতিশয় ক্ষীণাঙ্গী, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট ফর্সা কিন্তু পাউডার-আধিক্যের দ্বারা গন্ডের স্বাভাবিক বর্ণকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছেন যে, কাগজের মতো সাদা মুখ দেখে মনে হয় বুঝি বা কোনো কঠিন অসুখের পর ভাওয়ালী বা মদনপল্লী স্যানিটোরিয়াম থেকে সদ্য উঠে এসেছেন ! পরিধানে সাদা ধবধবে শিফনের অতি মহার্ঘ শাড়ি ; প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ। তার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর ঈষৎ হাল্কা রঙের অন্তর্বাস। শাড়িতে পাড় থাকাটা আজকাল যথেষ্ট মডার্ন নয়। ঘটি-হাতা ব্লাউজের মধ্যে থেকে লম্বমান বিশীর্ণ বাহুদ্বয়। 'ভি' আকৃতি সম্মুখ ভাগে মর্মান্তিকরূপে উদঘাটিত গ্রীবার দুই পার্শ্ববর্তী উদ্ধত দুটি কণ্ঠা ! গলায় মুক্তার একটি মালা ! কানে সর্ষপাকৃতি ক্ষুদ্র মুক্তা গেঁথে গেঁথে একজোড়া দুল, প্রায় কাঁধ অবধি ঝোলানো। বাম হাতের দীর্ঘ সরু অনামিকায় তারই সঙ্গে ম্যাচ-করা মুক্তাবসানো মস্ত একটি আংটি। সবুজ, নীল, মেরুন, ভায়োলেট প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের শাড়িপরিহিতাদের মধ্যে মহিলা আপন বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিশিষ্টা। যেন শীতের দিনে বর্ণাঢ্য মরসুমী ফুলের বাগানে রজনীগন্ধার উন্নত বৃন্তটি।

মহিলা টেবিল-স্পুনের আধ চামচ বিরিয়ানী নিয়েছিলেন, তাই যেন শেষ করতে পারেন না ! হোস্টেস একটু রোস্ট তুলে দিতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্লেটে। "পারবো না ভাই, পারবো না, দিয়ো না, প্লীজ" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর একটা চপ নিলেন এবং ম্যানিকিউর করা দুই আঙ্গুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে তার সিকি ভাগ ভেঙে খেলেন ; কেবলই বলেন, "ভয়ানক পেট ভরে গেছে। আর পারছিনে।"

একটা ঝালের চচ্চড়ি ছিল টেবিলে, তাই একটু নিলেন মিসেস সাহা। এটাই চলতি। মিস্টার সাহা বাধা দিয়ে বললেন, "খেয়ো না, এত ঝাল খেলে অসুখ করে মরবে।" এতেও নতুনত্ব নেই। স্বামীরা লঙ্কা খেতে বারণ করেন এবং স্ত্রীরা তা অগ্রাহ্য করে বেশী করে লঙ্কা খান, এইটে প্রমাণ করাই হলো আধুনিকাদের আহার সম্পর্কিত আধুনিকতম ফ্যাশান।

ভোজনপর্বের শেষে মহিলাদের প্রতি অনুরোধ হলো গানের। কেউ গাইলেন। কেউ "অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি" বলে এড়িয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্রী মোটামুটি রকম গাইতে পারেন এবং তাঁকে অনেক সাধ্য সাধনা না করলেও চলে। একটি গুজরাটি মহিলা তাঁর স্বদেশীয় সঙ্গীত শোনালেন। তার মধ্যে একটি ভক্ত কবি নরসিংহ মেহতার রচনা। তাঁর রচিত "বৈষ্ণব জনতো তেঁনে কহি" বলে একটি গান এককালে গান্ধীজির প্রিয়রূপে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মিসেস্ সাহার সদাশয়তা আছে। অনেক রাত্রিতে ডিনার পার্টি ভাঙলো। নিজ মোটরে পৌঁছে দিতে চাইলেন আমাকে আমার আবাসে। মিস্টার সাহাকে বললেন, "বীরেন, মিনি সাহেবকে নামিয়ে দিতে হবে কুইনসওয়েতে।"

অতি-আধুনিকারা স্বামীকে নাম ধরেই ডাকেন। ওটা ইংরেজীর নকল। আমি সনাতনী নই। স্বামীর নাম করতে নেই, এ অনুশাসনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ইংরেজী জন, আর্থার, সিরিলের কায়দায় আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের সুধীর, বিকাশ বা উপেন বলে ডাকতে শুরু করলে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠারও কোনো কারণ দেখি না।

মানুষের নামের যদি কেবলমাত্র সনাক্তকরণ ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন না থাকত, তবে

নামের বদলে সংখ্যা ব্যবহারের দ্বারাই তা অনায়াসে চলতে পারত। তা হলে মেয়ের জন্ম মাত্রেই মেয়ের মা তার নামনির্বাচন নিয়ে ভাবনায় পড়তেন না। নিত্য নতুন নামকরণের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি আসত না।

জড় বস্তুর পক্ষে নাম একটা অভিধা মাত্র। গোলাপকে যেঁটু আখ্যা দিলে তার গন্ধের তারতম্য ঘটে না, একথা সেক্সপীয়রের মতো অন্য পাঁচজনেও জানে; যদিও একথা ঠিক যে, কাব্যের সীমানা থেকে শুধু ঐ নামের জন্যেই তার চির নির্বাসনের সম্ভাবনা ঘটে।

কিন্তু মানুষের পরিচয় তো কেবল কোনো বিশেষ একটি সত্তার দ্বারা নয়। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তার বিভিন্ন রূপ। তাকে প্রকাশ করার জন্য তার বিভিন্ন নাম। আপিসে কেরানীবাবুর কাছে যিনি মিস্টার মুখার্জী, পাড়ায় বন্ধুদের কাছে তিনি বিনোদবাবু, বাল্যের সহপাঠীদের কাছে বিন্দে, বাড়িতে মায়ের কাছে খোকন এবং কোনো বিশেষ একটি মাত্র লোকের কাছে তিনি 'ওগো' কিংবা 'শুনছো' নয়তো শুধু মাত্র 'এই'। সেগুলি তো কেবলমাত্র নাম নয়,—সেগুলি নির্দেশ। সংজ্ঞা নয়, সঙ্কেত। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কাছে সেগুলি বিশেষ অর্থ বহন করে, বিশেষ কানের ভিতরে বিশেষ সুর। এবং অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, এই ছোট্ট দুই অক্ষরের সঙ্কেতের দ্বারাই যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

তেরো

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় এমন কতকগুলি দুর্বল মুহূর্ত আসে যখন সে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় দ্বারা বেশী চালিত হয়। সে মুহূর্তগুলি অতর্কিতে দমকা হাওয়ার মতো এসে অতিসাবধানী লোকদের স্থৈর্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন সংযমী যোগী পুরুষেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, হিসেবী মহাজনেরা গরমিল করেন জমাখরচের খাতায় এবং স্বভাবতঃ চাপা প্রকৃতির স্থিতধী ব্যক্তিরা বিচলিতচিত্তে মনের কথা ব্যক্ত করেন অন্য লোকের কাছে। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে আধারকারের পূর্ব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলো একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে। ক্লান্ত সমাহিত নয়ন এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের অন্তরালবর্তী রহস্য শোনা গেল তারই নিজ বর্ণনায়।

অপরাহ্ণ বেলায় ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলেন গ্রীষ্মপীড়িত হতভাগ্যের দল। বৃষ্টি এল না, এল আঁধি। ধূলির ঝড়। না দেখলে কল্পনা করা শক্ত এর রূপ। বাংলাদেশে কোনোকালে দেখা যায় না এ জিনিস। আকাশ-ভুবন আঁধার করে প্রবল বেগে কোথা থেকে আসে এত বিপুল ধূলিরাশি তা ধারণাতীত। মেঘের চাইতে ঘন তার আচ্ছাদন সূর্যকে আবৃত করে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালতে হয় দিনের বেলায়। দোর জানালা নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ করলেও কিছু ধূলা প্রবেশ করে নাকে, মুখে, চোখে, এমনকি বাক্স পেটরার মধ্যস্থিত জামা-কাপড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা মাত্র নেই; শুধু শুষ্ক ধূলির ঝড়। কিন্তু এই আঁধির ফলেই উত্তাপ হ্রাস পায় অভাবনীয় ভাবে, ধরণী হয় শীতল। উত্তর ভারতের এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই আঁধি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছি দুজনে মুখোমুখি। শোঁ-শোঁ শব্দে বাইরে বইছে আঁধির ঝড়ো হাওয়া, আলোড়িত হচ্ছে ধূলির পাহাড়। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে বিবৃত করলেন আধারকার আপন জীবন-ইতিহাস।

আধারকারের কুলগত পেশা যুদ্ধ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা লড়েছে মুঘলের সঙ্গে, লড়েছে যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রপিতামহ বিঠ্ঠলদত্ত পেশোয়া বাজিরাওয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আসাইর যুদ্ধে পেশোয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে শত্রু নিপাত করেছেন অমিতবিক্রমে। নিহত হয়েছেন বুকে গুলির আঘাতে। আধারকার বালক বয়সে দেখেছেন তাঁর কৃষিরাক্ত লৌহবর্ম, পরিবারের সযত্নে রক্ষিত গৌরবময় উত্তরাধিকার। বীরের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে।

পরিবারে বিত্ত ছিল প্রচুর, বীর্য ছিল বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যা ছিল না আধুনিক। আধারকার পিতার একমাত্র সন্তান, শিক্ষা লাভ করেন পুণার এক ইংরেজী স্কুলে। এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজ থেকে পাশ করে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। বয়ন-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হয়ে যখন ফিরলেন স্বদেশে, যুরোপের প্রথম

মহাযুদ্ধ তখন ক্ষান্ত হয়েছে। বম্বেতে স্থাপন করলেন এক কাপড়ের কল, অসুরের মতো খাটতে লাগলেন তাকে সাফল্যমন্ডিত করতে।

বছর পাঁচেক পরের কথা। এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর আগমন সম্ভাবনায় এসেছেন দাদর স্টেশনে। বন্ধু এলেন না। ফিরে আসছেন এমন সময় কানে এল এক নারীকণ্ঠ। সে তো কণ্ঠ নয়, সে সুর। ভাষা বুঝলেন না, পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে এক তরুণী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে সুটকেশ, হোল্ডঅল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি মালপত্র। উভয়ের মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। বম্বেতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তান্ডব চলেছে সাঙ্ঘাতিক। স্টেশনের ভিতরে কুলির অভাব, বাইরে যানবাহনের। সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি বম্বেতে এই প্রথম এলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেম স্টেশনে হাজির থাকতে। আসেননি দেখছি। বোধহয় টেলিগ্রাম পাননি।"

"পেলেও আসা কঠিন। শহরে দাঙ্গা বেধেছে, খুন-খারাপি চলছে বেপরোয়া। আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"তাই তো ভাবছি। কাছাকাছি কোনো হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?"

"তা পারি। কিন্তু জায়গা পাবেন না সেখানে। বেশীর ভাগ হোটেলের চাকর, বেয়ারা, রাঁধুনি পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে; সেখানে বাসিন্দা যারা আছে, তাদের অন্নজলের অভাব, নতুন লোক নেয় না আর।"

"তবে তো বড়ই মুস্কিল" বলে ভদ্রলোক সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন। ভয়ার্ত ভাব সঞ্চারিত হলো তরুণীর মুখমন্ডলে। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে চেষ্টা করে ফল হলো না। সব আগে ভাগেই দখল হয়ে আছে দূরগামী যাত্রীতে। পরম অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা তাঁর স্বামীর দিকে।"

আধারকার প্রস্তাব করলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, চলুন আমার ফ্ল্যাটে। কাল প্রাতে খোঁজ করা যাবে আপনাদের আত্মীয়ের। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।"

ভদ্রলোক তাকালেন স্ত্রীর পানে। তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে ইংরাজীতে বললেন স্বামীকে, যদিও উক্তির লক্ষ্য যে আধারকার তাতে সন্দেহ রইল না। "রাত্রিবেলা হঠাৎ বিনা খবরে আমরা গিয়ে উঠলে ওঁর স্ত্রীকে খুব বিব্রত করা হবে।"

আবার সেই সুর। বোধ করি, এ সুর ছিল ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর, যা দিয়ে তিনি রাজপুত যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যুদ্ধে প্রাণ দিতে, হয় তো ছিল হেলেন অব ট্রয়ের, যাঁর জন্য সহস্র রণতরী ভেসেছিল সাগরে!

আধারকার বললেন, "এক রাত্রির জন্য নিরুপায় অতিথিদের গৃহে আতিথ্য দিলে স্ত্রীকে বিব্রত করা হয় কিনা জানি নে, হয়তো হয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হোন আমার স্ত্রী মোটেই বিব্রত হবেন না, কারণ আমার স্ত্রী নেই।"

"স্ত্রী নেই? ওঃ, তা হলে—"বলতে বলতে থেমে গেলেন ভদ্রমহিলা।

আধারকার বললেন, "তা হলে কী?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা কোনোরকম করে রাতটা প্ল্যাটফরমেই কাটিয়ে দেবো।"

"ওঃ, ব্যাচিলরের বাড়িতে অতিথি হওয়াটা সামাজিকতায় বাধে বুঝি? মনে ছিল না। বেশ, প্ল্যাটফরমেই থাকবেন। ভয় নেই। গোয়ানিজ কুলীগুলি দেখছিনে বটে এখন, তবে আছে কাছাকাছিই। জড়োয়া গয়না আছে গায়ে, সুটকেশগুলির ভিতরেই বা না কোন শ' কয়েক টাকার জিনিসপত্র হবে। আশা করি, তাদের আসতে বিলম্ব হবে না। কাল মৃতদেহ সনাক্ত করার দরকার হলে খবর দেবেন। আচ্ছা, চলি, গুড নাইট" বলে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হলেন আধারকার। স্বরে তার অপমানিতের ক্ষোভ এবং উষ্মা।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই আবার দেখা গেল আধারকারকে ফিরে আসতে। বললেন, "দেখুন, একটা উপায় মাথায় এল। আমার ফ্ল্যাটেই চলুন। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি কাছাকাছি আমার কেরানীর বাড়িতে গিয়ে বরং শোব। তা হলে বাড়ির দোষ থাকবে না ব্যাচিলরত্বের।

ভিতর থেকে আগল এঁটে দেবেন ভালো করে, আর যাই হোক, প্ল্যাটফরমের চাইতে আশা করা সেটা নিরাপদ হবে !"

গোয়ানিজ কুলীর নামে মহিলাটির মনে যথেষ্ট ভয় ধরেছে। স্বামীটিরও প্ল্যাটফরমে রাত কাটানোর কল্পনাটা খুব প্রীতপ্রদ মনে হচ্ছিল না। সুতরাং আধারকারের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কুলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। আধারকার নিজে দু'হাতে অবলীলাক্রমে দুটো বড় সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলেন গাড়িতে।

ছোট ফ্ল্যাট। একটি মাত্র শয়নকক্ষ। আহারাদির পর আধারকার প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকী, কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমার কেরানীর বাড়িতে ?"

"কেরানীর বাড়িতে ? সে কতদূর ?"

"মাইল পাঁচেক হবে।"

"এত রাত্রিতে সেখানে ? কোনো বিশেষ দরকার আছে কী ?"

"দরকার রাত্রিটা কাটানো।"

"কেন এ-বাড়ি দোষ করল কী ?"

আধারকার এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, "দোষ নয়, মানে আপনাদের অসুবিধে—"

বাধা দিয়ে মহিলাটি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, "আমাদের অসুবিধার কথা আপনাকে কে বলেছে ? আর যদি হয়ই অসুবিধা ; আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আপনাকেই এই দাঙ্গা হাঙ্গামার রাত্রিতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা করব, আমাদের এতখানি জংলী ঠাওরালেন কেন ? তার চেয়ে বলুন, আমরা আবার সেই স্টেশনের প্ল্যাটফরমেই ফিরে যাচ্ছি।"

স্বামী ভদ্রলোকও জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষেপেছেন মশাই, এই রাত্রিতে যাবেন বাইরে।"

কিন্তু আর একদফা তর্ক দেখা দিল শয়ন-ব্যবস্থা নিয়ে। একটি মাত্র খাট। আধারকার চান সেটি দখল করবেন অতিথিরা, তিনি ড্রয়িং-রুমের মেজেতে ঘুমাবেন। অতিথিদের ইচ্ছা ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এবারেও মহিলাই জয়লাভ করলেন।

নিজের ঘরে শুতে যেতে যেতে আধারকার বললেন, "এ ভারি অন্যায় হলো। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা সুবিধের নয়। নিজে আরাম করে খাটে নিদ্রা দিচ্ছে, আর অতিথিদের ভূমিশয্যা।"

মৃদু হাস্যে মহিলাটি বললেন, "লোকটি আপনি সুবিধের নন, তা টের পেয়েছি ! অত্যন্ত ঝগড়াটে।"

"ঝগড়াটে ? বাঃ ঝগড়া করলেম কখন ?"

"করলেন না ? সেই যে প্ল্যাটফরমে কী বলেছি, তা নিয়ে কত কথা শোনালেন, কেরানীর বাড়ি শুতে যেতে চাইলেন ! যান, আর কথা নয়। রাত হয়েছে। এখন, লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

পরদিন আধারকারের ঘুম ভাঙলো অনেক বিলম্বে ভৃত্যের ডাকাডাকিতে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে এসে দেখেন, টেবিলে প্রাতরাশ প্রস্তুত। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করতে মহিলাটি হেসে বললেন, "কাল রাত্তিরে শুতে যাবার সময় বললেন, আমাদের ভূমিশয্যার কথা মনে করে খাটে শুয়ে ভালো ঘুম হবে না আপনার। কনশেন্স খোঁচা মারবে ! এই আপনার ঘুম না হওয়ার নমুনা ? কনশেন্সের খোঁচা নিয়েই বেলা আটটা ?"

আধারকার লজ্জিত হয়ে বললেন, "দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা কনশেন্সটাও ঘুমে বেহুঁশ হয়েছিল।"

উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো টেবিলে। স্বামী ও গৃহস্বামীর অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশল নারীকণ্ঠের কলধ্বনি। মহিলা বললেন, "তাই নাকের ডাকে পাশের ঘরে চোখের দু'পাতা এক করা দায় !"

"নাকের ডাক ? নাক ডাকে নাকি আমার ? কই, আমি তো টের পাইনি কখনও।"

"ঐতো মজা। যখন টের পাওয়ার অবস্থা হয়, নাক তখন আর ডাকে না।" আবার সেই পুরুষ ও নারীকণ্ঠের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার কিছু আগে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁদের আত্মীয়ের গৃহে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন তাঁদের ওখানে একদিন অবকাশমতো আসবার। আধারকার প্রস্তুত ছিলেন তখনই তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসতে, শুধু সেটা নিতান্ত অশোভন হবে বলেই মনকে নিরস্ত করলেন।

তাঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আধারকার এসে বসলেন বারান্দায়। পড়তে চেষ্টা করলেন অন্যদিনের মতো এক ইংরেজী প্রেমের উপন্যাস। এগুতে পারলেন না বেশী দূর। মন বার বার উন্মনা হতে লাগলো। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বিলিয়র্ড খেলতে যান জিমখানা ক্লাবে। সেদিন কিছুমাত্র উৎসাহ রইল না তাঁর।

সুনন্দা ব্যানার্জীরা দিন দশেক রইলেন বম্বেতে। প্রত্যহ অপরাহ্নে আপিস থেকে আধারকার সোজা এসে হাজির হতেন ব্যানার্জীর আত্মীয়গৃহে। দল বেঁধে যেতেন কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন এপোলো বন্দর, কোনোদিন মহালক্ষ্মী মন্দির, কোনোদিন বা এলিফেন্টার কেভস্।

বম্বে ত্যাগ করে স্বস্থান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যানার্জী দম্পতি। আধারকার রইলেন বম্বেতে ফিরে গেলেন আপন রূপহীন রসহীন, বৈচিত্র্যবর্জিত জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে। প্রভাত আর আনে না কোনো প্রত্যাশা, সন্ধ্যায় ঘটে না কোনো প্রার্থিত সান্নিধ্য, রাত্রিতে থাকে না পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। সুনন্দাবিরহিত নগরীর কুত্রাপি নেই কোনো আকর্ষণ, কোনোখানে নেই মধু, নেই স্বাদ।

কিন্তু বিচ্ছেদ মানেই নয় ছেদ, যতির অর্থ নয় ইতি। অদর্শনের সান্ত্বনা থাকে পত্রে, বাচনের বিকল্প লেখনে। লাহোর পৌঁছে সুনন্দা ব্যানার্জী লিখলেন,—

"মিস্টার আধারকার, নিরুপায় নিশীথে অপরিচিত আগন্তুকদের আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। আতিথ্য দিয়েছিলেন অকৃপণ ঔদার্যে,—সে জন্য ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্য স্মরণে রাখব চিরকাল।"

জবাবে আধারকার লিখলেন,—

"এক রাত্রির অবস্থিতির দ্বারা ব্যাচিলরের গুহাকে আপনি দিয়েছেন সম্মান, গৃহস্বামীকে দিয়েছেন দুর্জয় মর্যাদা। কৃতজ্ঞতা তো জানাব আমি। সৌজন্যের প্রকাশ কর্মে, সেটা সহজসাধ্য ; প্রীতির প্রবেশ মর্মে, তা দুর্বহলভ্য। মিসেস্ ব্যানার্জী, আপনার অনুগ্রহ বচনাতীত।"

ত্বরিত উত্তর এল পত্রের। "দেখছি, আপনার কৃশলতা শুধু আতিথেয়তায় নয়, পত্ররচনায়ও বটে। মশাই, আপনি তো চারুদত্ত নন, আপনি চারুবাক।"

এমনি করে চিঠি লেখালেখির খেলা চলে দুই পক্ষে। সে-চিঠিতে উক্তের চাইতে অনুক্তের ভাগ বেশী ; শব্দের চাইতে অর্থের।

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলো আধারকারে জীবনে। তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকে এ পর্যন্ত কেটেছে পুঁথিপত্র আর কলকারখানা নিয়ে। পরীক্ষায় পাশ আর অর্থার্জন। সোনার কাঠি ছোঁয়ানো রূপকথার রাজকন্যার মতো অকস্মাৎ জেগে উঠে আজ নিজেকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। অধীত বিদ্যার শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে নয়, নয় অর্জিত অর্থের বিরাট সঞ্চয়স্থলীতে। আবিষ্কার করলেন আপন উপবাসী হৃদয়ের অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে।

কর্মহীন সন্ধ্যায় নির্জন গৃহকোণে ভাবতে ভালো লাগে যে স্মৃতি, সে সুনন্দার ! সুষুপ্ত রাত্রির তিমিরস্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়ে যে-প্রসঙ্গ, সে সুনন্দার। প্রভাতে প্রথম জাগরণে স্মরণে আসে যে-মুখ, সে সুনন্দার। এ কী বিস্ময়, এ কী রহস্য, আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত এ কী অনির্বচনীয় অনুভূতি !

নিজের হৃদয় যতই উদ্ঘাটিত হয় নিজের কাছে, লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন আধারকার। শাসন করেন দুর্বল চিত্ত। পাছে কোনোদিন কোনো অসাবধান মুহূর্তে সুনন্দার কাছে ইঙ্গিতমাত্রে প্রকাশ পায় মনোভাব, সে দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হন।

"তোমাকে আর একটু জিন অ্যাণ্ড লাইম দেবে, মিনি সাহেব ?" হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকার।

গ্লাসে তখনও অর্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেম, "অলমতি বিস্তরেণ।"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "আমাকে নিশ্চয়ই একটা ভিলেন মনে হচ্ছে।"

জবাবে বললেম, "আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। আমি রিপোর্টার, রিফর্মার নই। মিনি-সংহিতায় বিধান নেই কোনো প্রায়শ্চিত্তের।"

স্বল্প বিরতির পর খণ্ডিত আখ্যানের অনুবৃত্তি শুরু করলেন আধারকার।

মাস তিনেক পরে মিলসংক্রান্ত প্রয়োজনে আসতে হলো লাহোরে। বলা বাহুল্য, অতিথি হলেন ব্যানার্জী-ভবনে।

অতিথিকে ভারতীয়েরা সেবা করেন পুণ্যকামনায়, তাকে যত্ন করেন ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অতিথিকে আপন করা যায় একমাত্র হৃদ্যতার জোরে। সে হৃদ্যতার প্রাচুর্য ছিল সুনন্দার। একাধিকবার বার্থ রিজার্ভ ও ক্যান্সেলেশনের পরে বম্বেতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তিন-চারে বারো দিন কাটিয়ে। কিন্তু যে-আধারকার বম্বে থেকে গিয়েছিলেন এবং যে-আধারকার লাহোর থেকে ফিরলেন তাঁরা এক ব্যক্তি নন। ইতিমধ্যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে।

লাহোরে সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় গিয়েছিলেন এক পরিচিত বন্ধু সন্দর্শনে, শহর থেকে অনেকটা দূরে। আশা ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, নৈশভোজন সমাধা করতে হলো সেখানে। ফেরার পথে নামল বৃষ্টি। তার উপরে বাহন হলো বিকল। টাঙ্গার অশ্ব ও আসন দুই-ই প্রাচীনত্বে সমান, চলতে চলতে একটি চাকা স্থানচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ; আরোহী সবলে নিক্ষিপ্ত হলেন কর্দমাক্ত পথে। উত্তর ভারতে শীতকালের বর্ষণ বর্ষার প্রবল বারিপাতকেও হার মানায়। জনহীন পথপ্রান্তে সিক্ত হলেন দীর্ঘকাল, ব্যানার্জীগৃহে যখন এসে পৌঁছলেন রাত তখন প্রায় চারটা।

মৃদু আঘাত করতেই দ্বার খুলে দিলেন যিনি তিনি স্বয়ং সুনন্দা।

"কোথায় ছিলে এই ঝড় বাদলার মধ্যে? সারা রাত ধরে উৎকণ্ঠায় মরছি" বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো বাষ্পে। ঝর ঝর ধারায় অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ডে। আত্মসংবরণ করতে ত্বরিত অন্তর্হিতা হলেন পাশের কক্ষে।

দোর খোলার শব্দে গৃহস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমরা ভেবে ভেবে মরি, বিদেশ বিভূঁই, এই দুর্যোগের রাত্রিতে কোথায় কী হয়। সুনন্দা তো এক মিনিটের জন্য বিছানায় যায়নি, কেবল বারান্দায় এদিক ওদিক করেছে। একটু শব্দ হলেই টাঙ্গা এল ভেবে নীচে যায়।"

আধারকার বাহনবিভ্রাট বিবৃত করলেন সবিস্তারে, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ বিলম্বের জন্য। সুনন্দা বেরিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "ভিজে জামা-কাপড়গুলি ছাড়া হবে কি? টাঙ্গার চাকা ক'ইঞ্চি ভেঙেছে, ঘোড়া ক'গজ লাফিয়েছে সে সব কাহিনী কাল সকালে ব্যাখ্যান করলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মাথা থেকে এখনও জল ঝরছে, নিউমোনিয়া না বাধালে বোধ হয় বাহাদুরিটা পুরা হবে না।"

বোঝা গেল, শাসনকর্ত্রী নেপথ্যেই ছিলেন, টাঙ্গা দুর্ঘটনার বিবরণ শুনেছেন স্বকর্ণে।

আপন শয়নকক্ষে এসে নিদ্রার চেষ্টা করলেন আধারকার। ঘুমঘুম এল না। মুদ্রিত কমল-কলিকার পার্শ্বে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মতো মন বারংবার কেবলই প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল একটি কক্ষপথে। অতিথির বিলম্বে গৃহকর্ত্রীর এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র নয়নে এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, সকোপন অভিমান-জড়িত এই শাসন এবং সর্বোপরি এই অশ্রুধারা প্লাবিত আননের মধ্যে দিয়ে নারীহৃদয়ের কোন গোপন রহস্য আজ অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হলো? শয্যা ত্যাগ করে আধারকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রাত্রি বিগতপ্রায়। তারকাহীন নভস্তল মেঘমালায় আবৃত এবং দিগন্তবর্তী তরুশ্রেণী বিলীয়মান রজনীর ঈষৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আসন্ন প্রভাতের প্রতীক্ষারত ধরণীর এই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তির

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধারকার যেন আজ তাঁর জীবন-দেবতার প্রসন্ন কল্যাণ করস্পর্শ প্রথম অনুভব করলেন ললাটে। দুই হাত যুক্ত করে প্রণাম করলেন কাকে তা তিনি নিজেই জানেন না। শুধু "আমি ধন্য, আমি ধন্য" এই বাক্য তাঁর উদ্বেল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উত্থিত একটি মহান সঙ্গীতের মতো দ্যুলোক, ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে বিশ্বলোকের বীণাতন্ত্রীতে অনাহত রাগিণীতে ধ্বনিত হতে লাগল।

আধারকার থাকেন বম্বেতে, সুনন্দা থাকেন লাহোরে। প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু যোজনা গণনা করে নয় দূরত্ব, নৈকট্যের নির্দেশ হৃদয়ে। হৃদয়ের সে অদৃশ্য যোগাযোগের নিবিড় বন্ধনে বহুদূরবর্তী এই দুটি নরনারী পরস্পরের কাছে রইলেন নিকটতম।

সুনন্দা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, "চারু, ইংরেজীতে কথা কয়ে সুখ নেই। আমি যদি মারাঠি বলতে পারতেম তবে বেশ হতো!"

আধারকার বললেন, "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসতে পারে, মহম্মদ যাবে পর্বতসকাশে।"

অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ'মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসরকালে কণ্ঠস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দু'বছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য।

আধারকারের পরিজনেরা পরলোকগত। এক বোন স্বামী-পুত্র নিয়ে আছে কলকাতায়। তার সঙ্গেও যোগাযোগ সুদূর নয়। এতকাল বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিলেন আধারকার। কর্মে, চিন্তায়, জীবনযাপনে ছিলেন স্বাধীন। এবার সে-স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারা হলো বদল। বম্বে থেকে চিঠি লেখেন লাহোরে, "নন্দা, বাড়ির বেয়ারাটা ছুটি চাইছে তিন মাসের আগাম মাইনে সমেত, দেবো কিনা লিখো।" কিংবা লেখেন, "মালবার হিল্‌সে ওয়ালকেশ্বর রোডে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে সস্তায়। কিনব কি?"

নিজের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভাবনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এক দূরবর্তিনী নিঃসম্পর্কীয়া অভিভাবিকার হস্তে, কিছুদিন মাত্র আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আত্মসমর্পণে যে এত সুখ, নির্ভরতায় যে এত প্রশান্তি, তা কখনও জানেননি এর আগে।

চৌদ্দ

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আধারকারকে যেতে হলো বিলাতে। লাহোর থেকে সপত্নীক ব্যানার্জী সাহেব এসে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন ব্যালার্ড পিয়ারে।

দিন গেল, মাস বিগত, বৎসরও অতীত প্রায়। বিরহ বেদনায় পীড়িত যে-দিনগুলি অন্তহীন মনে হয় প্রথমে, তারও শেষ আছে। আধারকার প্রত্যাবৃত্ত হলেন স্বদেশে। অবিলম্বে গেলেন লাহোরে।

অঘ্রাণের প্রভাত। ট্রেনের কামরায় ঘুম ভেঙে গিয়ে আধারকার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্মেঘ আকাশে সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত। শাল তরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরার্দ্র বাতাসে মৃদু কম্পিত। টেলিগ্রাফের তারের উপরে উপবিষ্ট একজোড়া খঞ্জনী পক্ষিশাবক ঘন ঘন পুচ্ছ-আন্দোলনরত। অকারণ খুশিতে ভরে উঠল তাঁর মন।

অপরাহ্ণে লাহোরে স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন একা ব্যানার্জী সাহেব এসেছেন অভ্যর্থনায়। বাড়ি পৌঁছে বেয়ারার হাতে পেলেন চিঠি। অতি পরিচিত অক্ষরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এক বিশেষ জরুরী কাজে একটি মহিলাকে নিয়ে যেতে হলো এক জায়গায়, চায়ের ব্যবস্থা রইল বেয়ারার কাছে, আধারকার যেন চা খেয়ে নেন। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবেন তিনি।

শুধু চায়ের ব্যবস্থা নয়, স্নানের ঘরে বাথ-টবে ধরা আছে জল, টাওয়েলর‍্যাকে ধবধবে তোয়ালে, সোপ-কেসে আছে আনকোরা সুগন্ধি সাবান। শয়নকক্ষে পরিপাটি বিছানা, খাটের পাশে ছোট টিপাইর উপরে সুদৃশ্য টেবিলল্যাম্প ও খানকয়েক সদ্য প্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস, মায় জয়পুরী ফুলদানীতে সযত্নে বিন্যস্ত আধারকারের প্রিয় শ্বেত করবীগুচ্ছ।

অতিথির পরিচর্যায়, আদরে, আপ্যায়নে লেশমাত্র ত্রুটি নেই কোনোখানে। তবুও কেন যে

অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে আধারকার নিজেই তা জানেন না। প্রবাসে কতদিন নিদ্রাহীন রজনীতে কল্পনা করেছেন আজকের এই মুহূর্তটি। কী বলবেন, তা নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করেছেন, কত বার। দীর্ঘ বারোমাসের পুঞ্জীভূত কথার মধ্যে কোনটি বলবেন সর্বাগ্রে কোন প্রশ্ন, কোন সংবাদ দেবেন ও নেবেন, তাই নিয়ে অবসরক্ষণে ভেবেছেন কতদিন। দেখা হলে যে-কথা ভেবে রেখেছিলেন, তা হয়তো যেতো তলিয়ে, অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য রইত চাপা, হয়তো শুধু উচ্চারণ করতেন ছোট্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন "কেমন আছ ;" তার কিছুই হলো না। খচখচ করতে লাগল আধারকারের মন। হেমন্তের দিনটি যে অপরিসীম আনন্দের অর্ঘ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, সে আনন্দ নিয়ে যেন শেষ হলো না।

আধারকার সাতদিন রইলেন লাহোরে। সুনন্দার সেবা, যত্নে ও আতিথেয়তায় রন্ধ্র মাত্র রইলো না কোথাও, কিন্তু তবুও যেন আগেকার সে সুর বাজল না আধারকারের মর্মে, রস সঞ্চারিত হলো না অতিথির মনে। কোথায় রইল ফাঁক, কোনখানে ঘটল ব্যত্যয়, তার নিশানা পাওয়া গেল না। শুধু ব্যথা জেগে রইল হৃদয়ের নিভৃততম গহ্বরে। যে-অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায়, তার বেদনা দূর করার উপায় কী ?

সুনন্দা কি বদলেছে ? কই বোঝা তো যায় না। কিন্তু মন বলে, কী যেন নেই। অতি সামান্য বিষয় কাঁটার মতো বিঁধে আধারকারের মনে, কুশের অঙ্কুর সম ক্ষুদ্র, দৃষ্টিঅগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম। কিন্তু সেগুলি এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, তা নিয়ে নালিশ করতে গেলে হাস্যকর ঠেকে। আধারকারের কোটের যে একটা বোতাম ছিঁড়েছে তা যদি একদিন সুনন্দার চোখে না পড়ে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। একটা মস্ত সংসারের সমস্ত পরিচালনভার যে-গৃহিণীর মাথায়, তার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু মানুষের মন তো ইণ্ডাক্টিভ লজিকের পাঠ্য কেতাব নয়। সে ফস্ করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, কই, আগে তো এমন চোখে না পড়তে দেখিনি কখনও।

লাহোর ত্যাগের দিন আধারকার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন ব্যানার্জীদের এক বন্ধু-পরিবারে। সে-গৃহে আধারকারের সম্প্রীতি জন্মেছিল সুনন্দাদেরই বন্ধুতাসূত্রে। গৃহস্বামীর কন্যা বললেন, "আজই যাচ্ছেন কী রকম ? এলেন তো এই সে দিন !"

"সে-দিন আর কোথায়, দিন দশেক তো প্রায় হলো !"

"দশ দিন ? কক্ষনো নয়, আমি বলছি অনেক কম। সাত দিন। আচ্ছা বাজী রাখুন ? আপনি এসেছেন গেল শনিবারে, সেই যেদিন সুনন্দাদি, রাণু মাসিমা, আমরা সব সিনেমায় গেলাম।"

"সিনেমায় গেলে ?"

"হ্যাঁ, রাণু মাসিমা এসেছিলেন এখানে বেড়াতে ! তিনি সেণ্ট এনড্রুজে সুনন্দাদির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন তো ? তিনি ধরলেন সিনেমায় যেতে হবে। টিকিট কেনা হয়ে গেছে পর খবর এল আপনি আসছেন ঐ দিনই বিকালে। সুনন্দাদি তাই যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু রাণু মাসিমা চলে যাবেন পরদিন সকালে। কাজেই শেষটায় অনেক বলাতে রাজী হলেন। কই আপনি শুনছেন না তো, কী ভাবছেন ? বাজী হেরেছেন কিন্তু।"

আধারকারের মুখে-চোখে যে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হলো, তাকে বাজীতে হেরে যাওয়ার শোক মাত্র বলে গণ্য করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না একটুকুও

আধারকারকে ট্রেনে তুলে দিতে সে-দিন সন্ধ্যায় যথারীতি স্টেশনে এসেছিলেন স্বামী স্ত্রী। ওয়েটিং রুমের একান্তে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ সারাদিন এত অনমনা দেখাচ্ছে কেন ? কী এত ভাবছো বলো তো ?"

আধারকার চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করে বললেন, "কই না, তো !"

ট্রেন ছাড়ল। প্ল্যাটফরমের উপর রুমাল সঞ্চালনরত বান্ধব-বান্ধবীদের মূর্তি দূর হতে দূরতর, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের লাল আলোটা ধীরে ধীরে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

ব্যর্থে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে আধারকার ভাবতে লাগলেন সেই একই কথা যা আজ সকাল

বেলা থেকে কিছুতে তাড়াতে পারছেন না মন থেকে। কেমন করে সম্ভব হলো তার আগমন দিনে সুনন্দার পক্ষে বন্ধুবীসঙ্গ ? প্রিয়সান্নিধ্যের চাইতে বড় হলো সিনেমা ? টিকিট কেনা ছিল ? কত লক্ষ টাকা দাম সে টিকিটের ? কথা দেওয়া হয়েছিল বান্ধবীকে ? কথা কি ভাঙা যায় না কিছুর জন্যই ? কই আধারকার তো কল্পনা করতে পারে না এমন কোনো এন্‌গেজমেন্ট যা সুনন্দার অভ্যর্থনার জন্য সে অগ্রাহ্য না করতে পারে অবহেলে। এক বছর পরে সুনন্দা যদি আসত লণ্ডন থেকে পুণায়, কিংবা ধরো লাহোর থেকে বম্বেতে, আধারকার কি তার নিকটতম বন্ধুর অনুরোধ এড়াত না, মাথাধরা বা শরীর খারাপের কল্পিত অজুহাত দেখিয়ে ? প্রিয়জনের জন্যে মিথ্যাভাষণেও কি নেই সুখ ?

বেশ তো, না হয় ধরে নেওয়া গেল, বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। আগেভাগে টিকিট কেনা ছিল, যেতে হয়েছে সিনেমায়। এতে দোষ কিছুই নেই। কিন্তু তার জন্য গোপনীয়তার আবশ্যক ছিল না, ছিল না জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে এই মিথ্যা ছলনার !

বম্বেতে মন বসল না কাজে, তিষ্ঠিতে পারলেন না দীর্ঘকাল। আবার গেলেন লাহোরে। কিন্তু খণ্ডিত লয় খেয়াল গানের মতো কিছুতে পৌঁছতে পারলেন না আর সমে, বেতালা বেসুরো বাজতে লাগল জীবনের রাগিণী। ভারকেন্দ্র থেকে যেন চ্যুত হয়ে পড়ল এই দুটি অনাত্মীয় নরনারীর তিন বছর ধরে দিনে দিনে গড়া হৃদয়সৌধ। ফিরে গেলেন বম্বেতে। এমনি করে বারংবার যাওয়া আসা করলেন বম্বে থেকে লাহোরে, লাহোর থেকে বম্বে।

অবশেষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে এই অস্থির ব্যাকুলতার একদিন ঘটল অবসান।

আধারকার আবার লাহোরে। সংশয় বেদনায় বিচলিত। অথচ প্রকাশ্য অভিযোগের নেই উপলক্ষ। কারণ সুনন্দার প্রতি আধারকারের দাবি তো অধিকারের নয়, অনুভূতির। দাবি হৃদয়ের। সে হৃদয় যুক্তি-জ্ঞানহীন শিশুর মতো বারংবার কেবলই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুপুরে আপিসের কাজে বের হওয়ার কালে সে-দিন সুনন্দা কাছে এসে দাঁড়ালেন না, আগের মতো এগিয়ে দিলেন না রুমাল, ফাউন্টেন পেন, হাতের ঘড়ি ও পকেটের পার্স। ঝি বললে, "মেমসাব রসুইমে আলু বনাতী হৈঁ।" পরদিন সন্ধ্যাবেলা আপিস প্রত্যাগত আধারকার কাউকে প্রতীক্ষমানা দেখলেন না দোতলার বারান্দায়। শুনলেন ধোবার কাপড় মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত আছেন মেমসাব।

ক্ষুণ্ণ হবার কিছুই নেই এতে। কিন্তু অভিমানাহত মন বলে, কই ইতিপূর্বে কখনও তো ঘটেনি এমন দুর্ঘটনা। আধারকারের নির্গম-আগমনক্ষণে কোনো দিন দেখা যায়নি রন্ধনশালায় আলু কর্তনের প্রতি গৃহিণীর এই অপ্রতিরোধনীয় অনুরাগ এবং রজকের অপহরণপ্রবণতার বিরুদ্ধে মেম সাহেবের এই সতর্ক পাহারা।

ব্যানার্জীর আপিসে কাজের চাপ ছিল বেশী, প্রত্যাগমনে ঘটবে বিলম্ব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আধারকার প্রস্তাব করলেন, "চল বেরিয়ে আসি সাহাদারা গার্ডেনস্।"

সুনন্দা বললেন, "না।"

তবু পীড়াপিড়ি করলেন আধারকার।

"কেন, চল না।"

"না, একা তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে কী বলবে ?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন আধারকার। সুদূর অতীতের কথা নয়, স্মৃতিকে করতে হবে না মন্থন। এই তো বিলেত যাওয়ার আগেও কতদিন দুজনে গেছেন সালিমার বাগে, সিনেমায়, জুহুর সমুদ্রতীরে, বম্বের রেস্তোরাঁয়। সুনন্দা নিজে উদ্যোগ করে নিয়ে গেছেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনে, ব্যানার্জী রয়েছেন লাহোরে। সে-দিন কোথায় ছিল লোকেরা, কোথায় ছিল তাদের মন্তব্যের প্রতি সহচারিণীর এই অসাধারণ শ্রদ্ধা ?

লোকে দেখলে কী বলবে ? হায়রে এ প্রশ্ন যে আধারকারই আগে তুলেছিলেন একদিন অতীতে !

বম্বেতে সেবার শীতের শেষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলো মহামারীরূপে। আধারকারের গায়ে বেরুল গুটিকা। কী জানি কেমন করে খবর পৌঁছল লাহোরে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুনন্দা এসে

হাজির হলেন আধারকারের ফ্ল্যাটে। আধারকার বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি ?
শঙ্কা, স্নেহ ও অভিমান জড়িত কণ্ঠের উত্তর শুনলেন, "তা ছাড়া আর দুর্ভোগ আছে কার ?
ক'দিন হয়েছে ?"

"দিন চারেক, কিন্তু আমি তো খবর দেব না বলেই ঠিক করেছিলাম।"

"তা করবে না ? তা না হলে আর আমাকে ভাবিয়ে মারবে কেমন করে ?"

আধারকার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "এই ছোঁয়াচে রোগ, এর মধ্যে আসবার মন্ত্রণা দিল কে তোমা ক ?"

ক্রু ি হয়ে সুনন্দা বললেন, "দেখ, আমাকে রাগিও না বলছি। মন্ত্রণা দিয়েছে কে ? মন্ত্রণা দিয়েছে আমার অদৃষ্ট।" খানিক থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকর বাকর হতভাগাগুলো গেছে কোন চুলোয় ?"

"বাবুর্চি আর বেয়ারাটা পালিয়েছে ভয়ে। মাদ্রাজী ড্রাইভারটা আছে। সে-ই ওষুধপত্র আনে।"

"খাসা ব্যবস্থা, শুধু খবরের কাগজে 'শোক সংবাদ' ছাপাটুকুই যা বাকী", বলে সুনন্দা গেলেন ড্রাইভারের সন্ধানে। তাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে মালপত্র আনলেন উপরে। ঘরদোর করলেন আবর্জনামুক্ত, ধূলিহীন। বিছানা ঝেড়ে মুছে নতুন করে রচনা করলেন, স্বহস্তে রোগীর পথ্য তৈরী করলেন পরম নৈপুণ্যে।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন "ব্যানার্জীকে দেখছি না যে ?"

"তিনি তো আসেননি।"

"আসেননি ? তুমি এসেছ কার সঙ্গে ?"

"কারো সঙ্গে নয়, একা।"

"মানে ?"

"মানে আবার কী ? উনি গেছেন ট্যুরে ; ফিরতে দেরী হবে দিন পাঁচেক। তোমার লাহোরের এজেন্টের সঙ্গে পরশু সকালে দেখা হয়েছিল এক দোকানে। তার কাছে খবর পেলেম অসুখের। বাড়িতে তালা এঁটে দুপুর সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরেছি ছুটতে ছুটতে। ওঁকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে এসেছি এখানে রওনা হতে।"

বিস্ময়ে অভিভূত আধারকার বললেন, "ব্যানার্জী রাগ করবেন না ?"

"হয় তো করবেন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "লোকেই বা বলবে কী ? ব্যানার্জী ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন ? একা চলে এলে কেন ?"

বিরক্ত কণ্ঠে সুনন্দা বললেন, "এসেছি আমার ইচ্ছে। লোকের ভাবনা ভেবে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। তুমি চুপ করে ঘুমাও তো এখন।" বলে শয্যাপার্শ্বের চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো বেশী ছিল না, রোগীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য টেবিলল্যাম্পের একটা দিক খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। পশ্চাৎ থেকে সুনন্দার মুখের অংশমাত্র দেখা যায়। কিছুক্ষণ পূর্বে সুনন্দা স্নান করেছেন। আর্দ্র কুন্তলদল পিঠের উপর অযত্নবিস্রস্ত। পরিধানে দেশী তাঁতের একটি শাড়ি। বামস্কন্ধের উপর তার অবিন্যস্ত বঙ্কিম অঞ্চলপ্রান্তের অন্তরাল থেকে নিটোল সুকুমার বাহুটি অনবদ্য ভঙ্গিতে লম্বিত। উন্নত গ্রীবার নিকটে সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারের একটুখানিমাত্র আভাস। মৃদু দীপালোকিত কক্ষে বাতায়নবর্তিনীর এই মৌন মূর্তিটি রোগশয্যাশায়িত আধারকারের কাছে একটি পরম নিশ্চিত আশ্বাসের মতো প্রতীয়মান হলো। দুজনের কেউ আর কোনো কথা বললেন না। শুধু উভয়ের উদ্বেল হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ সমাজ-সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও কলঙ্কের ঊর্ধ্বে দেবমন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নির মতো যেন জ্বলতে লাগল একটি অনির্বাণ অদৃশ্য শিখায়।

পরের দিন ব্যানার্জীও এসে পৌঁছলেন। আধারকারের বসন্ত আসল নয়, চিকেন। কিন্তু রোগমুক্ত হতেই সুনন্দা জোর করে নিয়ে গেলেন লাহোরে এবং পক্ষাধিককাল পূর্বে আধারকার ছাড়া পেলেন না বম্বেতে ফিরতে।

সে-দিনের সুনন্দার দৃষ্টি ছিল না বাইরে, গ্রাহ্য ছিল না লোকাপবাদের, মন ছিল ইতরজনের নিন্দা-প্রশংসার অতীত। সংসারে ছিল না আসক্তি, গৃহকর্মে ছিল না আকর্ষণ, স্বামীতে ছিল না মনোযোগ। কতদিন আধারকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সুনন্দাকে, "এই, ব্যানার্জী এসেছে আপিস থেকে। যাও, দেখগে তার কী চাই।"

সুনন্দা বলেছেন, "আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। তোমাকে আর গিন্নীপনা শেখাতে হবে না। তুমি ব্যানার্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না?"

সেদিনের সুনন্দা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। সে শুধু প্রণয়িনী। সে তো সুনন্দা ব্যানার্জী নয়, সে সুনন্দা প্রিয়দর্শিনী।

সুনন্দারা হিন্দু নয়, খ্রীস্টান। বহু বর্ষ পূর্বে তাঁর পিতামহ এসে স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন লাহোরে। সুনন্দা মানুষ হয়েছেন য়ুরোপীয় আবেষ্টনে, বিদ্যাভ্যাস করেছেন শ্বেতাঙ্গদের কনভেন্টে, পরিণীতা হয়েছেন খ্রীস্টীয় প্রথায়। তাঁদের সমাজে তরুণীরা অবগুণ্ঠনবতী নয়, স্ত্রীরা নন অন্তঃপুরিকা। পুরুষের অবাধ সাহচর্য সেখানে নিন্দনীয় নয়, বাইরে বন্ধুসঙ্গ নয় নিষিদ্ধ। এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহেও সামাজিক অন্তরায় ছিল না সুনন্দার।

কঠোর তিক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন আধারকার। মোহভঙ্গ হয়েছে সুনন্দার। সুধার পাত্র হয়েছে রিক্ত। মন্থন করলে আর উঠবে না মধু, উঠবে হলাহল।

সে-দিন অপরাহ্ণ বাড়ি ফিরবার উৎসাহ ছিল না আধারকারের। টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন ফিরতে বিলম্ব হবে তাঁর। বহুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপস্থিত হলেন ম্যালের পাশে সিনেমা হলের সম্মুখে। কী যেন-কী খেয়াল হলো, টিকিট কিনে প্রবেশ করলেন ভিতরে। ছবি তখন শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে টিকিট চেকার বসিয়ে দিয়ে গেল একটা আসনে। নির্বাক চিত্র। কিড়্‌ড়্‌ শব্দে প্রজেক্টারের আওয়াজ শোনা যায় স্পষ্ট। দর্শকদের আলাপ, আলোচনা, মন্তব্যেরও বাধা থাকে না।

হঠাৎ নিজের নাম কানে আসতে চমকে উঠলেন আধারকার। সামনের সারিতে কারা বসেছেন অন্ধকারে তা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু তাঁরা যে পুরুষ নন সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। আধারকার উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন।

"যাই বলিস ভাই, এড্‌মায়ারার-এর সংখ্যা আর বাড়াসনে। আধারকার বেচারা তো মরেছে তোর হাতে, আর কেন?"—চাপা কণ্ঠে বললেন একটি মহিলা।

উত্তর হলো, "হ্যাঁ, বলেছে এসে তোর কানে কানে!"

আধারকার আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন মাটিতে। ভুল করার সাধ্য কি ও কণ্ঠ? এ কণ্ঠ যে তাঁর জীবন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রথম শুনেছিলেন তিন বছর পূর্বে দাদর স্টেশনে।

সখীদ্বয়ের পরিহাস পরিবাদ চলতে লাগল মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু আধারকারের শ্রুতির অগোচর রইল না এক বর্ণও।

প্রশ্নকর্ত্রী বললেন, "কানে কানে বলতে হবে কেন? আমাদের কী চোখ নেই? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর কোনো আশা নেই লোকটার।"

"ইস্, বড় যে দরদ্ দেখছি। ওগো করুণাময়ি, তবে তুমিই ত্রাণ কর না কেন তাকে!"

"বলিস কি! সইতে পারবি? তা হলে যে তোর মুখচন্দ্রমা অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে আমার!"

"একটুও না। দিব্যি করে বলছি, আমার তাতে কি আসে যায়? বরং ছাড়া পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" কণ্ঠ পরিহাসতরল নয় এবার!

প্রশ্নকর্ত্রী নিজেও বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। কৌতুক পরিহার করে বললেন, "কেন ভাই, আধারকারকে তো বেশ ভালো লোক মনে হয়। ভদ্র, শিক্ষিত, বিত্তশালী অথচ স্নব নয়,—বেশ সিম্পল।"

"সিম্পল নয়, সিম্পটন। কাণ্ডজ্ঞান নেই এতটুকু। সব জিনিষই অত্যন্ত সীরিয়াসলি নেবে।

কবে কখন fun করে কী বলেছি, কী করেছি, সেটাকেই মনে করে বসেছে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। ইডিয়ট! সত্যি বলছি তোকে, আমি ক্রমশঃ যেন টায়ার্ড হয়ে উঠছি।"

হঠাৎ ছবির স্পুল ছিঁড়ে গিয়ে ছবি হলো বন্ধ, আলো জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের। সে আলোতে দেখা গেল আলাপ আলোচনারত বান্ধবীদ্বয়কে অদূরবর্তী আসনে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জোড়া-দেওয়া ফিল্ম শুরু হলো। আবার অডিটরিয়মের বাতি দেওয়া হলো নিভিয়ে।

ছবির আখ্যান-ভাগ এক তরুণী শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়কাহিনী। তাঁর দরিদ্র প্রেমাস্পদ চলে যাচ্ছেন দূরদেশে জীবিকার প্রয়োজনে। সন্ধ্যাবেলায় পরিজনের অলক্ষিতে উদ্যান-বাটিকায় তরুণী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সঙ্গিনী হতে চাইলেন দয়িতের। কিন্তু তরুণ চায় না সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতরূপে দুজনে দেখা হয়েছিল এক পান্থশালায়, রাত্রি প্রভাতে যাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে। আর দেখা হবে না কোনো দিন।

শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রেম গভীর। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রশ্ন তাঁর কাছে তুচ্ছ, দৃষ্টি নেই মণি মুক্তা বিলাসোপকরণ বা ঐশ্বর্যসম্ভারে। যাঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর বিহনে প্রাণ ধারণ করবেন কেমন করে? হে নিষ্ঠুর যদি ফেলে যাও এ অভাগিনীকে, পায়ে দলে যাও কোমল হৃদয় তবে জেনো মৃত্যু তার অবধারিত।

দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় সম্মুখের পর্দায় নিবদ্ধদৃষ্টি।

প্রণয়ব্যাকুলা রমণীর এই আত্মসমর্পণে কী করবে তরুণ নায়ক? প্রচুর পাউডারপ্রলিপ্ত নায়িকার গণ্ডদেশে ঠাস্ করে একটি সবল চপেটাঘাত করলে আধারকার সব চেয়ে খুশি হতেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? ছবিতে দেখা গেল, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, মাধবীলতায় ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পরস্পরের চঞ্চুতাড়না দ্বারা প্রণয় নিবেদন করছে তরুশাখে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চমিথুন এবং উদ্যানের সরোবরে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম হঠাৎ দু'দিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে মিলল একসঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার এই চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে ছায়াচিত্রের নায়কেরা চিরকাল যা করে থাকে তাই করল তরুণ। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল নায়িকাকে। দুজনে হাত ধরাধরি করে রওনা হলো। কোথায়, তা অবশ্য একমাত্র চিত্রপরিচালকই জানেন! বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের সঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রেক্ষাগার। শেষ হলো নাটিকার।

সকলের অলক্ষিতে আধারকার নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। মনে মনে বললেন, একমাত্র নাটকের মধ্যেই সম্ভব এই অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। সেখানে তো সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই। তাই তার কল্পিত নায়িকার পক্ষে কোনো অসম্ভব আচরণ বা কোনো অস্বাভাবিক উক্তি করতেই বাধা নেই। তা শুনে আমরা বিমুগ্ধ দর্শকরাও 'এক্কোর', 'এক্কোর' বলে চেঁচিয়ে উঠি। আমরা তো জানিনে শ্রেষ্ঠিকন্যার যে-প্রণয়নিবেদন দৃশ্য দেখে আমাদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তার ষোলো আনাই স্টেজ-ম্যানেজড্, ষোলো আনাই ফন। সমস্তটাই ফাঁকি। হতভাগ্য নায়ক সে তথ্য জানতে পারে দু'দিন পরে। কিন্তু সে তো দর্শকের দেখার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বর্হিদেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে সে থাকে চিরকাল লোকলোচনের অন্তরালে। নাটকের যেখানে শেষ, জীবনের সেখানেই তো শুরু!

সেই রাত্রেই লাহোর পরিত্যাগ করলেন আধারকার।

রাত বারোটায় ট্রেন। খোয়া-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে টাঙ্গা। এপথে কতবার আসা-যাওয়া করেছেন আধারকার। কিন্তু আজকের এই যাত্রা তো অন্য আর বারের মত নয়। তখন যাওয়ার মধ্যে থাকতো অদূরবর্তী পুনরাগমনের আশ্বাস, থাকতো পুনর্মিলনের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। আজ সে-আশা রইল না এতটুকুও। যে গৃহদ্বার এইমাত্র অতিক্রম করলেন, যে পথ রাখলেন পশ্চাতে, কদাচ তা পুনশ্চারণের আর সম্ভাবনা রইল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অথচ তার সংজ্ঞা হয়নি বিলুপ্ত। এ্যাম্বুল্যান্স-বাহিত সে আহত স্পষ্ট দেখতে পায়,

ফেলে রেখে যাচ্ছে সে আপন খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চোখে দেখতে পেলেন পশ্চাতে ফেলে রেখে যাচ্ছেন—বাহু নয়, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়।

ফানই বটে! স্নেহ নয়, প্রীতি নয়, শোভা-গন্ধ বিমণ্ডিত হৃদয়াবেগের বাষ্প-মাত্র নয়, শুধু কৌতুক। নিষ্ফল প্রণয়ের উপশম আছে করুণায়, কিন্তু উপহসিতের নেই সান্ত্বনা। তার লজ্জা দুঃসহ।

এই হৃদয়হীন নারীর ছলনাকেই সত্য কল্পনা করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আধারকার,—একথা ভেবে নিজের উপরেই গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল তার। কতদিন প্রমত্ত প্রগল্‌ভতায় হৃদয়ের কত দুর্বলতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাছে, কত স্বপ্ন গড়েছেন তাঁকে কেন্দ্র করে, সেসব স্মরণ করে বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন আধারকার।

গভীর বেদনা ও অপরিসীম লজ্জা নিয়ে আধারকার ফিরে চললেন স্বস্থানে। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের যে তারকা-শ্রেণী অনিমেষ নয়নে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে, তারা সাক্ষী রইল আর একটি সকরুণ কাহিনীর। যুগযুগান্ত ধরে এমন কতশত অশ্রুসজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে তাদের পলকহীন নয়নের অকম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে। কত খেলা গেছে ভেঙে, কত ফুল ঝরেছে ধূলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নীরব।

এই স্বল্পপরিসর জীবনের প্রায় সমুদয় অংশ আধারকার কাটিয়েছেন একা। এই তো সে-দিন পর্যন্ত চাকর বেয়ারা মাত্র সম্বল ফ্ল্যাটে আপনাকে নিয়ে আপনি ছিলেন মগ্ন। আজও আবার সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করলেন। অথচ এ দুয়ের মধ্যে কি অপরিসীম প্রভেদ। আকাশ আজ নিঃশেষে শূন্য, বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কর্ম বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর।

নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিরাট মরুভূমির মতো সর্বত্র ঊষর। কোনোখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক আঁধার বিজড়িত স্নিগ্ধতার চিহ্ন লেশ।

আধারকার মূর্খই বটে। কাঁচকে ভেবেছিলেন হীরা, সদ্য টাকশাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল তাম্রখণ্ডকে ভ্রম করেছিলেন গিনি বলে। গান্ধীজির একটা লেখা চোখে পড়ল, আধুনিকাদের সম্পর্কে। তারা নাকি প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবে একটি জুলিয়েট, এক সঙ্গে আধ ডজন রোমিওর প্রণয়িনী। আধারকারের মনে হয়, এতদিনে যেন অর্থ পেলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না একেবারে। আবার সংশয় জাগে চিত্তে। একাধিক রোমিওর জন্য কি দুর্যোগের রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা যায়? সম্ভব হয় তাদের অসুখের সংবাদে স্বামী সংসার ফেলে একাকী একহাজার মাইল ছুটে যাওয়া!

বম্বেতে ফিরে মাস কয়েক বিপুল উদ্যমে চেষ্টা করলেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে কর্মের মধ্যে। মিলের কাজে খাটতে লাগলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা। ভুলতে প্রয়াস করলেন বিগত তিন বৎসরের স্বল্পায়ু স্বপ্নলোক। করতে চাইলেন নতুন করে জীবনারম্ভ। কিন্তু মন তো শিশুদের আঁক কষার শ্লেট নয় যে, ইচ্ছা মতো পেন্সিলের আঁচড় মুছে নতুন করে সংখ্যাপাত করা যাবে। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হলেন আধারকার। তারপর জলের দামে একদিন হঠাৎ মিল দিলেন বিক্রি করে। অন্তর্হিত হলেন বম্বে থেকে।

গেলেন মালয়া, রবারের বাগানে হলেন ম্যানেজার। ভালো লাগল না বেশী দিন। গেলেন সিলোনে এক কফি কোম্পানীর কর্তারূপে, টিকতে পারলেন না দু'বছর। বুয়েনস্ এয়ার্সে কাজ করলেন মদের কারখানায়; সেখানেও বিরক্তি ধরল। পরিব্রাজক হয়ে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করলেন, দেশ দেশান্তর। নানকিং, ক্যানবারা, টরোন্টো, ওয়াশিংটন, লাইপৎসিগ, ব্রাসেলস্। তবু ভুলিল না চিত্ত।

নিউ ক্যাসেলের এক ইংরেজ কোম্পানী থেকে এককালে নিজের মিলের জন্য আধারকার কিনেছিলেন কিছু সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভারতীয় শাখার ম্যানেজাররূপে অবশেষে আধারকার [illegible]ন দিল্লীতে। এখানে আছেন আজ প্রায় এগারো বছর। যে মিল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন

কুড়ি বছর আগে, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজ কোটিপতি। সেখানে এক ডজন কর্মচারী আছে যারা আধারকারের চেয়ে বেশী-মাইনে পায়।

বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের আজ অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেছেন আধারকার। দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্ধক্যের আক্রমণ-আভাস। হৃদয়াবেগের যে-তীব্রতা যৌবনের লক্ষণ, আজ তা স্তিমিততেজ।

যে-সুনন্দাকে আধারকার ভালোবেসেছিলেন, সে তো শুধু ঐ রক্ত মাংসের মানুষটি নয়। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যে একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাঁকে ভালোবাসি তাঁকে আমরা নিজের মনে মনে মনোমত করে গঠন করি। যে সৌন্দর্য তাঁর নেই, সে সৌন্দর্য তাঁতে আরোপ করি। যে-গুণ তাঁর অভাব, সে গুণ তাঁর কল্পনা করি। সে তো বিধাতার সৃষ্ট কোনো ব্যক্তি নয়, সে আমাদের নিজ মানসোদ্ভূত এক নতুন সৃষ্টি। তাই কুরূপা নারীর জন্য রূপবান, বিত্তবান তরুণেরা যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক হয়ে ভাবে, "আছে কী ঐ মেয়েতে, কী দেখে ভুলল ?" যা আছে সে তো ঐ মেয়েতে নয়,—যে ভুলেছে তার বিমুগ্ধ মনের সৃজনধর্মী কল্পনায়। আছে তার প্রণয়াঞ্জনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহারে রচনা।

আধারকারের দৃষ্টি থেকে সে-অঞ্জন আজ বিলুপ্ত, মন থেকে সে-মোহাবেশ অপসৃত। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পলোক থেকে আহৃত যে-সৌন্দর্য, যে-সুষমা, যে-বর্ণসম্ভার দ্বারা সুনন্দাকে তিনি রচনা করেছিলেন তিলে তিলে, আজ তার লেশমাত্র নেই। প্রবঞ্চিত আধারকারের কাছে সুনন্দা আজ একজন অতি সামান্য রমণী মাত্র। কোনোখানে তার এতটুকু অনির্বচনীয়তা, এতটুকু বিশেষত্ব অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন ! আজও ক্ষতের মূল রয়েছে গভীরে যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে। অসাবধান মুহূর্তে ছোঁয়া লাগলে আজও কেন টনটন করে ব্যথায় ? কেন নিঃশেষ হয় না স্মৃতি ?

আধারকারের কাহিনী শেষ হলো।

বাক্যহীন নিস্তব্ধতায় বসে রইলেম খানিকক্ষণ।

"হুজুর, ট্যাক্সা ল্যানে পড়েগা ?"

চমকে চেয়ে দেখি আধারকারের ভৃত্য। কখন আধারকার উঠে চলে গেছেন, নিঃশব্দে, টের পাইনি একটুও। আপন জীবনের নিগূঢ় গোপন কাহিনী ব্যক্ত করেছেন আজ এক অতি অল্প দিনের পরিচিত অসমবয়সী বন্ধুর কাছে। যখন বলে গেছেন, তখন অবগাহন করেছেন স্মৃতির ধারায়। কাহিনী সাঙ্গ হতেই সে-মোহজাল ছিন্ন হয়েছে, নেমে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে। সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্তে, যেই হয়েছে চোখাচোখি। তাই অদৃশ্য হয়েছেন নিঃশব্দে। সুতরাং বিদায় নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলেম। ভৃত্যকে টাঙ্গা আনতে করলেম বারণ। পদব্রজে নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে মেঘশূন্য আকাশে, তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দু'পাশের বাংলোগুলির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। পথ জনশূন্য, ধ্বনিবিরল। কাছাকাছি কোথায় যেন হাসনুহানার ঝাড়ে ফুটছে ফুল। তার তীব্র মদির সুবাসে বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, রজনী হয়েছে গন্ধবিহ্বল।

চলতে চলতে ভাবছিলেম আধারকারের কথা। কানে বাজতে লাগল সকরুণ স্বীকারোক্তি, "মিনি সাহেব, আমি ইডিয়টই বটে ! পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম ; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মতো মূর্খরাই তো জীবনকে করেছে বিচিত্র ; সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত। যুগে যুগে এই নির্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালোবেসেছে, তারপর সারা জীবনভোর কেঁদেছে। হৃদয়নিংড়ানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসঘন, পৃথিবীকে করেছে কমনীয়। এদের ভুল, ত্রুটি, বুদ্ধিহীনতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন কাব্য, সাধক বেঁধেছেন গান, শিল্পী অঙ্কন করেছেন চিত্র, ভাস্কর পাষাণ-খণ্ডে উৎকীর্ণ করেছেন অপূর্ব সুষমা। জগতে বুদ্ধিমানেরা করবে চাকরি, বিবাহ, ব্যাঙ্কে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গহনা ; স্ত্রী, পুত্র

স্বামী, কন্যা নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করবে স্বচ্ছন্দ সচ্ছলতায়। তবু আমরা মেধাহীনের দল একথা কোনো দিন মানবো না যে, সংসারে যে বঞ্চনা করল, হৃদয় নিয়ে করল ব্যঙ্গ, দুধ বলে দিল পিটুলী,—তারই হলো জিত, আর ঠকল কেবল সে, যে উপহাসের পরিবর্তে দিল প্রেম।"

অতি দুর্বল সান্ত্বনা। বুদ্ধি দিয়ে, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে বলা সহজ—"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।" কিন্তু জীবন তো মানুষের সম্পর্ক বিবর্জিত একটা নিছক তর্ক মাত্র নয়। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে ছন্দ রচনা করা যায়, জীবন ধারণ করা যায় না।

আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যাঁরা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। এঁদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাড্‌জাস্টমেন্ট আর কম্প্রমাইজ। এ দারুণ ইনফ্লেশনের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশী নয়।

সুনন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না আধারকারের গতিতে তাল রেখে চলা। সে নারী। প্রেম তার পক্ষে একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। আবিষ্কার নয়, যেমন পুরুষের কাছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ সাবধানী, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতঃই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙে। প্রেম মেয়েদের কাছে একটা প্রয়োজন, সেটা আটপৌরে শাড়ির মতো নিতান্তই সাধারণ; তাতে না আছে উল্লাস, না আছে বিস্ময়, না আছে উচ্ছলতা। ছেলেদের পক্ষে প্রেম জীবনের দুর্লভ বিলাস, গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ীর মতো ঐশ্বর্যময়, যে পায় সে অনেক দাম দিয়েই পায়। তাই প্রেমে পড়ে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরূহ ত্যাগ এবং দুঃসাধ্যসাধন।

আধারকার নিজেই একদিন বলেছিলেন, "মিনি সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডেরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জন, প্রিন্সেস এলিজাবেথেরা করেনি কোনো জন, স্মিথ বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্যতম ত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্বদেশে সর্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ; পরের স্বামীর প্রেমে পড়ে কোনোদিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।"

কোমলহৃদয় বলে আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু আধারকারের জন্য সত্যিকার বেদনা বোধ করলেম হৃদয়ে। সুনন্দা ব্যানার্জী আজ কোথায় আছেন জানি নে। অনুমান করছি, এতদিনে তাঁর যৌবন হয়েছে গত, দেহ বিগতশ্রী, দৃষ্টি বিদ্যুৎহীন এবং কপোলের রেখাগুলি প্রচুর প্রসাধনপ্রলেপের দ্বারাও আজ আর কোনো মতেই গোপনসাধ্য নয়। কোনো দিন কোনো অবকাশ মুহূর্তে বহু বর্ষ আগেকার এক মারাঠি ব্রাহ্মণের চরম নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মন উন্মনা হয় কিনা, সে কথা আজ জানার উপায় নেই। অথচ তাঁরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য। নিজেকে বঞ্চিত করলেন সাফল্য থেকে, খ্যাতি থেকে, ঐহিকের সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে! সব চেয়ে বড় কথা, নিজেকে বঞ্চিত করলেন সম্ভবপর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।

কোনো দিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কুশল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালবে না দীপ, কোনো নারী সীমন্তে ধরবে না তাঁর কল্যাণ-কামনায় সিন্দুরচিহ্ন, প্রবাসে অদর্শনবেদনায় কোনো চিত্ত হবে না উদাস উতল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারও উদ্বেগকাতর হস্তের সুখস্পর্শ, কোনো কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উদ্বেল অশ্রুবিন্দু। সংসার থেকে যেদিন হবেন অপসৃত, কোনো পীড়িত হৃদয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কোনো মনে রইবে না ক্ষীণতম স্মৃতি।

প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ। যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দাহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার।

জনান্তিক

আজ রাকতা য়ে কলম হেচ্ দিগার পুঙনা-সাবাদ।
এক জররা আজ উচ্চে হাসৎ আকিজুন না সাবাদ।
হার হিলা কে দর্ ত সাউয়ার আকনে আইয়েজ
কর দেম ও লেক বা কাজা দর্ না গিরিস্ত।

—ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ ॥

The little finger wtites, and having writ
Moves on ; not all thy peity nor wit
Shall lure it back to cancel half a line
Nor all thy tears wash out a word of it.

—ফিট্‌জিরাল্‌ড-কৃত ইংরেজী অনুবাদ

ঝিলম নদীর তীর

হিমালয়ের বরফ গলে গলে হয়েছে নদী। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইনের বন পেরিয়ে, আঁকাবাঁকা পথে সে নদী নেমে এসেছে নীচু মাটিতে। মৌরী ক্ষেতের ধার দিয়ে, উইলো ঝাড়ের কাছ দিয়ে চলে গিয়েছে শহরের বুক চিরে। কাঠের ঘর-বাড়িতে ঢাকা দু'পাশের তীর ; মধ্যিখানে ধীরে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। অন্ধকারে দূর থেকে দেখায় যেন কনে বউ-এর মাথায় দু'পাশের কালো চুলের মাঝখানে একটানা সরু সিঁথিটি।

ছোট্ট নামটি তার ; সহজ ও মিষ্টি। ঝিলম। সকালবেলা সোনালী রোদের আভা ঠিকরে পড়ে তার বুকে। সন্ধ্যাবেলা দোলে তারা-ভরা আকাশের ছায়া। ঝিলম ঝিলমিল করে দিন-রাত। নদীর কোল ঘেঁষেই উঠেছে দুধের মতো ধবধবে শ্বেত পাথরে গড়া মস্ত রাজপুরী। দুয়ারে তার সেপাই। সিঁড়িতে তার সান্ত্রী। দেউড়িতে সঙ্গীন উচিয়ে কুচকাওয়াজ করে উর্দিপরা পাহারাওয়ালার দল।

পুরানো আমলে এটাই ছিল রাজাদের খাশমহল। বুড়ো মহারাজা জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন এখানেই। নতুন রাজার চাল-চলন আলাদা। স্ত্রী পুত্র দাস দাসী নিয়ে তিনি উঠে গিয়েছেন দূরে পাহাড়ের গায়ে বিলাতী ধরনে তৈরি নূতন বাড়িতে। সেখানে সেজের বদলে জ্বলে বিজলী বাতি, হাতিশালের বদলে আছে মোটর গ্যারেজ।

সেকেলে রাজবাড়ি একালে হয়েছে সরকারী আপিস। তকমা-আঁটা কর্মচারীরা সেখানে বসে মহারাজার নামে প্রজা শাসন অর্থাৎ প্রজা শোষণ করে। শুধু বছরে দু'দিন রাজ-দরবার বসে মাঝের গোল হল্ ঘরটিতে। তখন চতুর্দোলায় চেপে রাজা আসেন। পুরানো রাজমহলের সাবেকি জাঁক-জমক আবার জেগে ওঠে। আগে সাজে লোক, পিছে সাজে লস্কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

দশহরার দরবার দেশের সবচেয়ে বড় পার্বণ, বছরের সবচেয়ে সেরা সমারোহ।

মুক্তার ঝালর আঁটা জড়োয়া চাঁদোয়ার নীচে কিংখাবে মোড়া গজদন্তের সিংহাসন। তাতে বসেছেন রাজা। মহারাজ শ্রীহরি সিং। কাশ্মীরের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সামনে পায়ের কাছে খোলা তলোয়ার হাতে প্রতিহারী। পিছনে মাথার কাছে ছাতাহাতে ছত্রধর। দু'পাশে চামর দুলিয়ে হাওয়া দিচ্ছে আটজন কিঙ্কর কিঙ্করী। রুপোর পিলসুজের মাথায় জ্বলছে সোনার প্রদীপ ; জয়পুরী পাথরের ধূপদানিতে পুড়ছে কস্তুরী ধূপ। জমকালো পোশাকে পাত্র-মিত্র ও অমাত্যরা বসেছেন প্রথম সারিতে। তার পিছনে গণ্যমান্য লোকদের আসন পড়েছে যার যার মর্যাদা বুঝে। ফুলের শোভায়, জরির সাজে, নানা রঙের আলোর মেলায় ঝলমল করছে সভা-ঘর।

কিন্তু এত ধূমধামের মধ্যেও মহারাজাকে কেমন মনমরা দেখাচ্ছে যেন। তাঁর মুখে কেন নেই হাসি ? চোখে কেন নেই খুশি-খুশি ভাব ?

সত্যি, মহারাজা হরি সিং-এর মনে একটুও সুখ নেই।

মাস দুই হলো এদেশ থেকে ইংরেজ সরকার চলে গিয়েছে। যাবার বেলায় দেশকে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে গিয়েছে একদল মুসলমানের হাতে। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মহা আড়ি। এক সঙ্গে এক রাজত্বে বাস করতেও তারা রাজী নয়। ভারতবর্ষ থেকে কেটে নেওয়া এই মুসলমানী দেশের নাম হয়েছে, পাকিস্তান।

ইংরেজ আমলের আরও যে-সব দেশীয় রাজা ছিলেন, ইংরেজ যেতে না যেতেই তাঁরা প্রায় সবাই নিজ নিজ রাজ্যের সীমানার মিল দেখে ভাগ হওয়া দেশের এ-দিকে কিংবা ও-দিকে যোগ দিয়েছে। জয়পুর, গোয়ালিয়র, কুচবিহার ইত্যাদি মিশেছে ভারতবর্ষে। ভাওয়ালপুর ও কালাত মিশেছে পাকিস্তানে। কাশ্মীর এখনও আছে দো'টানায়।

কাশ্মীরের সীমানার যোগ রয়েছে দু'দেশেরই সঙ্গে। পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ মাইল ধরে আছে পাকিস্তান। আবার পূর্ব-দক্ষিণে তার সীমানা মিলেছে ভারতবর্ষে। কাশ্মীর কোন্ দেশে যোগ দেবে ? মহারাজা মন ঠিক করতে পারেন না। অনেক ভেবে শেষটায় তিনি বললেন, " এখন

কোনো দেশেই যোগ দিচ্ছি না। যেমন আছি তেমনি থাকি। পরের ভাবনা পরে হবে।"

মহারাজা যাই ভাবুন, দেখা গেল, পরের আশায় বসে থাকতে অপরেরা রাজী নয়। ভারতবর্ষের নেতারা কিছু বললেন না বটে। ও-দিকে পাকিস্তানের কর্তাদের তো সবুর সয় না। তাঁরা চান কাশ্মীর তক্ষুণি তাদের দখলে আসুক। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু। ভোগরা রাজপুত। রদজার প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। পাকিস্তানের বড় নেতারা মাথা নেড়ে বললেন, "এ অসহ্য।" বাবু যত কন, পারিষদগণ কহে তার শত গুণ। ক্ষুদে নেতারা ঘুষি বাগিয়ে হুঙ্কার দিলেন, "লড়কে লেঙ্গে—"

যেই কথা সেই কাজ। প্রথমে শুরু হলো অভাব অনটনের চাপ দেওয়া। হাতে না মেরে ভাতে মারার ফন্দি।

কাশ্মীর পাহাড়ী রাজ্য। চাষবাসের দেশ। ক্ষেতে ধান আর বাগানে ফল,—এই হলো সেখানকার মোটামুটি ফসল। অন্য সব জিনিস তাকে আনতে হয় বাইরে থেকে। লাহোর বা রাওলপিণ্ডির পথে চালান আসত এতকাল। পাকিস্তান বন্ধ করে দিলে তা। তখন পেট্রোলের অভাবে কাশ্মীরের পথে মোটর বাস অচল হলো, কাগজের অভাবে স্কুল কলেজে লেখাপড়া বন্ধ, চিনির অভাবে ময়রার দোকানে সন্দেশের থালা পড়ে রইল খালি। রাজ্যে রোগী পায় না ওষুধ, শিশু পায় না পথ্য। নেহাত গরীব যে দিনমজুর, একটু নুন না মেলাতে তারও মুখে ভাত রোচে না।

এ তো শুধু আরম্ভ। যেমন ফাঁসীর আগে হাজত, মারের আগে ধমকানি। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে শুরু হলো জবরদস্তি হামলা। রোজই সীমানার ও-পার থেকে পাকিস্তানীরা দল বেঁধে কাশ্মীরের গ্রামে ঢুকে লুঠতরাজ করতে লাগল।

গত চার দিনে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। খবর এসেছে, যুদ্ধের সৈন্যদের মতো হাজার হাজার হানাদার কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেছে। ভিন্ন ভিন্ন শত্রু বাহিনীর নানা জায়গায় সীমানা পার হয়ে গ্রামের পর গ্রাম দখল করেছে। সব চেয়ে বড় দলটা এগিয়ে আসছে মোটর লরী চেপে ডোমেলের পথে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। সে-দলে আছে হাজারখানেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি, কয়েক শ' পাঠান আফ্রিদি, আর অগুনতি মুসলীম লীগের ভলান্টিয়ার,—নিজেদের তারা বলে, "মুসলীম ন্যাশন্যাল গার্ড।"

দেশীয় রাজ্যগুলি এতকাল আপদে বিপদে নির্ভর করেছে ব্রিটিশ সরকারের উপর। তাদের নিজেদের সৈন্য যা ছিল, সে শুধু নামকাওয়াস্তে। কাশ্মীরের সৈন্য-সংখ্যা সামান্য। তারও আবার অর্ধেক ছিল মুসলমান। শত্রুরা হানা দিতেই তারা দল ছেড়ে সরে পড়লো। বাধা দেওয়া দূরে থাক, "আল্লাহো আকবর" বলে তারা হানাদারদেরই দলে ভিড়ে গেল। কথায় বলে, যার খায় পরে তারই দাড়ি উপাড়ে। এই নিমকহারামেরাও হানাদারদের রাস্তা দেখিয়ে আনতে লাগল রাজধানীর দিকে। মহারাজা উতলা হবেন না তো হবে কে?

দশহরার দিনে রাজা দরবারে না বসলেই নয়। একশ বছর ধরে চলে আসছে এ নিয়ম; মহারাজা গোলাব সিং-এর আমল থেকে। পিতা-পিতামহদের সে নিয়ম তো ভাঙা চলে না। তাই এবারেও সভা ডাকতে হয়েছে।

দরবারে কুল-পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। ভাট গান বেঁধে রাজার মহিমা শোনাল। মনের উদ্বেগ চেপে রেখে রাজা কাউকে দিলেন সনদ; কাউকে দিলেন শিরোপা। সভাসদেরা একের পর একে রাজার পায়ের কাছে রাখল প্রণামী। কেউ পাঁচ মোহর, কেউ বা দুই,—যার যেমন হার বাঁধা আছে বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে। জমিদার জায়গিরদারেরা কেউ দিল আসমানী রঙের কস্তা পাড় পশমী জমিয়ার, কেউ দিল ঝুড়ি-ভর্তি সুগন্ধ মৃগনাভী, কেউ বা দিল গিলগিটের নামকরা নীল গাই-এর শিং।

হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্তভাবে শহর কোটাল এসে ঢুকল দরবারে। চুপি চুপি কী যেন বলল নগরপালকে। নগরপাল আঁতকে উঠে ফিসফিস করলেন তার উপরওয়ালার কানে। উপরওয়ালা অমনি কানে কানে বললেন তাঁরও উপরওয়ালকে। তিনি গোপনে জানালেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ভয়ে

ভয়ে শোনালেন দেওয়ানকে। দেওয়ান মুখ কালো করে উঠে গিয়ে রাজাকে দিলেন দুঃসংবাদ। শুনে মহারাজ হরি সিং-এর মুখে কথা সরলো না খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে। এবার আর চতুর্দোলা নয়; ঁপা-ঁপা শব্দে মোটর হাঁকিয়ে দিলেন নতুন রাজবাড়ির দিকে।

সভাসদেরা সবাই অবাক। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ব্যাপার কী? একটু পরেই জানতে পারা গেল, ব্যাপার গুরুতর। মন্দ খবর বাতাসের আগে ছোটে। শোনা গেল, ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিংজী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কী সর্বনাশ!

রাজেন্দ্র সিং ছিলেন মহারাজার প্রধান সেনাপতি। যেমন বীর, তেমনি সাহসী। তাঁর উপরেই মহারাজার যা কিছু ভরসা। কাশ্মীরের হিন্দুসৈন্য তখনও শ'দেড়েক বাকি ছিল। তাদের নিয়ে রাজেন্দ্র সিং এগিয়ে গিয়েছিলেন দুশমনদের রুখতে।

হানাদারেরা তখন শ্রীনগর থেকে ষাঁয়ষট্টি মাইল দূরে উরি অবধি এসেছে। সেখানে ঐ অল্প ক'টি মাত্র সৈন্য নিয়ে রাজেন্দ্র সিং পাকিস্তানীদের বাধা দিলেন। প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়তে লাগলেন তিনি; লড়তে লাগল তাঁর সৈন্যরা। হানাদারেরা সংখ্যায় প্রায় দশ গুণেরও বেশী। অসাধারণ বীরত্বে রাজেন্দ্র সিং তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন উরিতে পুরা দুটি দিন। তারপর নিজ সৈন্যদের সঙ্গে নিজেও মারা পড়লেন যুদ্ধে। দেড়শ জন দেড় হাজারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে কতক্ষণ?

রাজদরবার থেকে মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, পথে লোক চলে না, ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ সবাই ভয়ে জড়সড়। কী জানি কী হবে আজ রাতটুকু পোহালে।

কিন্তু ততক্ষণও সময় পেলো না তারা। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। হঠাৎ শহরের সমস্ত আলো নিবে গেল। বিজলী আলোর কারখানাটা মহুরায়। পাহাড়ী ঝরনার জল ধরে জলবিদ্যুৎ তৈরি হয় সেখানে। থামের মাথায় তারের মধ্য দিয়ে সে-বিদ্যুৎ আসে দূর দূরান্তের শহরে। হানাদারেরা মহুরায় পৌঁছে কারখানার যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

মহুরা? সে-তো রাজধানী থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। চমকে উঠলো সবাই। তবে শ্রীনগরের আর বাকি রইল কত? পিচ-বাঁধানো চওড়া সড়ক গিয়েছে মহুরার গা দিয়ে। সে-পথে মোটর লরী বোঝাই হানাদারদের শ্রীনগরে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? তবে আর কিসের ভরসা? সেই রাত্রিতেই শহর থেকে প্রাণের ভয়ে লোক পালাতে শুরু করল। মোটরে, লরীতে টাঙায়, গরুর গাড়িতে, সাইকেল-এ বা ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটল নানা দিকে। যাদের কিছুই জুটল না, তারাও স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পায়ে হেঁটে রওনা হলো নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

রাজবাড়িতে হরি সিং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেওয়ান, এখন উপায়?"

দেওয়ান হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, উপায় একমাত্র ভারত সরকার। তাঁদের সাহায্য চান।"

এক বছর আগে পণ্ডিত নেহরুকে রাজ্যে ঢুকতে দেননি, কয়েদ করেছিলেন; সে কথা রাজার মনে ছিল। সেই নেহরু এখন ভারত সরকারের কর্তা। রাজা চিন্তিত মুখে বললেন, "তাঁরা কি সাড়া দেবেন?"

দেওয়ান উত্তর করলেন, "হুজুর, আর্তকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম; তা যদি না করেন তবে তাঁরা কেমন মহৎ? অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া ন্যায়ের বিধান; তা যদি না মানেন, তবে তাঁরা কিসের শাসক? আপনি আবেদন করুন, আর দেরিতে সর্বনাশ হবে।"

তখন সেই অন্ধকার রাজপুরীর খাসকামরায় লণ্ঠনের আলোতে বসে কাশ্মীরের শেষ মহারাজা হরি সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন। করুণ প্রার্থনা জানালেন ভারতের নতুন সরকারের কাছে। লিখলেন,—"একটি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে কাশ্মীরকে রক্ষা করুন। দোহাই, তার চল্লিশ লক্ষ লোককে বাঁচান।"

সে-দিন তারিখটা ছিল ২৫শে অক্টোবর, ইংরেজী ১৯৪৭ সাল।

দুই

নয়াদিল্লীতে মহারাজার তার পেয়ে প্রধান মন্ত্রী নেহরু ভাবেন, কী করা যায়?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহকারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বললেন, তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাতে হবে কাশ্মীরে ; হানাদারদের ঠেকাতে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন বড়লাট। তাঁর খুবই আপত্তি। তবে তিনি এখন নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল, নিজের মত খাটাতে পারেন না, শুধু উপদেশ দিতে পারেন। বললেন, "পাকিস্তানও যদি সরাসরি সৈন্য পাঠায় হানাদারদের পক্ষে, তবে?"

ডাকা হলো সেনাপতি ও সৈন্যদের কর্তাদের। তাঁরা সবাই ইংরেজ। এসে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো বিপদের কথা।

মন্ত্রিসভা জোর দিয়ে বললেন, বিপদের ভয়ে মহারাজকে সাহায্য না দেওয়া কাপুরুষতা। পাকিস্তানীরা জোর করে দখল করবে কাশ্মীর, এ কখনই হতে দেওয়া যায় না।

সে-কথা ঠিক। কিন্তু কাশ্মীর তো ভারতবর্ষে তখনও যোগ দেয়নি। আইন মানতে গেলে কাশ্মীরকে রক্ষা করা তো ভারত সরকারের দায় নয়।

মহারাজা হরি সিং সে-কথা জানতে পেরে পর দিনই দলিল সই করে পুরোপুরি ভারতবর্ষে যোগ দিলেন।

তখন ভারত সরকার তাঁদের সেনাপতিকে হুকুম দিলেন কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে।

দিল্লী থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা। অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদী-নালা পার হয়ে, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে-পথ। প্রায় তিনশ' মাইল। তারও এখানে ভাঙা, ওখানে মেরামতি। কোথাও এত খাড়া উঁচু যে, গাড়ি চলা দায়, কোথাও বা এত ভীষণ সরু যে, পাশাপাশি হাঁটা কঠিন। সে-পথ ধরে গেলে নুন আনতেই পান্তা ফুরোবে। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে পৌঁছবার আগেই হানাদারেরা তা পুরোপুরি দখল করে নেবে। তাই আকাশ পথে বিমানে সৈন্য পাঠানো ছাড়া অন্য গতি নেই।

দিল্লীর ছাউনিতে তখন যথেষ্ট সৈন্য নেই। বারো মাইল দূরে গুরগাঁয়ে শিখ রেজিমেন্টের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ছিল। হুকুম পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদের কিছু এসে পৌঁছল পালমের বিমানঘাঁটিতে। তাড়াতাড়ি কোনো মতে সেখানে গোলা বারুদ পোশাক পরিচ্ছদ দেওয়া হলো তাদের ; সাতাশে অক্টোবর ভোরবেলা প্রভাতী তারাটি যখন সবে অস্ত গিয়েছে, দূরে খোলা মাঠের শেষে পুবের আকাশে দেখা দিয়েছে একটুখানি আবছা আলোর আভা, তখন বিমানবহরের তিন তিনখানা ডাকোটা বিমানের পাখা এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল। শিখ সৈন্যদের নিয়ে নিমেষে আকাশ-পথে রওনা হলো শ্রীনগরের দিকে। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা।

সৈন্য তো রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তারা শ্রীনগরে নামতে পারবে তো? সেখানকার বিমানঘাঁটিটি এরই মধ্যে হানাদারেরা দখল করে বসেনি তো? দিল্লীর সদর দপ্তরে সবার মনেই সেই ভাবনা। বেতার টেলিফোনের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে লোক। হেডফোন কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছে খবর দেয়া-নেয়ার কর্মচারীরা। আধঘণ্টা পর পর বড়কর্তারা খোঁজ নিচ্ছেন, খবর এসেছে কি? না, আসেনি।

ন'টা বেজে গেল। তখনও খবর এল না। সাড়ে ন'টা বাজলো। বাজলো দশটা। কোনো খবর নেই। দশটা পনের,—কুড়ি,—পঁচিশ ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে। মিনিট তো নয়, মনে হয় যেন এক একটা যুগ। কারো মুখে কথা নেই, ঘরে নেই শব্দটি। একটা পিন পড়লেও বুঝি আওয়াজ শোনা যাবে। উদ্বেগে সবার যেন দম আটকে আসছে। এত দেরি হচ্ছে কেন? তবে—কি—? সাড়ে দশটা, দশটা একত্রিশ,—হঠাৎ বেতার যন্ত্রের বোর্ডে আলো জ্বলে উঠলো।

"হ্যালো, হ্যালো দিল্লী, হ্যালো,—দিস ইজ শ্রীনগর কলিং, হ্যালো—।" খবর এসেছে। ডাকোটা তিনটি নিরাপদে বিমানঘাঁটিতে নেমেছে। প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী পৌঁচেছে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দপ্তরের উপরওয়ালারা বললেন, "থ্যাঙ্ক গড।"

তিন

যে শিখ সৈন্যরা আকাশ-পথে শ্রীনগরে পৌঁছল তাদের নেতা ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায়। নামের শেষটা বাঙালীর মতো। তাই না ? আসলে তিনি পাঞ্জাবী। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, ত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটি লোহার বাঁটের মতো শক্ত এবং চওড়া। দেখে মনে হয়,—হ্যাঁ, লড়াই করার যোগ্য একখানা চেহারা বটে !

কথা ছিল, তিনি তাঁর ঐ অল্প ক'জন সৈন্য নিয়ে বিমানঘাঁটিটা শুধু আগলে থাকবেন। যথেষ্ট সৈন্য আর গোলা বারুদ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ নয়।

বিমানঘাঁটিতে কাশ্মীরের অবস্থা শুনে এবং দেখে কর্নেল রায়-এর তো চক্ষুস্থির। শত্রু রাজধানী শ্রীনগরের কাছে বারমূলা শহর দখল করেছে। আর খানিকটা এগিয়ে এলেই পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে গ্রামে, মাঠে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক থেকে শ্রীনগরকে ঘিরে ফেলতে পারবে !

তাই তো। এখন করা কি ? হানাদারেরা সংখ্যায় কত, কোন্ পথে আসছে, কী তাদের সাজ-সরঞ্জাম, সমস্তই অজানা। না জেনে-শুনে শ' খানেক সৈন্য নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে যাওয়ার বিপদ অনেকখানি। অথচ আরও সৈন্য আর অস্ত্র-শস্ত্র এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় থাকলে শ্রীনগরের আশা শেষ। কঠিন সমস্যায় পড়লেন কর্নেল রায়।

বসে ধীরে-সুস্থে ভাববারই বা সময় কোথায় ? এক মিনিট দেরি মানে হয় তো শত্রুকে এক গজ এগোতে দেওয়া। চটপট ঠিক করে ফেললেন কর্নেল রায়। দিল্লীর হুকুম যাই থাক, এই মুহূর্তে হানাদারদের ঠেকাতে না গেলে সবই হবে খতম। তিনি সৈন্যদের নিয়ে তৈরি হলেন।

আর এক সমস্যা দেখা দিল। সৈন্যরা যাবে কী করে ? সঙ্গে না আছে মিলিটারী লরী, না আছে জীপ, না আছে অন্য কোনো রকমের গাড়ি বা ঘোড়া। শ্রীনগরের রাস্তায় যে মোটর বাসগুলি যাত্রী বা মাল বইতো, খুঁজে পেতে তারই কয়েকটা যোগাড় হলো কোনো মতে। তাই নিয়ে কর্নেল রায় আর তাঁর সৈন্যরা রওনা হলেন।

বারমূলার মাইল দুই পুবে আছে একটা ছোট পাহাড়। তার একপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে শ্রীনগরের পাকা সড়ক। দু' শ' গজ দূরে বইছে ঝিলম নদী। সেই পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি করলেন কর্নেল রায়। হানাদারেরা ঐ সড়কে এগিয়ে আসতেই হুকুম দিলেন—"ফায়ার।"

শিখদের বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জে উঠলো—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম !!

উরি থেকে এই অবধি হানাদারেরা বিনা বাধায় এগিয়ে আসছিল। আচমকা গুলী খেয়ে প্রথমে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। যারা সামনে ছিল তারা ঝড়ে উপড়েফেলা কলাগাছের মতো ধপাস করে পড়ে পড়ে মরতে লাগল রাস্তার দু'পাশে। পিছনের লোকগুলি দিশেহারা হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল।

শেষে কিছুটা সামলে নিয়ে হানাদারেরাও পাল্টা আক্রমণ করল।

একটু পরেই কর্নেল রায় বুঝলেন, যা' শোনা গিয়েছে তা' সত্যি নয়। দিল্লীতে অনেকে ভেবেছে, হানাদার মানে হলো একদল গুণ্ডা। দা, কাটারি, বর্শা, বল্লম, বোমা, পটকা ও গাদা বন্দুক নিয়ে লুঠতরাজ করতে এসেছে বুঝি। মোটেই তা' নয়। এরা আজকালকার লড়াই-এর ফিকিরফন্দি সব জানে। ইউনিট, সাব-ইউনিট অর্থাৎ আলাদা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ চালাবার কায়দা কৌশল শিখেছে এরা। ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল—এমনি সব শিক্ষিত কমান্ডার হচ্ছে দলের সর্দার। ব্রেনগান, স্টেনগান, হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ট্যাঙ্কমারা রাইফেল—আরও সব বিলাতী হাতিয়ার আছে তাদের হাতে। লাল পাগড়ি বা সঙ্গীন উঁচনো দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে, এ-সব দৈত্য নয় তেমন।

শিখ সৈন্যরা সংখ্যায় হানাদারদের কাছে নগণ্য। তবে পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করার মস্ত একটা সুবিধা অছে। আড়ালে লুকিয়ে গুলী ছোঁড়া যায়। সেই সুযোগ নিয়ে তারা বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে লাগল।

অবিরাম যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা। সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কর্নেল রায় লক্ষ্য করলেন পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে হানাদারদের একটা দল গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ! শত্রু দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেললে শিখ সৈন্য যে একটিও জ্যান্ত রইবে না। তিনি বুঝলেন, তক্ষুণি সৈন্যদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে না পারলে রক্ষা নেই। হুকুম দিলেন তাদের পিছু হটতে।

বড় হাবিলদার পায়ে পায়ে ঠোক্কর দিয়ে ডান হাতে স্যালুট করে জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর, আপ্? আপনি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, গুলী চালিয়ে দুশমনদের কেউ আটকে না রাখলে তারা পিছু নেবে। তাই সব শেষে যাবেন তিনি। নিজের সৈন্যদলের শেষ লোকটিও নিরাপদে পার না হওয়া পর্যন্ত অধিনায়ককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নড়তে নেই। এই হলো তাঁর মত। তিনি নিজে হাতে মেশিনগানের ঘোড়া টিপতে লাগলেন খট্ খট্ খট্ খট্ খট্...।

শিখ সৈন্যরা ধীরে ধীরে পিছনে সরতে লাগল। হানাদারেরা অবশ্য চুপ করে বসে নেই। তাদের বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে পড়তে লাগল কর্নেল রায় আর তাঁর সেনাদলের চার পাশে। কিছু শিখ পড়ল মারা, কয়েকজন হলো জখম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাকি সৈন্য হানাদারদের এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছল।

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল রায়। সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে একটা গুলী এসে লাগল তাঁর কপালে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বীর রণজিৎ রায় বীরের মতোই যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

বছর তের আগে দেরাদুনের মিলিটারী কলেজ থেকে পাশ করে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হয়ে রণজিৎ রায় ঢুকেছিলেন সেনাদলে। গত মহাযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে জাপানীদের সঙ্গে লড়ে খুব নাম করেছিলেন। তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়েছেন। উন্নতির ধাপে ধাপে হয়েছেন লেফটেনেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, মেজর থেকে লেফটেনান্ট কর্নেল। আরও ওপরে উঠবার আগেই মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে জীবন শেষ হলো তাঁর। সব পাপড়িগুলি মেলার আগেই যেন শুকিয়ে গেল ফুলটি। পাক ধরার আগেই যেন বোঁটা থেকে খসে পড়ল গাছের কচি ফল।

সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার আলো-ছায়া ঘেরা এই মর্তভূমি থেকে অকালে বিদায় নিলেন কর্নেল রায়। কিন্তু বাঁচিয়ে গেলেন শ্রীনগরকে। রক্ষা করলেন কাশ্মীর রাজ্যকে। নিরাপদ করলেন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে। শিখ সৈন্যদের আক্রমণে হানাদারেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সে-দিন আর এগিয়ে আসার সাধ্য ছিল না তাদের।

মরেও অমর হয়ে রইলেন কর্নেল রায় আর তাঁর সঙ্গীরা। বারমূলার পথে আজ যারা যাতায়াত করে তাদের চোখে পড়ে রাস্তার ধারে ছোট পাহাড়টির গায়ের কাছে একটি স্মৃতিফলক। একটি কাঠের বোর্ডে। তাতে ইংরেজীতে লেখা—

"ভারতের সেই সব বীর শিখ সৈন্যদেব কথা চিরকাল মনে থাকবে, যারা কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রথম এইখানে হানাদারদের রুখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।"

কাশ্মীরে আরও আছে একটি ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরের মনুমেন্ট। তার চারদিক কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ইংরেজীতে কী লেখা আছে তা' না পড়লেও চলে। কারণ লেখাপড়া শেখেনি এমন যে অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী সে-ও জানে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি কার জন্যে। মাথা নীচু করে হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, "কর্নীল রায় বাবর থে। ওয়ে ওহি থে জিন্‌হোনে হামকো বচায়া।"

চার

করাচী প্রাসাদ কূটে, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।

আসলে কিন্তু করাচী নয়,—য়্যাবটাবাদ এবং তন্দ্রা নয়,—স্বপ্ন। পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জনের জিন্নার বহুকালের স্বপ্ন। স্বপ্নরাজ্য কাশ্মীর। এতদিনে আসছে বুঝি তাঁর অধীনে। বুঝি আর কেন ?—একেবারে নিশ্চিত। হাতের মুঠিতে বললেই হয়। হাজার হাজার হানাদারদের দেওয়া হয়েছে হরেকরকম হাতিয়ার। দেওয়া হয়েছে অসংখ্য মোটর লরী, ট্রাক ও গ্যালন গ্যালন পেট্রোল। তারা এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে পাটানে। সেখান থেকে এগিয়ে যাবে শ্রীনগর। যেন রিষড়া থেকে কোন্নগর, বেহালা থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার।

নয়া বাদশাহ তাই চলে এসেছেন করাচী থেকে য়্যাবটাবাদ। এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছেন মাঝ পথে। সামনেই ইসলামের সব চেয়ে বড় পরব। রমজানের রোজার শেষে ঈদ। সেই পুণ্য দিনে হজরত মহম্মদের নাম স্মরণ করে বিজয়গর্বে শ্রীনগরে প্রবেশ করবেন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলী জিন্না। হজরতবাল মসজিদের জমায়েতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে পড়বেন নামাজ।

কিন্তু হঠাৎ এ কী খবর ! হানাদারদের পথে পড়েছে কাঁটা ? শ্রীনগরের কাছে তাদের বাধা দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল ? এ যে ঘাটের কাছে নৌকাডুবি, ল্যান্ডিং-এর মুখে এয়ার-ক্র্যাশ ! বিশ্বাস হতে চায় না যেন।

দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কোনোখান থেকে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই মহারাজের সিপাই বরকন্দাজ হবে নিকাশ, লোক লস্কর হবে নিশ্চিহ্ন, অনায়াসে পাকিস্তানী নিশান উড়বে শ্রীনগরের সরকারি দপ্তরখানার চূড়াতে—এই ছিল পাকিস্তানের ধারণা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশপথে ভারতীয় ফৌজ এসে নামবে কাশ্মীরে, রুখবে হানাদারদের—এমন সম্ভাবনা ছিল পাকিস্তানী কর্তাদের গোণাগুণতির বাইরে।

এত বড় আশাভঙ্গ জিন্নার জীবনে এর আগে আর ঘটেনি। তাঁর ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা রইল না। পাঞ্জাব-গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন—"প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্র্যাসীকে টেলিফোন করো এই মুহূর্তে। আমার হুকুম। এই দণ্ডে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করুক কাশ্মীরে।"

শুনে সেনাপতির চক্ষুস্থির। এ কী অদ্ভুত আদেশ ! ব্রিটিশ আমলের ইংরেজ কর্মচারীরা প্রায় সবাই ভারতবর্ষের শত্রু। ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়েছে ভারতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস যাতে ধ্বংস হয় তাতেই তাঁদের আনন্দ। কিন্তু আর যাই হোক, তাঁদেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে। তাঁরা জানেন, পিছনে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও বুদ্ধি-ব্যবস্থা দিয়ে হানাদারদের সাহায্য করা এক, প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামা আর। বেগতিক দেখে গ্র্যাসী সবিনয়ে বললেন,—

"ইওর এক্সেলেন্সী, আমি তো অকিনলেকের অধীন। তাঁর মারফতে আদেশ না পেলে করি কী ?"

কথাটা ঠিক। দেশ বিভাগের সময় দু'পক্ষের সম্মতি নিয়ে দু' দেশেরই সামরিক সর্বাধিনায়ক হয়েছেন অকিনলেক। ভারত ও পাকিস্তানের দুই পৃথক কমান্ডার-ইন-চীফ লেফটেনেন্ট জেনারেল সার রব লকহার্ট ও ডগলাস গ্র্যাসী। তাঁদের উপরে এক যুক্ত সুপ্রীম কমান্ডার,—ফিল্ড-মার্শাল সার ক্লড অকিনলেক।

খবর পেয়ে অকিনলেক তাড়াতাড়ি বিমানযোগে গেলেন লাহোরে। জিন্নাকে বললেন, কাশ্মীরে পাকিস্তানের সৈন্য পাঠানো মানেই, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ। তাতে সর্বনাশ।

জিন্নার যুক্তি,—হিন্দুস্থানের ফৌজ এসেছে কাশ্মীরে হিন্দু মহারাজার পক্ষে। কাজেই পাকিস্তানের সৈন্য যাবে সেখানকার মুসলমানদের সাহায্যে।

অকিনলেক বললেন, "কাশ্মীর দলিল সহি করে যোগ দিয়েছে ভারতবর্ষে। সুতরাং কাশ্মীর এখন ভারতবর্ষেরই অংশ, তাকে রক্ষা করা ভারত সরকারেরই দায়িত্ব। সেখানে ভারতীয় সৈন্য লড়তে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত।"

"দলিল ? সে তো মিথ্যে বাহানা। স্রেফ জোচ্চুরি। কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেওয়া একটা সাজানো কারসাজি।" গর্জে উঠলেন জিন্না সাহেব।

অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে শেষকালে অকিনলেক ঠাণ্ডা করলেন জিন্নাকে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্য পাঠাবার হুকুম রদ করলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, অকিনলেকেরই পরামর্শে চিঠি লিখলেন মাউন্টব্যাটেনকে। তিনি ও নেহরু আসুন লাহোরে। তাঁরা তিনজনে আলাপ আলোচনা করে একটা মীমাংসা করবেন কাশ্মীর সমস্যার।

নরম চিঠি পাঠালেন দিল্লীতে। খবরের কাগজে দিলেন এক গরম বিবৃতি। 'ভারতভুক্তি'র ধাপ্পা দিয়ে ভারত সরকার কাশ্মীর দখল করেছে। পাকিস্তান তা' কোনো দিন মেনে নেবে না। হিন্দুস্থানী বন্দুকের জোরে সেখানকার মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা চলবে না, চলবে না।

দিল্লীতে মন্ত্রিসভার সদস্যরা শক্ত হলেন। চিঠি পেয়ে বললেন, "সমস্যা। কিসের সমস্যা? কাশ্মীরে হামলা? যারা হানাদারদের পাঠিয়েছে তারা তাদের ফিরিয়ে নিলেই তা' মিটে যায়। তার জন্যে আলাপের দরকার কি? আলোচনারই বা অবকাশ কোনখানে?"

মাউন্টব্যাটেন পরিস্থিতি আপসের জন্যে ব্যগ্র। যে-ভাবেই হোক। তিনি চান, জিন্নার নিমন্ত্রণ রাখতে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বললেন, "হ্যাঁ, নিমন্ত্রণই বটে। ধরনটা যে বড়ই চেনা চেনা ঠেকছে! নেহরুর অবশ্য ছাতা নেই, জিন্নারও নেই আর্স্ট্রকরো গোঁফ, তবুও মিটিনিক পর্বের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে না কি? গদেসবার্গ আর লাহোর,—এ-দু'-এর তফাত তো শুধু নামে।"

এ-কথার জবার দেওয়া কঠিন।

অবশেষে অনেক যুক্তিতর্কের পর ঠিক হলো নেহরু নয়, একা মাউন্টব্যাটেন যাবেন লাহোরে।

পাঞ্জাবের লাটপ্রাসাদে দুই গভর্নর জেনারেলের সাক্ষাৎ।

নমস্কার ও কুশল বিনিময়ের পরে জিন্না বললেন, "ভারত সরকার যে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছে পাকিস্তানকে তা' সময় মতো জানানোই হয়নি।"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "সে কী কথা? মন্ত্রীদের যে-সভায় বিমানে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়, সে-সভা থেকে বেরিয়ে নেহরু প্রথমেই যা করেছেন, তা' হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলীকে টেলিগ্রাম।"

জিন্না তখন অন্য কথা পাড়লেন। সোজা প্রশ্ন করলেন, "পররাজ্যে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কোন্ সাহসে?"

মাউন্টব্যাটেন জবাব দিলেন, "ইনস্ট্রুমেন্টস অব অ্যাকসান, 'ভারতভুক্তি'র অধিকারে।"

জিন্না গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভারতভুক্তি সে তো নিছক ছল।"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "না, পুরোপুরি সত্য।"

জিন্না ব্যঙ্গ করে বললেন, "ওঃ কাশ্মীরের পঁচিশ লক্ষ মুসলমান দরখাস্ত করেছে বুঝি ভারত সরকারের কাছে?"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "আইনে তার দরকার হয় না। মহারাজ স্বয়ং দস্তখত করেছেন দলিলে।"

জিন্না বললেন, "মহারাজা? তিনি সহি করার কে? কোন্ দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষে আর কোন্ রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেবে তা' ঠিক করার একমাত্র মালিক হলো সেখানকার জনগণ।"

মাউন্টব্যাটেন নীরবে একটু শুধু মুচকি হাসলেন। মনে মনে বোধহয় বললেন, সে কী কথা, মিস্টার জিন্না, এই কিছুদিন আগে জুনাগড়ের বেলায় আপনারাই তো বলেছিলেন যে, যোগদানের ব্যাপারে নবাবের ইচ্ছাই হলো আইনগত শেষ কথা।

জিন্নাও বোধহয় বুঝলেন মাউন্টব্যাটেনের হাসির অর্থ। কড়া সুরে বললেন, "কাশ্মীরের 'ভারতভুক্তি' আমরা কোনো কালেই মানবো না। তার পিছনে আছে বল প্রয়োগ, গায়ের জোর।"

মাউন্টব্যাটেন শান্তভাবে বললেন, "খুব খাঁটি কথা। সে-বল প্রয়োগ করেছে হানাদারেরা। গায়ের জোর খাটিয়েছে আক্রমণকারীরা। তার দায়িত্ব পাকিস্তানের।"

ঘুরে ফিরে ঐ একই উক্তি ও একই যুক্তি। একই অভিযোগ এবং একই উত্তর।

এমনি করে কেবল কথা কাটাকাটি চললো দুই গভর্নর জেনারেলের মধ্যে।

অবশেষে জিন্না বললেন, "আচ্ছা, আসুন একটা মিটমাট করা যাক। দু'পক্ষই অবিলম্বে একই সঙ্গে কাশ্মীর থেকে চলে আসুক।"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "ভারতবর্ষ তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনবে কাশ্মীর থেকে, সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু হানাদারদের ফেরাবে কে?"

জিন্না বললেন, "আপনি ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনলেই, হানাদারদের হামলা পাকবার ব্যবস্থা আমি করবো।"

বটে! তবে যে এতদিন পাকিস্তান বলে আসছে,—কাশ্মীর আক্রমণ সীমান্তের উপজাতীয়দের কাজ। হানাদারদের উপরে পাকিস্তানের কোনো হাত নেই! সেটা তা হলে শুধু বাইরে প্রচারের জন্য। ভিতরে আসল কথাটা স্বীকার করতে তেমন আপত্তি নেই!

আলোচনা শেষ হলো। তর্কের শেষ হলো না। মীমাংসা হলো না সমস্যার। দুই নবগঠিত রাষ্ট্রর বিরোধ রইল অবিসংবাদিত।

মাউন্টব্যাটেন ও জিন্না একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আন্তরিক হৃদ্যতায় নয়, লৌকিক ভদ্রতায়।

পাঁচ

এবার কাশ্মীর যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে এলেন একজন বাঙালী। ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেন। লাবণ্যপ্রসাদ বা ললিতপ্রসন্ন নয় কিন্তু। লাওনেল প্রতীপ সেন। নামটা পুরোপুরি স্বদেশী নয়, তার কারণ লাওনেল প্রতীপের জন্মও স্বদেশে নয়। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রহ্মদেশের এক নামকরা ব্যারিস্টার। লাওনেল জন্মেছেন রেঙ্গুনে। পড়াশুনা করেছেন সেখানকার সাহেবী কনভেন্টে। বিলাতের স্যান্ডহার্স্ট থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভারতীয় সেনাবিভাগে অফিসার হয়েছেন গত মহাযুদ্ধের কয়েকবছর আগে।

ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস অর্ডার সেনাদলের খুব উঁচু খেতাব। খুব বীরত্ব না দেখালে মেলে না। গত যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার সেন ছিলেন দশ নম্বর বালুচ রেজিমেন্টের সেনানায়ক। বর্মার কাপ-এর জঙ্গলে জাপানীদের নির্মূল করে তিনি সেই সেরা খেতাব পেয়েছিলেন।

শ্রীনগর এসে ব্রিগেডিয়ার সেন দেখেন, শত্রু চায় রাজধানীকে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে। একদল হানা দিচ্ছে সমুখ থেকে। আসছে বারমুলা হয়ে পিচ-ঢাকানো পথে। মোটর নদীর মাথায় চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর একদল আক্রমণ করছে বাঁ পাশ থেকে। তারা আসছে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গাঁয়ের পথ বেয়ে। দুটো জোরালো জঙ্গীদল। যেন শাঁড়াশির মুখে দু'পাটি ধারালো দাঁত। দু'পাশ থেকে শহরটাকে চেপে ধরবে শত্রু কামড়ে। চিবিয়ে গিলে ফেলবে ধীরে ধীরে।

ব্রিগেডিয়র সেন বুঝলেন, প্রথমে চাই দিন কয়েকের সময়। আপাতত চাই হানাদারদের কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা। তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হবে পরে।

সবার আগে হলো শ্রীনগরের বিমানঘাঁটি। শহরের মাইল আটেক বাইরে এই বিমানঘাঁটিটি এখন কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগাযোগ। ঘরের যেমন দোর, নদীর যেমন ঘাট। হাত ছাড়া হলে যাওয়া-আসারই আর পথ রইবে না।

আকাশ-পথে গাড়োয়ালী সৈন্যদের এক রেজিমেন্ট এসে পৌঁছেছিল শ্রীনগরে। তাদেরই একদলকে মোতায়েন করলেন ব্রিগেডিয়র সেন বিমানঘাঁটির পাহারায়। বন্দুক বাঁধে নিয়ে তারা টহল দিতে লাগলো সর্বক্ষণ। পাশ না দেখালে ঢুকতে দেয় না জনপ্রাণীকে। কেউ কাছে ঘেঁষেছে কি অমনি বাজখাঁই আওয়াজে হাঁক দিয়ে শুধোয়,—হু-কুম-দার্?—? শুনে দিলে চমকে ওঠে সবার।

দিন কাটে তো, রাত কাটে না। ভোর হওয়ার আগেই হানাদারদের আনাগোনা শুরু হয় বাদগামে। গ্রামটা বিমানঘাঁটি থেকে আধ মাইল দূর। চেঁচালে গলা শোনা যায়। আগুন জ্বালালে ধোঁয়া দেখা যায়। এত কাছে।

যুদ্ধ বেধে গেল। একেবারে হাতাহাতি লড়াই। একদিকে পাকিস্তানী হানাদার, অন্যদিকে গাড়োয়ালী সৈন্য। কণ্ঠ আকড়ি' ধরিল পাকড়ি' দুই জনা দুই জনে।

শত্রুদলে প্রায় সাতশ'। তারা হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর ব্রেনগান নিয়ে আক্রমণ করছে। গাড়োয়ালীরা সংখ্যায় তার অর্ধেক। তার চালাচ্ছে রাইফেল। চার ঘণ্টা ধরে চলল তুমুল হানাহানি। গোলার ধোঁয়ায় আকাশ হলো কালি, গুলীর শব্দে কানে লাগলো তালা। নিহত আর আহতদের রক্ত ঝরে' জমিন হলো রাঙা।

হানাদারেরা মরীয়া হয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো জোরে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো গাড়োয়ালীদের উপরে। তীরে ঘা-খাওয়া ঢেউ-এর মতোই বারবার ফিরে যেতে হলো তাদের। গাড়োয়ালীদের একচুল হটাতে পারল না তাদের জায়গা থেকে।

খবর পেয়ে ব্রিগেডিয়র সেন শ্রীনগর থেকে তাড়াতাড়ি আরও সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন। ততক্ষণে হানাদারেরা হাঁপিয়ে উঠেছে। নতুন সৈন্যদের মহড়া নেওয়ার সাধ্যি নেই। নিমেষের মধ্যে শ' দুই হানাদার গেল মারা। বেগতিক দেখে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। বিমানঘাঁটিটির আর কোনো আশঙ্কা রইল না।

বাদগামের জয়লাভ গাড়োয়ালীদের এক মস্ত বড় কীর্তি। কিন্তু এই যুদ্ধে তাদের সেনানায়ক মেজর সোমনাথ শর্মা নিহত হলেন। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নিজ সৈন্যদের তিনি পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ অনেকখানি মলিন হয়ে গেল তাঁর শোকে।

শোকে কাতর হয়ে বসে থাকার উপায় থাকে না সেনাপতিদের। রোগীর মৃত্যুতে উতলা হলে ডাক্তার চিকিৎসা করবে কখন? ব্রিগেডিয়র সেনও মন দিলেন কাশ্মীরের রক্ষা ব্যবস্থায়। খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে তৈরি হলো সৈন্যদের ব্যারাক, বালির বস্তা সাজিয়ে অস্ত্রাগার। দেবদারু গাছের গুঁড়ি খাড়া করে টেলিফোনের তার খাটানো হলো এ-দপ্তর থেকে ও-দপ্তরে।

সৈন্য। বেশী সৈন্য। আরও বেশী সৈন্য চাই কাশ্মীরে। পাঠাতে হবে আকাশপথে। পাঠাতে হবে অবিলম্বে। কিন্তু এত বিমান মিলবে কোথায়? তাই তো। দিল্লীতে যুদ্ধ দপ্তরের বড় কর্তারা ভেবে কূল পান না।

হঠাৎ খেয়াল হলো। অনেকগুলি বেসামরিক বিমান কোম্পানী রয়েছে যে দেশে। তারা কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, গৌহাটি প্রভৃতি বড় বড় শহর থেকে আকাশ-পথে যাত্রী আর মাল আনা-নেওয়া করে প্রত্যহ। একুনে তাদের প্রায় শ' খানেক বিমান আছে। বেশীর ভাগই ডাকোটা। সরকারী হুকুমে রাতারাতি সবগুলি বিমান জড়ো করা হলো নয়াদিল্লীতে। পালাম আর সফদরজঙ্গ—এই দু'টি বিমানঘাঁটি থেকে সেগুলি খেয়া নৌকার মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় সৈন্য আর লড়াই-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে-আসা-যাওয়া করতে লাগল শ্রীনগরে।

পাইলট, রেডিও অফিসার, গ্রাউন্ড এঞ্জিনীয়র, ক্রু, কারুরই বিশ্রাম নেই এতটুকু। ভোর হতে না হতেই শুরু হয় বিমানগুলির আকাশে ওড়ার পালা। সন্ধ্যায় একে একে ফিরে আসে মাটিতে। দিন শেষ হয় বটে, কাজ শেষ হয় না। তক্ষুণি আরম্ভ হয় আবার পরের দিনের উদ্যোগ আয়োজন।

সারারাত কুলীরা মাথায় বয়ে বোঝাই করে মাল, কর্মচারীরা ফর্দ করে জিনিসপত্রের। ফিটার মিস্ত্রীরা তেল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষা-মাজা করে বিমানের কলকব্জা, ইঞ্জিন প্রপেলর ইত্যাদি। নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না অনেকের। মেলে না দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে নেওয়ার ফুরসত। দিনের পর দিন বিমান কর্মচারীদের এমন হাসিমুখে একটানা কাজ করার ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, "মানুষ তো নয় এরা। এক একটি কল!"

কলের মতোই নিখুঁত নিয়মে চলতে লাগল সরবরাহের কাজ। বিমানপথে শ্রীনগর পৌঁছতে লাগল বাক্স-বন্দী বোমা, বন্দুক, বস্তা-বোঝাই রসদ। দলে দলে আসতে লাগল সৈন্য সামন্তেরা।

হেমন্তের শেষে হিমালয়ের কোলে মানস সরোবর থেকে যেমন সমতল ভূমিতে উড়ে আসে সারস, তিতির আর হংস-মিথুনের ঝাঁক।

রোগের মতো উৎসাহটাও ছোঁয়াচে। একজনকে দেখলে আর একজনের বুক ছটু হয়ে ওঠে। বিমানবাহিনীর লোকেরা যদি এত যোগ্যতা দেখাতে পারে তবে সাঁজোয়াবাহিনীর লোকেরা পিছনে পড়ে থাকবে নাকি ? কখনও নয়। তারা উপরওয়ালাদের কাছে প্রার্থনা জানাল, হুকুম পেলে এক ডিভিসন আরমার্ড কার তক্ষুণি রওনা হতে পারে কাশ্মীরে।

আরমার্ড কারগুলি কামান বসানো মোটর গাড়ি। চারিদিকে মোটা লোহার পাতে ঘেরা ; যেমন তাদের কামানের দূর পাল্লা, তেমন তাদের দ্রুতগতি। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয় তাদের দাপটে। কিন্তু যে-পথে সৈন্য চলা দায়, সে-পথে আরমার্ড কার যাবে কেমন করে ? ঘন জঙ্গলে আটকে যাবে হয়তো উপরের ছাদ। পাথরে পিছলে যাবে নীচের চাকা। কামানের ভারে ঝুঁড়িয়ে যাবে নদী নালার উপরে হাল্কা কাঠের যুতো সাঁকো।

তখন স্যাপার্স আর মাইনার্স দলের লোকেরা এগিয়ে এসে বলল, তারা থাকবে সাঁজোয়া গাড়ির সামনে। আগেভাগে গাছ কেটে বন সাফ করবে, পাহাড় কেটে পথ।

"এম· ই· এস·"-এর লোকেরা সব এঞ্জিনীয়র। তারাই বা কম যাবে কেন ? সেলাম করে জানাল, তার বাঁধবে খাদের ধার, গড়বে নতুন শক্ত পুল। বাস।

আর কথা কী ? সেই রাত্রে দিল্লী থেকে রওনা হলো তারা।

পাঠানকোটের মাঠ ছাড়িয়ে, পীর পঞ্জলের চূড়া ডিঙিয়ে, বানিহালের সুড়ঙ্গ-পথ ঘর্ঘর শব্দে পেরিয়ে একদিন সকালবেলা শ্রীনগরে এসে পৌঁছল ছোট একটি সাঁজোয়াবাহিনী। লাইনবন্দী আরমার্ড কার। দেখে শহরের ছেলে বুড়ো সবার বুকে এল বল, মনে জাগলো আশা, মুখে ফুটলো হাসি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করতে লাগলো। "ভারত মাতা-কী জয় !" "জয়, পণ্ডিতজী-কী !"

ছয়

অক্টোবর মাসের বাকি দিন ক'টা শেষ হয়ে গেল। এল নভেম্বর। শীতের আমেজ দেখা দিল কাশ্মীরে। হরি পর্বতের গায়ে লাগল কুয়াশার প্রলেপ। নাশিমবাগে চেনারের পাতা হলো পীতাভ। পথের ধারে ফল-ঝরা আখরোটের শাখাগুলি শূন্য। ডাল হ্রদের জলে পানকৌড়িদের ডুব-সাঁতারের খেলাও হয়েছে সাঙ্গ। তীরে ডানা মেলে বসে কুঁড়ে বাদশা'র মতো তারা এখন শুধু রোদ পোহায় সারা দুপুর।

সে-দিন শুক্রবার। ৭ই নভেম্বর। রাত তখনও শেষ হয়নি। ব্রিগেডিয়র সেন হুকুম দিলেন, "ফরোয়ার্ড মার্চ !"

গত ক'দিন ধরে ব্রিগেডিয়র সেন এবং তার সহযোগীরা মিলে আক্রমণের তোড়জোড় সম্পূর্ণ করেছেন। শ্রীনগরের আশেপাশে কেবলই ছোট ছোট পাহাড়। তার আড়ালে কোন্‌খানে জড়ো হয়েছে শত্রুদল ; বন-বাদাড়ের মাঝে কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে খাদ,—তার খবর যোগাড় করেছেন গোপনে। মাইল মেপে এঁকেছেন রাস্তা-ঘাটের নক্সা। এতদিন ভারতীয় সৈন্যদের ছিল আত্মরক্ষার লড়াই। এবার এসেছে আক্রমণের পালা।

পাটান থেকে শ্রীনগরের পথে হানাদারদের আস্তানায় বেশীর ভাগ তখনও ঘুমে বেঘোর। দু'চার জন মাত্র আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে। এমন সময়, "হারে রে রে রে—।"

হানাদারদের সর্দার তখনও বিছানায়। এ ক'দিনের লুটের আনন্দে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যেমন মশগুল ; জয়লাভের আশায় তিনি নিজেও তেমনি খোশ মেজাজ। বাদগামের যুদ্ধের পরে এ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

বিনা বাধায়-ই হানাদারেরা ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে বারমূলা থেকে পাটান। পাটান থেকে

সেলাটং। শ্রীনগর শহরের প্রায় দোরগোড়ায়। এখন রাজধানী শ্রীনগর তাদের নাগালে। ঠিক যেন গাছের নীচু ডালে ঝুলছে লাল টুকটুকে পাকা আপেলটি। শুধু হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। অনেক রাত জেগে সর্দার তাই ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আমোদ ফূর্তি করেন। কখনও মনের সুখে গোঁফে লাগান চাড়া। কখনও বা গন্ধ-ভরা রুমাল হাতে নিয়ে সহস্রবার দাড়িতে দেন ঝাড়া।

শেষ রাত্রির দিকে সর্দারের ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন।—যেন শ্রীনগর দখল করে মহারাজকে কোতল করেছেন। মহারাণীকে করেছেন বাঁদী। তাকিয়া ঠেস দিয়ে সোনার গড়গড়ায় রুপোর নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া খাচ্ছেন আরামে। হঠাৎ শোনেন "হারে রে রে রে— ।"

ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে ভীষণ বেগে।

চমকে উঠে বসে বললেন, "অ্যাঁ, যুদ্ধ ? সে কী ?"

চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় হাঁক দিলেন, "বন্দুক লাও।"

লাও তো বটে ! কিন্তু আনে কে ? হট্টগোলের মধ্যে হানাদারেরা কেউ খুঁজছে হাতিয়ার, কেউ খুঁজছে পোশাক কেউ বা দিশেহারা হয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই রুপালে খেল ঠোক্কর, মাথায় পেল চোট। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে।

ব্রিগেডিয়র সেন আগেভাগে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরে, আর একদলকে দক্ষিণে। মাঝখানে ছিল মূল পদাতিক বাহিনী। ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতো তিন দল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করল হানাদারদের।

তিনদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে লড়াই করা চলে কতক্ষণ ? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হানাদারেরা কাবু হয়ে পড়ল। তার উপরে— ।

এ কী, মেশিনগানের আওয়াজ শোনায় যেন ! হানাদারেরা অবাক হয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়। ওমা, তাই তো। এ যে সাঁজোয়া গাড়ি ! সর্বনাশ !! ঘর্ঘর শব্দে ছুটে আসছে পথের ধুলো উড়িয়ে, কামানের ধোঁয়া ছড়িয়ে। গুলী ছুঁড়ছে যেন শিলাবৃষ্টি ! "ইয়া আল্লা" বলে হানাদারেরা তখন দিল সোজা চম্পট। দৌড়, দৌড়, চোঁচা দৌড়।

কমান্ডার দেখলেন মহা বিপদ। দলের লোকেরা এভাবে পালাতে শুরু করলে যুদ্ধ করবেন কাকে নিয়ে ? তিনি তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ভাইজান, তোমরা পিছু হটছ কেন ? মনে হিম্মৎ রাখ, হিন্দুস্থানী কাফেরগুলি এখুনি ঘায়েল হবে। একটু পরেই শ্রীনগর আমাদের কব্জায়। জিহাদ হাসিল কর—"

কে শোনে কার কথা। হানাদারেরা বলে, "আরে রাখো মিঞা, তোমার শ্রীনগর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান যায়, তায় জিহাদ !" তাড়াতাড়ি পালাতে লাগল তারা যার যে দিকে দু'চোখ যায়।

কিন্তু যেদিকে সেদিকে যাওয়ার কি জো আছে ? ভারতীয় সৈন্যরা আছে যে তিন দিকেই। খোলা একমাত্র পিছনের পথ। যে পথে হানাদারেরা হানা দিয়েছিল শ্রীনগরের পানে। উল্টে সে পথেই উর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটল তারা। পিছনে মরে পড়ে রইল তাদের শ'তিনেক সঙ্গী। কিছু রেখে গেল লুঠের মাল, কিছু ফেলে গেল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম।

প্রাণের মায়ায় ছোটা,—বড় বিষম ছোটা। পড়ি তো-মরি করে ছুটতে ছুটতে হানাদারেরা সেলাটং থেকে পালালো পাটানে। পাটান থেকে বারমুলায়।

উল্লাসে ভারতীয় বাহিনী পিছনে ধাওয়া করল তাদের। কিন্তু শহরে যাত্রীচলার মোটর বাসগুলি কত আর জোরে চলতে পারে ? তবুও সৈন্যদলের ড্রাইভারেরা চেষ্টা করল প্রাণপণ। গাড়ির এক্সিলারেটরটা ডান পায়ে চেপে ধরল পুরোপুরি। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা, চল্লিশ থেকে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সৈন্য বোঝাই বাসের জানলা খড়খড়িগুলি কাঁপতে লাগলো সশব্দে। স্টিয়ারিংটা ধরতে হলো শক্ত মুঠোয়।

"চালাও, চালাও জোরসে।" হাঁকতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদলের সেনানায়ক। ঐ যে দেখা

যাচ্ছে,—পালাচ্ছে দুশমনেরা। আর একটু এগোলেই ধরে ফেলা যাবে তাদের। "জোরে, আরও জোরে চালাও ড্রাইভার, আউর জোরসে।" পঞ্চান্ন; সাতান্ন—স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠছে। বাট, বাষট্টি—আর একটু, আরও—!

ঘট্ ঘট্ ঘটট—ঘটাং।

বেগ কমে ধীরে ধীরে গাড়ি ঠায় থেমে গেল। কী ব্যাপার ? মোটরের ইঞ্জিন বিগড়েছে বুঝি ? ড্রাইভার হ্যাণ্ডল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল। টানল চোক। বনেট খুলে পরীক্ষা করলো যন্ত্রপাতি। না। পেট্রোল ফুরিয়েছে গাড়ির। এক ফোঁটা তেল নেই পেট্রোল ট্যাঙ্কে।

সাত

বারমুলা থেকে হানাদারেরা পালিয়ে গেল দূরে।

গাছ না উপড়ে বড় থামে না ঝড়, গাঁ না মজিয়ে নড়ে না মড়ক। লুঠতরাজ খুন-খারাপি না করে দস্যুদলই বা বিদায় হয়েছে কবে কোন্ দেশে ? হানাদারেরা গেল। কিন্তু যাবার আগে তাদের হাতের ছাপ রেখে গেল বারমুলার আষ্টেপৃষ্ঠে। হাতের ছাপ তো নয়, নখের দাগ। সে দাগ বহু শোকের অশ্রু দিয়ে ভেজা, বহু লোকের রক্ত দিয়ে লাল।

হানাদারেরা বারমুলায় চড়াও হয়েছিল দিনে-দুপুরে। পুরুষেরা তখন যে যার কাজে বাইরে। হাটে চলেছে বেচাকেনা, মাঠে চলেছে নিড়েন। কাছারিতে চোখে চশমা এঁটে মুন্সীরা লিখছে উর্দু বয়ানে দশধারার আরজি। মাদ্রাসার বুড়ো মৌলভী সাহেব শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিশোর ছাত্রদের শেখাচ্ছেন—আলীফ্, বে, তে, সে।

শহর দখল করে দস্যুরা দলে-বেদলে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। যেন পাকা ফসলের ক্ষেতে আচমকা নেমে এল রাশি রাশি পঙ্গপাল। সব ধ্বংস করে দিল দু'দণ্ডে।

প্রথম পর্যায়ে লুঠ। বাক্স ভেঙে নিল টাকাকড়ি। সিন্ধুক ভেঙে সোনাদানা। মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়ে নিল গয়না। তাঁতি বউ হারাল গলার হাঁসুলি, নাপিতবউ-এর গেল হাতের বাজুবন্ধ্। অতি দরিদ্রের ঘরে আর কিছু না পেয়ে দস্যুরা হেঁশেল থেকে টেনে নিয়ে গেল পিতল কাঁসার বাসনপত্র। সন্ধ্যাবেলা ধানের গোলায় আর তিসির আড়তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে করল উল্লাস। রঙ্গ করে একে অন্যকে বলল,—বড়ি আচ্ছি রোশনাই হো রহী হৈ,—বাঃ, খুব উজ্জ্বল আলো হচ্ছে তো !

লুণ্ঠন আর হনন। যমজ ভাই-এর মতো চলে পিঠোপিঠি। হিন্দু আর শিখ সামনে পেলে আর রক্ষে নেই। হানাদারেরা নিমেষে তাদের হত্যা করতে লাগল পৈশাচিক উল্লাসে। যুবক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ,—কোনো বাছবিচার রইল না আর কোনোখানে। স্ত্রীর চোখের সামনে কত স্বামীর মাথা পড়ল কাটা। মায়ের কোলে কত শিশুর বুকে বিঁধলো গুলী। ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে যারা কোনো মতে প্রাণ বাঁচালো তাদেরও সবার দেহ অক্ষত রইল না।

কাশ্মীর আক্রমণকে পাকিস্তান বরাবর বলছে—ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। মহারাজ হিন্দু। তিনি নাকি কেবলই মুসলিম নির্যাতন করেন। তাই উপজাতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গিয়ে কাশ্মীরে চড়াও হয়েছে, তাদের স্বধর্মীদের ত্রাণ করতে। এ তো যেমন-তেমন লড়াই নয়,—এ জিহাদ। ওরা তো হানাদার নয়,—ওরা মুজাহিদ ! বলেছেন পাকিস্তানের কর্তারা।

মুজাহিদেরা কিন্তু মুসলমানকেও রেহাই দিল না বারমুল্লায়। ত্রাণ করণের বদলে প্রাণ হরণ হলো সেখানে। মুসলমান যাদের ধন বা প্রাণ গেল তাদের মধ্যে নাম না-জানা ছিল অনেকে। নামজাদা ছিলেন অবশ্য মকবুল শেরোয়ানী।

শেরোয়ানী বারমুলার গণ্যমান্য নেতা। তাঁর কথা সবার মুখে মুখে, তাঁর খ্যাতি রটেছে পথে-ঘাটে। লোকের রোগে-শোকে তিনি ভাই এর মত দরদী, বিপদে-আপদে তিনি সবার মাতা

সহায়। সারা শহরে তাঁর সুনাম ধরে না।

কিন্তু তাঁর উপরে পাকিস্তানীদের রাগ ছিল অনেক দিনের এবং অনেকখানি। পাকিস্তানের যিনি শাহানশা বাদশা, সেই কায়েদে আজম জিন্নাকে একবার বড়ই অপদস্থ করেছিলেন মকবুল শেরোয়ানী।

কয়েক বছর আগে জনাব জিন্না এসেছিলেন কাশ্মীরে। বারমুলার এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বললেন, "কাশ্মীরী মুসলমানেরা সব এক হোক, তাদের এক আল্লা এক কলেমা, এক দল।"

শেরোয়ানী ছিলেন সে সভায় একজন শ্রোতা। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক কথা। এক হোক, তবে শুধু মুসলমান নয়—এক হোক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারশি, খ্রীস্টান।—এক হোক কাশ্মীরের সমস্ত জনগণ।"

জিন্না রেগে বললেন, "হিন্দুরা কাফের, মুসলমানের শত্রু।"

মকবুল শেরোয়ানী উত্তর দিলেন, "হিন্দুরা মানুষ, মুসলমানের ভাই।"

রাগে জিন্না সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ। মুখে যোগাল না কথা। বার্নিশ করা জুতো মশ্‌মশ্‌ করে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সভা ছেড়ে চলে গেলেন সেই মুহূর্তে। ফুলের মালা রইল পড়ে। জয়ধ্বনি রইল বাকী।

সেই পুরানো কাহিনী মনে ছিল পাকিস্তানীদের। তার শোধ তুলল এতদিনে। হানাদারেরা শেরোয়ানীকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির করল তাদের সর্দারের সামনে। বলল, "সেলাম কর।"

শেরোয়ানী নির্ভীক। হেসে বললেন, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করিনে কারে প্রণিপাত।"

স্পর্ধা বটে! রোষে ফুলতে থাকে সর্দারের অনুচরেরা।

মনের ক্রোধ চেপে রেখে সর্দার বললেন, "আমরা কাশ্মীর জয় করেছি। শ্রীনগর দখল করব দু'-এক দিনে। আমাদের দলে যোগ দাও। সাহায্য কর।"

শেরোয়ানী জবাব দিলেন, "আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া কাশ্মীরের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। তোমরা দস্যু। তোমরা নিপাত যাও!"

শুনে সবাই গর্জে ওঠে। কেউ হাঁকে গর্দান লাও, কেউ চড়াতে চায় শূলে। আর কেউ বা চোখ লাল করে বলে, হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক; ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।

সর্দার হুকুম দিলেন, "হাটের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে প্রথমে গুণে গুণে লাগাও দু'শ' কোড়া। পিঠে পাঁচশ' পয়জার। কমবক্তের তাতেও শিক্ষা না হলে, গুলী করে মাথার খুলি উড়িয়ে দাও সবার সামনে।"

তখন শেরোয়ানীর হাতে উঠল হাতকড়ি, পায়ে পড়ল বেড়ি। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে জল্লাদেরা নিয়ে গেল চৌরাস্তার মোড়ে। বধ্যভূমিতে। সেখানে হানাদারেরা এসে ভিড় জমাল মজা দেখার আশায়।

শেরোয়ানী অবিচলিত। শপাং শপাং শব্দে পিঠে পড়তে লাগল চাবুক। একের পর এক। কতগুলি লাগল বুকে, মুখে, চোখে। কেটে গিয়ে, রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বাঙ্গে।

সর্দারের লোকেরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "এখনও বাঁচার সময় আছে, আমাদের দলে যোগ দিতে রাজী থাক তো বল, বল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

মকবুল শেরোয়ানীর চেঁচিয়ে কথা বলার শক্তি নেই, চেতনা পাচ্ছে লোপ, জিব আসছে জড়িয়ে। তবুও কোন মতে অতি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "কাশ্মীর জিন্দাবাদ, মেরী পিয়ারী কাশ্মীর—কাশ্মীর বেঁচে থাক, আমার সাধের কাশ্মীর—।"

পর মুহূর্তে তিন দিক থেকে তিনটে বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁর মাথা তাক করে।

হানাদারেরা উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে বলল—অবাধ্যের এই সমুচিত শাস্তি। অন্য লোকেরা দেখে শিখুক।

দেখে শেখার লোক আর বড় বাকী ছিল না। হানাদারেরা মেরে কেটে প্রায় সাবাড় করে এনেছিল সব।

কিন্তু ঠেকে শিখতে হলো আরও কয়েকজনকে। তারা কাশ্মীরী নয়, বিদেশী।
খ্রীস্টান মিশনারীদের এক আশ্রম ছিল বারমুলায়। "প্রেজেন্টেশান কনভেন্ট" তার নাম।
অনেক কাল আগের কথা। এক ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন কাশ্মীরে। রোমান ক্যাথলিক
সিস্টার। চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। কাশ্মীরে চাষী মজুরদের দুঃখদুর্দশা দেখে তাঁর হৃদয় কাতর হলো
করুণায়। স্থির করলেন, সেইখানে দরিদ্রের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি। স্বদেশ, সমাজ ও
স্বজন পড়ে রইল পিছনে। নিজের ইচ্ছায় মাথায় তুলে নিলেন সহস্র যোজন দূরে এক অপরিচিত
দেশের দুঃস্থ জনগণের দুঃখ মোচনের ভার। নিজের অতি সামান্য সম্বল নিয়ে স্থাপন করলেন এক
আশ্রম। এই প্রেজেন্টেশান কনভেন্ট। তার আয়তন ক্ষুদ্র, আয়োজন সামান্য। কিন্তু আন্তরিকতা
কম নয়।

তারপরে বহু বছর গিয়েছে কেটে। বহু ধর্মপ্রাণ দানশীল বিদেশীর দানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে
উঠেছে সেই কনভেন্ট। ক্ষুদ্র অঙ্কুর থেকে দিনে দিনে যেমন গড়ে ওঠে বিরাট মহীরুহ।
শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, পুষ্প-পল্লবে সমৃদ্ধ। আজ প্রেজেন্টেশান কনভেন্টে আছে হাসপাতাল।
সেখানে প্রত্যহ শত শত অসুস্থেরা পায় ওষুধ! আছে বিদ্যালয়। সেখানে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা
নেয় পাঠ। আছে নারী শিল্পাগার। সেখানে অনাথা স্ত্রীলোকেরা শেখে তাঁত চালনা, উল বোনা,
সেলাই ও অন্যান্য কারুকাজ।

সেদিনের সেই পুণ্যশীলা প্রতিষ্ঠাত্রী গিয়েছেন পরলোকে। তিনি নেই। কিন্তু আছে তাঁর কাজ,
রয়েছে তাঁর আদর্শ। সে কাজ হাতে নিয়েছেন, সে আদর্শ সফল করেছেন নানা দেশ থেকে আগত
নবীন সন্ন্যাসিনীরা। নতুন একদল সিস্টার। কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ বা ইটালীয়ান।
তাঁদের জাতি আলাদা, ভাষা পৃথক, কিন্তু লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য পরোপকার।

হানাদারেরা বারমুলায় আসছে শুনে কনভেন্টের অনেকেই ভীত হলো। মাদার সুপিরিয়র
কনভেন্টের প্রধান কর্ত্রী। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন "আসে আসুক। আমরা রোগীর শুশ্রূষা
করি, আর্তের সেবা করি, দীন দরিদ্র নিয়ে আমাদের কাজ। কারো সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই
আমাদের। আমাদের ভয় কিসের?"

হায়! তিনি জানতেন না যে, যারা লুঠ করে তাদের রীতি আলাদা। সাধুর তারা শত্রু, ভালোর
তারা যম। তাদের বিরোধ জগতের সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত নরনারীর সঙ্গে।

মাদার সুপিরিয়রের ভুল ভাঙতে বিলম্ব হলো না।

বেলা তখন পাঁচটা। পীর পঞ্জালের মাথায় শাদা বরফের গায়ে লেগেছে পড়ন্ত রোদের
আধ-গোলাপী রঙ। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর পপলার গাছগুলির ছায়া পড়েছে দীর্ঘ।
আলখাল্লার মতো লম্বা ময়লা পিরান গায়ে, চাপা টুপি মাথায় ক্লান্ত গুজরালেরা মেষের পাল নিয়ে
কাঁচা মকাই চিবোতে চিবোতে ফিরছে ঘরে।

কনভেন্টের স্কুলে ছুটির ঘন্টা বেজেছে অনেকক্ষণ। ছাত্র-ছাত্রীরা চলে গিয়েছে যে যার
বাড়িতে। হাসপাতালে রোগীরা শুয়ে আছে বিছানায়। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল কোলাহল।
হৈ-হুল্লোড়ে একদল হানা দিল কনভেন্টে।

কনভেন্টের অতিথিশালায় ছিলেন কয়েকজন বিদেশী। কেউ নতুন এসেছেন বেড়াতে, কেউ
বা আছেন অনেক দিন। তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ ইংরেজ। লেফটেনেন্ট কর্ণেল ভি· ও· টি
ডাইকস। আগে কাজ করতেন ভারতীয় সেনা বিভাগে, পেন্সনের পর রয়ে গিয়েছেন এদেশে।
সস্ত্রীক বসবাস করছেন এই কনভেন্টে। বাতে প্রায় পঙ্গু। তবুও সাধ্যমতো হিসাবপত্র লেখার
কাজকর্ম করে সিস্টারদের সাহায্য করেন মাঝে মাঝে। বিপদের সময় এই বৃদ্ধই বন্দুক হাতে
এগিয়ে গেলেন সামনে। রুখতে চাইলেন দস্যুদের কনভেন্টের বাইরে।

কিন্তু বার্ধক্যে ডাইকসের শরীর বলহীন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। বাতে আড়ষ্ট হাত বন্দুক তাক
করার আগেই হানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারালেন তিনি।

ভয়ে ও উদ্বেগে স্বামীর সঙ্গে ঠিক তাঁর পিছনেই ছিলেন স্ত্রী মিসেস ডাইকস। একটি টীক
খরগোশের ছানার উপরে এক পাল হিংস্র জন্তুর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারেরা

দল। শুধু একবার বুঝি একটি আর্তনাদ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই আক্রমণকারীদের উদ্দাম আস্ফালন ও উন্মত্ত কোলাহলে চাপা পড়ে গেল সে কাতর স্বর। দু'দিন পরে মিসেস ডাইকসের নগ্ন মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটা গভীর কূপের মধ্যে। মৃত মহিলার গায়ের জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিতে বাকী রাখেনি তাঁর হত্যাকারীরা।

কনভেন্ট থেকে প্রচুর ধনদৌলত বস্তা বোঝাই করে নিয়ে যাবে—এই আশা ছিল দস্যুদের। নিরাশ হলো। আশ্রম শোভার জন্য নয়,—সেবার জন্যে। সেখানে না থাকে মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি, না আছে হীরা-জহরতের জাঁকজমক। অগত্যা দেয়ালের ঘড়ি, আলনার জামা কাপড় আর জানলার পর্দা নিয়েই হানাদারেরা কাড়াকাড়ি করতে লাগল।

লুঠের মাল যতই হলো কম, লুণ্ঠনকারীদের ততই বাড়ল রোষ। জিনিসপত্র ভেঙে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগল। ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দেরাজ, পেয়ালা, পিরিচ, শার্শি, কপাট করল চৌচির। তাদের অস্ত্রের আঘাতে বাগানের পাশে সমাধিস্থানে শ্বেত পাথরের ক্রশ চিহ্নগুলি পর্যন্ত হলো চূর্ণবিচূর্ণ।

এতেও শান্ত হলো না ক্রোধ। বরং খুন চেপে গেল মাথায়। কনভেন্টের বিদেশী সন্ন্যাসিনী মেয়েদের ন'জনকে সঙ্গীনের পাহারায় এনে এক সারিতে দাঁড় করাল উঠানে। ন'জন হানাদার বন্দুক উঁচিয়ে তাক করল তাদের কপালে। শুধু গুলী ছোঁড়ার অপেক্ষা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দুরু-দুরু বুকে চোখ বুজে ভগবানের নাম স্মরণ করলেন সন্ন্যাসিনীরা।

কিন্তু রাখে খ্রীস্ট মারে কে? আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে ন'টি পরোপকারী সন্ন্যাসিনীদের রক্ষা করলেন অদৃশ্য থেকে নিশ্চয়ই ভগবান, কিন্তু প্রকাশ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিস।

সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের মুখের একটি দাঁত ছিল সোনা বাঁধানো। সেটা চোখে পড়তেই এক জল্লাদ বন্দুক ফেলে দিয়ে ছুটল সেটা দখল করার লোভে। কিন্তু লুঠের নজর তো একা তারই তীক্ষ্ণ নয়, তার অন্য সাঙাতরাও কিছু চোখ বুজে ছিল না। কাজেই সোনার লোভে নিজেদের মধ্যেই বাঁধল কলহ। প্রথমে গালাগালি; শেষে হাতাহাতি। হট্টগোলের মধ্যে হানাদারদের এক কর্তা এসে হাজির। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে। কাশ্মীরী মেয়ে পুরুষ হত্যা করা এক, য়ুরোপীয় সন্ন্যাসিনীদের গুলী করার আর—সেটুকু তিনি বোঝেন। তাই শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় রূপে প্রাণ রক্ষা হলো তাঁদের।

হানাদারদের আর এক দল ততক্ষণ ব্যস্ত ছিল কনভেন্টের অন্য এক অংশে। তারা চড়াও হলো হাসপাতালে। যা সামনে পেল তাই করল খানখান। যাকে হাতে পেল তাকেই করল আহত বা নিহত। বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে টুকরো টুকরো করল দামী এক্স-রে যন্ত্রপাতি। শিশি বোতল দিল গুঁড়িয়ে, ওষুধপত্র গেল গড়িয়ে, ক্ষত-বিক্ষত হলো অসহায় অসুস্থ নরনারী। মারা গেল একজন নার্স, আয়ু শেষ হলো দু'জন রোগীর।

প্রাণ দিলেন একটি পুণ্যবতী মহিলা। সিস্টার টেরেসেলীন। কনভেন্টের সহকারী মাদার সুপিরিয়র। সুদূর য়ুরোপের স্পেন দেশ থেকে এসেছিলেন বারমূলায় পরহিতের ব্রত দিয়ে। কনভেন্টের উপাসনা স্থানটি পাছে হানাদারদের আক্রমণে অপবিত্র হয়, এই আশঙ্কায় প্রহরীর মতো তিনি একা দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্দিরের দুয়ারে। গুলী এসে বিঁধল তাঁর বুকে।

সেদিন বারমূলায় দস্যুদের আঘাতে ছিন্ন হলো একটি কোমল লতার মূল। সেদিন জনসেবার বেদীতে নিবল একটি স্নিগ্ধ দীপের শিখা।

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তে লিখা।

আট

শ্রীনগর থেকে পেট্রোল জোগাড় করে অবশেষে বারমূলায় এসে পৌঁছল ভারতীয় সৈন্যদল। সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ঘনিয়ে।

নিঝুম নিস্তব্ধ নগর। অনেক ঘা খেয়ে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানুষের মতো যেন পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত বারমুলা। অসাড় অচেতনা। তার পথগুলি জনহীন, ঘর-বোর শূন্য। রাস্তার ধারে, বাড়ির উঠনে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। সেখানে শকুনি গৃধিনীদের চলছে ফলার, শেয়াল কুকুরে বেধেছে মারামারি। হায়, বারমুলা ছিল শহর,—বারমুলা হয়েছে শ্মশান।

পরদিন সকালবেলাই ব্রিগেডিয়র সেনের সৈন্যদল আবার বেরিয়ে পড়ল হানাদারদের সন্ধানে। কিন্তু তাদের কি আর নাগাল পাওয়া যায়? তারা ততক্ষণে সরে পড়েছে অনেক দূরে। পালবার সময় রাস্তাঘাট নষ্ট করে রেখে গিয়েছে যাতে ভারতীয় সৈন্যদল সহজে পিছু ধাওয়া করতে না পারে। পথের মাঝখানে ফেলে রেখে গিয়েছে বিরাট গাছের গুঁড়ি। কোথাও বা পাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিয়েছে মস্ত পাথরের চাঁই। সে সব না সরিয়ে এগোতে পারে না জীপ বা মোটর বাস। তার উপরে আবার পেট্রোল ফুরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্রীনগর থেকে নতুন পেট্রোল এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত বসে থাকতে হয় নিরুপায়।

এমনি করে ভারতীয় সৈন্যরা এসে পৌঁছল রামপুর। যে-পথে লাগে কয়েক ঘন্টা, সে-পথে লাগলো কয়েক দিন।

শ্রীনগরে যারা আছে তারা আশা ও আশঙ্কায় দুলছে অহরহ। কী হয়, কী হয়। সেলাটাং ছিল ঘরের কোণায়। কানের কাছে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছে। লোকের মুখে খবর পাওয়া গিয়েছে: এখন শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূরে। সেখানকার হারজিতের সঠিক সংবাদ জানে না কেউ। থেকে থেকে গুজব রটেছে নানা রকম। তার কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে হদিশ পাওয়া ভার। সকালে শোনা গেল, ভারতীয় সৈন্য, হানাদারদের ঘায়েল করেছে। শুনে লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরক্ষণেই শোনা যায় তার উল্টো। ভারতীয় সৈন্যদের নির্মূল করে হানাদারেরা নাকি আবার এগিয়ে আসছে শ্রীনগরের পথে। তখন ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে যায়। বুক করে দুরু দুরু। বাক্স-বিছানা বেঁধে পালাবার উদ্যোগ করবে কিনা ভাবে। এমনি করে দিন কেটে যায়।

হঠাৎ এক সন্ধ্যেবেলা শ্রীনগরের বিজলী আলোগুলি ঝলমলিয়ে উঠলো।

ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। প্রথমে লাগে অবাক, পর মুহূর্তেই জাগে আনন্দ। য়্যা, মহুরা? তাহলে মহুরায় পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল? হানাদারদের দিয়েছে হটিয়ে? খুশিতে এ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, "মহুরা, মহুরা এসেছে আমাদের দখলে।"

হ্যাঁ; রামপুর থেকে মহুরায় এসে পৌঁছেছে ব্রিগেডিয়র সেনের সৈন্যদল। আজকাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকে জন কয়েক এঞ্জিনীয়র। তাঁরা যুদ্ধ করেন না, কিন্তু যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিখুত রাখেন। জোড়াতালি দিয়ে অচল কলকব্জা সচল করতে তাঁরা ওস্তাদ। জীপ, লরী, মোটর, ট্যাঙ্ক মেরামতিতে তাঁদের জুড়ি নেই। জলবিদ্যুতের যন্ত্রপাতি তাঁদের কাছে নতুন হলেও একেবারে অসাধ্য নয়। দিন কয়েকের চেষ্টায় ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে তাঁরা বিদ্যুৎ কারখানার ডাইনামোটা চালু করে দিলেন। আলো জ্বলে উঠল রাজধানীতে।

শুধু পথে বা ঘরে নয়, লোকের মনেও।

নয়

মহুরা থেকে উরির পথের দু'ধারে উঁচু পাহাড় আর ঘন বন। সেখানে লুকিয়ে থেকে শত্রু আচমকা আক্রমণ করতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই ভারতীয় সৈন্যদলকে এবার এগোতে হবে সাবধানে। খবরদারীর জন্য সহায়তা নিতে হয় বিমান বাহিনীর।

শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিটি ক্ষুদ্র। মহারাজ তৈরী করেছিলেন তাঁর নিজের বিমান চলাচলের জন্য। সে-বিমান সৌখীন প্রমোদ-ভ্রমণের বাহন। আকারে ছোট, ওজনে কম। তাই বিমানঘাঁটির

রানওয়ে যেমন সরু, ফ্লাইং কন্ট্রোল, বাতাসের গতি ও আবহাওয়ার হালচাল জেনে নেওয়ার যন্ত্রপাতি তেমনি সাধারণ। বড় বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বড় কর্তারা তখন প্রায় সবাই ইংরেজ। তাঁরা দিল্লী থেকে এসে বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করলেন। বিশেষজ্ঞ যত ছোট, মেজ, সেজ ও বড় সাহেব তাঁরা দিন দুই ধরে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরিধি প্রভৃতি পরীক্ষা করলেন। ফিতা ফেলে মাপলেন, খড়ি দিয়ে দাগলেন, খাতা-পেন্সিল নিয়ে করলেন ভগ্নাংশ, দশমিক ও বর্গফলের রাশি রাশি অঙ্ক। তারপরে এক দিস্তা কাগজে নোট লিখে বললেন—অসম্ভব। শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে জঙ্গী বিমানের ওঠা-নামা চলে না।

বিশেষজ্ঞদের মত, সে তো না মেনে উপায় নেই। অগত্যা পালম থেকেই বিমান বাহিনীর বিমানগুলিকে উড়ে আসতে হয় কাশ্মীরে। তাতে অসুবিধা অনেক। বিমানে পেট্রোল নেওয়ার জায়গা অল্প। যেতে আসতেই বেশীর ভাগ পেট্রোল ফুরিয়ে যায়।

দিন কয়েক পরেই কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়ে গেল এক আশ্চর্যজনক ঘটনায়।

পাহাড় পর্বতের আড়ালে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধের এলাকাটা আকাশ থেকে চিনতে যাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে সে জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর সুদর দপ্তর থেকে খবর পেলেই কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদল খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলে রাখতো তাদের ছাউনির কিনারে। বিমানগুলি সেই আগুন দেখে সহজেই তাদের লক্ষ্যস্থল বুঝতে পারতো।

সেদিন সকালবেলা পালম থেকে দু'খানা স্পিটফায়ার বিমান নিয়ে রওনা হলো বিমানবাহিনীর দু'জন তরুণ পাইলট। উড়ে এল পাটানে। নীচে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কোনখানে আগুনের চিহ্নমাত্র নেই। বেতারে খবর পাঠাতে ভুল করেছে বেতারবার্তার অপারেটার। তাই ব্রিগেডিয়র সেনের দপ্তর আগে-ভাগে জানতে পারেনি বিমানগুলির দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার সংবাদ।

তাই তো, এখন কী করা যায়? ফিরে যেতে হবে দিল্লীতে? তাছাড়া আর উপায় কী? পাইলটেরা ভাবে, মিছিমিছি এতখানি পেট্রোল নষ্ট হবে, কোনো কাজ না করে ফিরে যাবো, সে কেমন কথা। তার চাইতে—। মিনিট দুই ভেবে নিয়ে এক পাইলট বেতার টেলিফোনে অন্য পাইলটকে জিজ্ঞাসা করে, "শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমে একবার খোঁজ নিলে হয় না?"

দ্বিতীয় জন জবাবে বলে, "তা হয়, কিন্তু বড় সাহেবরা যে বলেন,—স্পিটফায়ার নামতে পারে না সেখানে।"

"সাহেবরা যাই বলুন আমি কিন্তু আমার বিমান নিয়ে ঠিক নামতে পারি ঐ রানওয়ের উপরে।" বলল প্রথম পাইলট।

"দ্বিতীয় জন বলে, "আমিও।"

"তবে এস, জয় হিন্দ বলে নামা যাক শ্রীনগরে।"

যেই কথা সেই কাজ। রেডী? ওয়ান, টু, থ্রী, ডাউন! হুশ, হু-উ-শ্।

একের পর এক, দুটি স্পিটফায়ার বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ ও ফ্লাইং কন্ট্রোলের কর্মচারীদের অবাক করে দিয়ে নির্বিঘ্নে নেমে পড়ল শ্রীনগরের ছোট রানওয়ের উপর। ভুলের ফলেই ফলল সুফল। বিমানঘাঁটি থেকে পাইলটেরা ম্যাপের উপর লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিল লড়াই-এর সীমানা। আবার উঠল আকাশে। শত্রুপক্ষের মাথার উপর গুলিবৃষ্টি করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে গেল দিল্লীতে।

বিমান শাস্ত্রের বিধানে যা ছিল এতকাল অসম্ভব, তাই সম্ভব করল অসম সাহসিক দুটি ভারতীয় তরুণ। তাদের গর্বে ভরে উঠল তাদের সহকর্মীদের বুক। তাদের বীরত্বে উজ্জ্বল হলো সমস্ত ভারতবাসীর মুখ।

পরদিন শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নতুন দপ্তর খোলা হলো ভারতীয় বিমানবাহিনীর। দিল্লী থেকে এসে পৌছল অনেকগুলি স্পিটফায়ার। সেই সঙ্গে এল, ক্রু, ফিটার, মেকানিক, গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়র, পাইলট অফিসার ইত্যাদি বিমান বহরের কর্মচারী দল। তাদের মালপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। অধিনায়ক হয়ে এলেন গ্রুপ ক্যাপটেন মেহের সিং, ডি· এস· ও।

বিমান বাহিনীর সহায়তায় ব্রিগেডিয়র সেনের সেনাদল মহুরা থেকে রওনা হলো হানাদারদের

সন্ধানে। আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গলে ছোটখাটো শত্রুদল যা লুকিয়ে ছিল, তারা সাবাড় হয়ে গেল ভারতীয় সৈনাদের বন্দুকের গুলিতে। কিন্তু আসল বড় দলটা তখনও অনেক দূরে। তাকে ধরতে হলে জোরে পিছু ধাওয়া করতে হবে।

কিছু দূর এগোতেই দেখা গেল সামনে গভীর ও চওড়া বিরাট এক নালা। তাতে পাহাড়ের ঝরনা থেকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তীর বেগে। গাড়ি পার হওয়ার উপায় নেই। পাথরে বাঁধানো শক্ত পুলটিকে হানাদারেরা বারুদ জ্বালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে অনেক আগেই।

ডাক পড়ল এঞ্জিনীয়রদের। তাঁরা বললেন, নতুন করে সেতু গড়তে চাই ভারী ভারী মাল-মশলা, তা এখন দুর্ঘট। আর চাই যথেষ্ট সময়। তার এখন অভাব।

কোনো কিছুতেই হাল ছাড়ার পাত্র নন ব্রিগেডিয়র সেন। বললেন, "গাড়ি জীপ, ট্রাক, লরী, থাক পড়ে এখানে। শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে হবে পায়ে হেঁটে। দখল করতে হবে উরি যেমন করে হোক।"

সৈনারা সেলাম করে বলল, "জো হুকুম।"

পায়ে হেঁটেই তারা তাড়া করল হানাদারদের। বীর দর্পে দখল করল উরি। চৌদ্দই নভেম্বর তিন সপ্তাহ আগে হানাদারদের রুখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিং ঠিক সেইখানেই উঁচু এক মঞ্চের উপর ব্রিগেডিয়র এল· পি· সেন সর্বপ্রথম উত্তোলন করলেন অশোক চক্র আঁকা গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙের নিশান। স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা।

সবার কণ্ঠে উঠল উচ্চ রব, "জয় হিন্দ।" "স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি।

সৈন্যদলের ব্যাণ্ডে বাজতে লাগল, "জন গণ মন অধিনায়ক—।" স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। উরিতে সে সঙ্গীত এই প্রথম শোনা গেল।

দশ

উরির জয়ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কিন্তু এল নতুন দুঃসংবাদ। জম্মু থেকে।

জম্মু আর লাডাক,—দুই দিকে দুই পৃথক প্রদেশ, মাঝখানে তার কাশ্মীর, এই তিন নিয়ে মহারাজ হরি সিং-এর রাজ্য। জম্মুর প্রায় গায়েই পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহর আর সেনানিবাস,—শেয়ালকোট, ওয়াজিরাবাদ ও মারি। সেখান থেকে হানাদারেরা করেছে আক্রমণ। এরই মধ্যে দখল করে নিয়েছে অনেকখানি এলাকা। খুন, লুঠ আর জখমের তো কথাই নেই।

কাশ্মীর প্রদেশে আক্রমণকারীরা সবাই ছিল বাইরের লোক। তাদের ঠেকানো সহজ। জম্মুতে দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু স্থানীয় মুসলমান। তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ। সব চেয়ে মারাত্মক। সদরি ইব্রাহিম খাঁ তাদের নেতা।

জম্মুতে মহারাজ হরি সিং-এর অধীনে পুঞ্চে ছিলেন এক মস্ত জায়গীরদার। তাঁর উপাধি রাজা। রাজার মতোই তাঁর প্রতাপ। রাজার মতোই তাঁর দান ও দাক্ষিণ্য। ইব্রাহিম এই রাজারই প্রজা। ছাত্রকালে সে ছিল মেধাবী। খুশি হয়ে পুঞ্চের রাজা নিলেন তার লেখাপড়ার ভার। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে বিলাত। রাজার অর্থে ব্যারিস্টর হয়ে ইব্রাহিম ফিরে এল জম্মুতে। সেখানে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। দু'দিনেই তাদের নেতা হয়ে বসল নতুন ব্যারিস্টার।

ততদিনে পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের প্রসার জমে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক ঝড়ো হাওয়ায় হিন্দু-বিদ্বেষের পাল তুলে দিয়ে তারা ভাসিয়েছে দুই জাতিতত্ত্বের তরণী। তাই দেখে চতুর হিন্দু ইব্রাহিমের মাথায় গজাল দুর্বুদ্ধি। আরও অনেক সুযোগ-সন্ধানীর মতো সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চেপে বসল সে নৌকায়। যে রাজার টাকায় হয়েছে মানুষ তাঁরই বিরুদ্ধে শুরু করল ষড়যন্ত্র। কুৎসিত কৃতঘ্নতার এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই আছে ইতিহাসে।

দুরাত্মার যেমন ছল, দুষ্কর্মেরও তেমনি সহযোগীর অভাব হয় না কোনোদিনই। ইব্রাহিমের জুটল দোসর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী। আব্দুল কৈয়ামুম খান। তাঁর

বর্ণ-বিবর্তনের কাহিনী'ও কম চমকপ্রদ নয়।

গোড়াতে কৈয়ামুম ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম সাবিতে কংগ্রেসী দলপতি ভুলাভাই দেশাই-এর পাশেই ছিল তাঁর আসন। তখন ইংরেজের সমালোচনা করতেন কঠোর ভাষায়। সাম্প্রদায়িকতাকে বলতেন বিষ। দেশনেতাদের য়্যালবামে থাকতো তাঁর ছবি। স্বদেশী সভা সমিতিতে শোনা যেত তাঁর ভাষণ।

হঠাৎ একদিন তাঁর মতি হলো বদল, গতি হলো বিপরীত। যোগ দিলেন মুসলীম লীগে। রাতারাতি কংগ্রেসকে গাল দিতে লাগলেন এলোপাতাড়ি। গান্ধীকে বললেন,—ভণ্ড। নেহরুকে—গোঁয়ার। আর প্যাটেল? সে তো সাক্ষাৎ শয়তান, মুসলমানদের পয়লা নম্বর দুশমন।

কংগ্রেসের নেতারা তখন সবাই আমোদনগরে আগা খানের বাড়িতে বন্দী। তাঁরা পুরানো সহকর্মীর কীর্তি দেখে অবাক হয়ে ভাবেন, এ কী অঘটন!

কথায় বলে, জাতি শত্রু বড় শত্রু, ভাই শত্রু মহাকাল। দলত্যাগীরাই হয় কালাপাহাড়। ভারতবর্ষের প্রতি আব্দুল কৈয়ামুম খানের রাগটাই যেন সব চেয়ে প্রচণ্ড। কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছে পেশোয়ারে, মূল পরিচালনাও সেখান থেকেই। সব কিছুরই পিছনে ছিল কৈয়ামুমের হাত। সদারি ইব্রাহিম খান যোগাযোগ রাখল তাঁর সঙ্গে। অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করে করল বিদ্রোহ। বলল, "রাজা, মহারাজা মানিনে। আমরা নতুন সরকার গড়েছি। তার নাম,—আজাদ কাশ্মীর।"

মীরপুর, পুঞ্চ, নৌশেরা ও রাজৌরীতে ছিল মহারাজ হরি সিং-এর ছাউনি। কিন্তু সেগুলিতে সৈন্য সংখ্যা যেমন অল্প,অস্ত্র-শস্ত্রও তেমনি অপ্রচুর। তার উপরে সেখানে ভিড় করেছে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বহু হিন্দু ও শিখ শরণার্থী। অগণিত আহত ক্লান্ত ও সর্বস্বান্ত নরনারী। তাদের ক্ষুধার অন্ন আর বাসের ব্যবস্থাই দুরূহ। হানাদারেরা চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল এই ঘাঁটিগুলিকে।

খবর পেয়ে ভারত সরকার সৈন্য পাঠালেন পুঞ্চের পথে।

কিন্তু পথ বলি তাকে কী মুখে? গহন ঘন বনের মাঝে এঁকে-বেঁকে গিয়েছে কোনোমতে পায়ে চলার সরু রেখাটি। তাই বেয়ে আট হাজার ফুট উঁচু হাজি পীরের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে বহু কষ্টে পুঞ্চের ছাউনিতে এসে পৌঁছলেন ব্রিগেডিয়র প্রিতম সিং ও তাঁর এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য।

সেখানে সমস্যা খাদ্য। ওৎ-পাতা বাঘের মতো সহস্র সহস্র হানাদার ঘিরে বসে আছে শহরের সর্বদিক। সাধ্য কী যে তাদের এড়িয়ে বাইরে থেকে আসবে চাল ডাল তেল বা নুন। ভিতরে গৃহস্থদের গোলায় আর পাটোয়ারীদের আড়তে শস্য যা' ছিল তা' এসেছে ফুরিয়ে। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর এক মাত্র উপায় বিমান। কিন্তু বিমান নামবে কোথায়? ছাউনিতে সৈন্য যারা আছে তারা হানাদারদের দূরে ঠেকিয়ে রাখতেই হিমশিম। বিমান অবতরণের রানওয়ে গড়বে কখন? প্রিতম সিং ভেবে কূল পান না।

পুঞ্চে শরণার্থীদের মধ্যে ছিল এক হিন্দু ছুতোর। একদিন সে এসে হাজির হলো প্রিতম সিং-এর দপ্তরে। ব্রিগেডিয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। আরদালী চাপরাসীরা প্রথমে হাঁকিয়ে দিতে চায়। শেষটায় অনেক বিনতি মিনতিতে মন নরম হলো তাদের। নিয়ে গেল প্রিতম সিং-এর সামনে।

বৃদ্ধ সেলাম করে বলল, "হুজুর আমাকে কাজে লাগান।"

ব্রিগেডিয়র জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি বুড়ো মানুষ, কী কাজ করবে?"

বুড়ো উত্তর দেয়, "হাওয়াই জাহাজের জমি তৈরী করব।"

প্রিতম্বু-সিং অবাক হয়ে বলেন, "রানওয়ে? তুমি তার কী জান?"

বুড়ো বলে, "হুজুর কিছুই জানিনে, শুধু খাটতে জানি। আপনার এঞ্জিনীয়রেরা বানাবে নক্সা, রাজমিস্ত্রীরা গাঁথবে ইট। আমি মোট বয়ে যোগাবো মাটি, জল, চুন, সুরকী ও সিমেন্ট।"

প্রিতম সিং-এর সন্দেহ ঘোচে না। বলেন, "সে কী কথা! তোমার এই অশক্ত শরীরে সে পরিশ্রম সইবে কেন?"

ছুতোরের চোখের কোণে জল দেখা দিল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, "মালিক, এই শক্ত হাড়গুলি অনেক সয়েছে। আমার জোয়ান দুই ছেলে মারছে বাঞ্জারাদের হাতে, একমাত্র মেয়ে হয়েছে নিখোঁজ। কপা স্ত্রীর হাত ধরে রাত্রির অন্ধকারে পায়ে হেঁটে এসেছি পাঁচ ক্রোশের পথ। আর ক'টা দিন বাঁচব ? কোন সুখেই বাঁচন ? মরার আগে যদি বিমানখানি তৈরীর কাজে কিছু মদত দিতে পারি তবে জানব আমার জিন্দগী সফল।"

বৃদ্ধকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না।

পরদিন ভোরবেলা অনেক লোকের হট্টগোলে ঘুম ভাঙল প্রিতম সিং-এর। জানালায় তাকিয়ে দেখেন, প্রায় হাজার দুই শরণার্থী। যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ। ব্যাপার কী ? সবাই রানওয়ে তৈরীর কাজে লাগতে চায়। বলে, "বুড়ো ছুতোর যদি পারে মোট বইতে, আমরা কি এতই অধম।"

অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু হয়ে গেল রানওয়ের। ঝোপ-ঝাড় কেটে জমি হলো সাফ, দুবমুশ যারা, তারাও সাহায্য করল নানা ভাবে। সমর্থ লোকেরা কাজে চলে গেলে তারা কেউ আগলাল পড়শীদের ঘর সংসার, কেউ সামলাল তাদের ছেলেমেয়ে। এক মাসের কাজ সারা হলো এক সপ্তাহে। পুঙ্কের অবরুদ্ধ অধিবাসীদের জন্যে আকাশপথে আসতে লাগল নিত্যকার খাদ্যসামগ্রী।

হানাদারেরা ভেবেছিল, অনাহারের চাপে ছাউনির লোকেরা হার মানবে দু'দিনেই। তার আর সম্ভাবনা রইল না। অনেক শলা-পরামর্শের পর তারা তখন নিয়ে এল বড় এক বিলাতী কামান। তিন পয়েন্ট সাত হাউইটজার। পাহাড়ের উপর থেকে গোলা ফেলতে লাগল ঠিক একেবারে রানওয়ের উপর। বাধ্য হয়েই বিমান অবতরণ বন্ধ হলো সেখানে।

খাদ্যাভাব দেখা দিল শহরে। রেশনের মাপ কমিয়ে দিয়ে চলে কিছু কাল। সেনাবাহিনীর লোকেরা নিজে কম খেয়ে শিশুদের খাবার যোগাল আরও কিছু দিন। তার পর ?

প্রিতম সিং তার সিগন্যালারদের ডেকে বললেন, "এ অসহ্য ! পাহাড়ের উপরে শত্রুপক্ষের কামানটাকে ঠাণ্ডা না করলেই নয় ! বেতারে খবর পাঠাও সদর দপ্তরে। গোটা কয়েক দুর পাল্লার কামান পৌঁছে দিক এই ছাউনিতে। বাকী ভার আমাদের।"

খবর পাঠানো যত সহজ, কামান পাঠানো তত নয়। তবুও সদর দপ্তরের কর্তারা বললেন, "চেষ্টা করতে দোষ কী ?"

পঁচিশ পাউন্ডার গোটা কয়েক কামান, গোলা বারুদ আর জনকয়েক গোলন্দাজ নিয়ে একদিন দুপুর বেলা রওনা হলো বিমান বাহিনীর তিনখানা ডাকোটা। এয়ার কমোডোর মেহের সিং তখন কাশ্মীরে বিমান বাহিনীর কর্তা। তিনি ভাবলেন, এমন বিপজ্জনক কাজে পাইলটদের একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জেনারেল কুলবন্ত সিং সেখানে সেনাবাহিনীর অধিকর্তা। তিনিও সঙ্গ নিতে চান। দু'জনে চেপে বসলেন একখান হাওয়ার্ড বিমানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারখানা বিমান এসে পৌঁছল পুঙ্কে। প্রথম ডাকোটাখানা যেই নামতে যাবে মাটিতে অমনি পাহাড় থেকে হানাদারদের হাউইটজারটা গর্জে উঠল গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে। বাজ পড়ার আওয়াজে একটা বড় গোলা ফেটে পড়ল ডাকোটার গা ঘেঁষে। বুঝি এক চুলের জন্য বেঁচে গেল ডাকোটার ডান দিকের ডানাটা। মেহের সিং বুঝলেন, চেষ্টা নিরর্থক ! এ ক্ষেত্রে বিমান-অবতরণ আত্মহত্যারই সামিল। বেতারে হুকুম দিলেন। সব বিমানগুলি ফিরে গেল সদর দপ্তরে। পুঙ্কের ছাউনিতে শরণার্থীরা হতাশচিত্তে ফেলল দীর্ঘ নিঃশ্বাস। পাহাড়ের উপরে হানাদারদের ঘাঁটিতে উঠল হর্ষধ্বনি।

মেহের সিং-এর মাথায় ফন্দি খেলে অনেক। সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাছাবাছা পাইলটদের ডেকে বললেন, "বন্ধুগণ, যে কাজ শুধু বলে হয় না, সে কাজ হয় কৌশলে। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে আমাদের।"

তিনি খুলে বলেন তাঁর মতলব। শুনে পাইলটরা সবাই মহাখুশি। তারা বয়সে তরুণ, নতুনত্বের নামে মেতে ওঠে, বিপদের ঝুঁকিতে হয় আরও বেশী বেপরোয়া।

পুঙ্কে সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। আধেক আলো, আধেক ছায়া আবছা কুয়াশার মতো ঘিরে রয়েছে দূরে শালবনের সারি আর শালিধানের

ক্ষেত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লেগেছে নিঝুম নীরবতার রেশ, ঘুম জড়িয়ে এসেছে বুঝি বনলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ আনত দুটি নয়নের শ্যামল আঁখিপল্লবে।

অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এল মেঘ গর্জন। না, মেঘ নয়, বিমান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর খান কুড়ি বিমান এসে পৌঁছল পুঞ্চের আকাশে। তার প্রথমটিতে পাইলট স্বয়ং মেহের সিং।

হানাদারদের গোলন্দাজরা তাড়াতাড়ি গোলাবারুদ বোঝাই করল কামানে।

কিন্তু এ কী? বিমানগুলি কেবলই চক্রাকারে ঘুরছে আকাশে। মাটিতে নামছে না তো! হানাদারেরা ভেবে পায় না এর অর্থ। স্পষ্ট দেখা যায় না সবগুলি, গুণে বোঝা যায় না তাদের সংখ্যা।

এই দেখা-অদেখা আর বোঝা-না-বোঝার সুযোগে আধা-আলো আধা-অন্ধকারের আড়ালে হঠাৎ হুশ করে নেমে পড়ল একখানা ডাকোটা। প্রিতম সিং-এর লোকেরা আগেই তৈরী হয়ে ছিল বিমানঘাঁটির ভিতরে। তারা চক্ষের পলকে হাতে হাতে নামিয়ে ফেলল বিমান থেকে মাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটি আকাশে উড়ে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল অন্যান্য বিমানগুলির সঙ্গে। বাকী বিমানগুলির ঘোরা-ফেরা আর পাখার গর্জনে দূর থেকে ব্যাপারটা কারো চোখে পড়ল না।

এক, দুই, তিন। একে একে ডাকোটাগুলি নামল মাটিতে। একে একে সাজ-সরঞ্জাম খালাস করে দিল শত্রুর অলক্ষে। একে একে ঝাঁকের পাখির মতো আবার উড়ে মিশে গেল দলে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বিমান বাহিনী নিয়ে মেহের সিং বিজয় গর্বে ফিরে গেলেন তাঁর সদর আস্তানায়।

পাহাড়ের উপর হানাদারেরাও মহাখুশি। হিন্দুস্তানের হাওয়াই জাহাজগুলি নামতেই সাহস করল না পুঞ্চে। কাফেরগুলি ভয় পেয়েছে খুব। বিলকুল ডরকে মারে ভাগ গয়া, হাঃ হাঃ হাঃ।

তাদের হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরদিন ভোর হতে না হতেই শুরু হলো পুঞ্চের ছাউনি থেকে পঁচিশ পাউন্ডারের গোলা বর্ষণ। যেমন তার পাল্লা, তেমন তার আওয়াজ, আর তেমনি তার তেজ। হানাদারেরা তখন কামান বন্দুক সাজ-সরঞ্জাম ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পায় না।

এগারো

পুঞ্চ রক্ষা পেল, কিন্তু উদ্ধার হলো না। দুর্গ শত্রু হলো, মুক্ত হলো না। হানাদারেরা আগের ভাগেই দখল করে বসেছিল নৌশেরাও তার আশেপাশের গ্রাম। ঘাঁটি করেছিল পাহাড়ের মাথায়। সেগুলি পুঞ্চের সেতুমুখ। সেখান থেকে তাদের হটাতে না পারলে পুঞ্চ উদ্ধার করা কঠিন।

কঠিন কাজের জন্য চাই কঠিন পণ। সেই পণ ছিল ব্রিগেডিয়র ওসমানের। পঞ্চাশ নম্বর প্যারা ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন ঝানগড়ে। সেটা নৌশেরারই কাছাকাছি। হানাদারেরা সেখানে মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ করেছে প্রবল বেগে। ভারতীয় সৈন্যরা তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় ওসমানের পৈতৃক বাস। বেনারসে হরিশ্চন্দ্র কলেজ থেকে ম্যাট্রিক ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করে যান বিলাতে। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। স্যান্ডহার্স্টের তিনিই শেষ ভারতীয় শিক্ষার্থী।

অতি তরুণ বয়সেই ওসমানের স্বভাবে ছিল অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। এক জাতীয় লোহা আছে যা ভাঙা যায় কিন্তু বাঁকানো যায় না। তার সঙ্গে বুঝি ওসমানের মিল ছিল। আর ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ। সজাগ এবং সুতীক্ষ্ণ। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এক মুসলমান নেতা বিলাতে এক ভোজ-সভায় বসেছিলেন ওসমানের ঠিক ডাইনে। নাম শুনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বললেন, "ও, আপনি জাতিতে মুসলমান? আমিও তাই। বড়ই সুখের..."

বাধা দিয়ে ওসমান বললেন, "আমি জাতিতে ভারতীয়। হ্যাঁ, ধর্মের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তো বলবো,—ইসলাম।"

নেতা সাহেবের মুখের আধখানা কথা রইল মুখে। সমুখের প্লেটে খাবারও আর তেমন রুচিকর বোধ হলো না।

ভারত বিভাগের সময় ওসমান ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মূলতানে। সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার বহু দৃশ্য দেখেছিলেন স্বচক্ষে। বহু বিপন্ন শিখ ও হিন্দুকে রক্ষা করেছেন স্বহস্তে। বুঝি তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। গান্ধী-হত্যার পরদিন থেকে ওসমান মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়ে হয়েছিলেন নিরামিষাশী।

ব্রিগেডিয়র ওসমান যে-দিন ঝানগড়ে সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে এলেন, তার দু'দিন পরেই ঘটল ভারতীয় বাহিনীর পরাজয়। তাদের পিছনে হটে আসতে হলো কয়েক মাইল। অন্য কেউ হয় তো মুষড়ে পড়তো এই প্রাথমিক বিফলতায়। ওসমানের বাড়ল জেদ। ভবিষ্যতে পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রমে ভরে তুললেন গোলাগুলি আর রসদের ভাণ্ডার। গড়ে তুললেন স্থানীয় বালকদের নিয়ে এক অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নিখুঁত করলেন খবর আনা-নেওয়ার সিগন্যালিং ব্যবস্থা। নিজ সহকর্মী ও সেনাবাহিনীকে দিলেন আশা ও আশ্বাস। তাদের মনে জাগিয়ে তুললেন প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা।

প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন কোট। সামান্য একটি পাহাড়ী গ্রাম। কিন্তু অসামান্য তার সামরিক গুরুত্ব। নৌশেরা, ঝানগড়, রাজৌরী ও পুঞ্চের সড়কগুলি মিলেছে এসে ঐখানে।

কোটের পরেই দখল করলে, নৌশেরা।

হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই প্রমাদ গণল। বড় কর্তারা চটে মটে কোটের সর্দারকে করলেন বরখাস্ত, নৌশেরার সেনাপতিকে করলেন কয়েদ। নতুন অধিনায়কের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পাঠালেন যুদ্ধে। হুকুম করলো , আবার দখল করা চাই হারানো এলাকাগুলি। যে হেরে পালিয়ে আসবে তার যাবে গর্দান। হয় নৌশেরা, নয় তো শির।

মরীয়া হয়ে হানাদারেরা নিশুতি রাতে আক্রমণ করল নৌশেরা। দক্ষিণ,পুব আর উত্তর—তিন দিক থেকে তিন তিনটে বাহিনী। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনেরো হানাদার। সঙ্গে তাদের বিলাতী রাইফেল, মাঝারি ও হাল্কা মেশিনগান, মর্টার ও গ্রেনেড। আধুনিক সামরিক পদ্ধতিতে আক্রমণের রকম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, যুদ্ধের আসল পরিচালক কারা, কারা আছে কাশ্মীর হামলার পিছনে।

প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে বাধা দিল এই বিশাল শত্রুতরঙ্গ। হানাদারদের লক্ষ্য,—যে করেই হোক আবার দখল করবে নৌশেরা। ভারতীয় বাহিনীর পণ,—যে করেই হোক রক্ষা করবে নৌশেরা। কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন কঠোর ও এমন ভীষণ যুদ্ধ আর ঘটেনি। দু' দলই করেছে জান্ কবুল। যেন দংশনক্ষত শোন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের সেনাদলকে দিতে লাগলেন নির্দেশ। যেখানে দেখেন বিপদের একটুখানি আভাস, সেখানেই যান তিনি।

রাত শেষ হলো। যুদ্ধ শেষ হলো না। কাটল দুপুর। তবু যুদ্ধের বিরাম নেই। বেলা গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য নামলো পটে। তখনও চললো হানাহানি।

হানাদারদের শক্তি শৌর্যে নয় সংখ্যায়। একজনকে নিকাশ করলে থাকে আরও এগারো জন। এই সংখ্যার জোরেই তারা ভারতীয় বাহিনীকে করল বিপন্ন। পঞ্চাশ গজের মধ্যে এগিয়ে এল। ক্রমশঃ কাছে। কাছের চাইতেও কাছে। আরও বেশী কাছে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান গোড়াতেই বুঝেছিলেন, শত্রুসংখ্যা অগুণতি। তাঁর নিজের বাহিনীর চতুর্গুণ। তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন পিছনের ঘাঁটিতে। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন আর মুহূর্ত গোণেন। কতক্ষণে এসে পৌছবে নতুন সৈন্যদল ? ততক্ষণ যুঝতে পারবে তো তাঁর নিজের বাহিনী ? রুখতে পারবে তো দুশমনকে ?

বারে বারে ঘড়ি দেখছেন ওসমান। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গেই পাল্লা তাঁর আর তাঁর সেনাবাহিনীর।

কাঁটা যত এগিয়ে যাচ্ছে তত বাড়ছে আশঙ্কা, তত কমছে জয়লাভের আশ্বাস।

অবশেষে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল আরও নিকটে। একেবারে ঘাড়ের উপরে। ওসমান অধীর হয়ে তাকাচ্ছেন ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে। সৈন্য, আরও সৈন্য চাই এই মুহূর্তে। কিন্তু কোথায় পাবেন সৈন্য? দেখলেন ছাউনির কারখানা ঘরে এঞ্জিনীয়রেরা করছে যন্ত্রপাতি মেরামত। হাঁক দিয়ে বললেন ব্রিগেডিয়র, "যেখানে যে আছো বন্দুক নিয়ে চলে এসো সমুখের সারিতে। কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখ শত্রুকে।"

যাঁরা এঞ্জিনীয়র ছিলেন তাঁরা হাতুড়ি ফেলে হাতে তুলে নিলেন হাতিয়ার,

সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের কাজ রসদ যোগানো। তারা থাকে আসল যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছনে। তাঁদেরও নামতে হলো যুদ্ধে।

ব্রিগেডিয়র ঘূর্ণির মতো ঘুরছেন তাঁবুতে তাঁবুতে। যাকে সামনে পান তাকেই যুদ্ধে পাঠান। "তুমি কে? রাঁধুনি? এখন রান্না থাক পড়ে। লড়াই কর। তুমি? মশালচি? কুচ পরোয়া নেই, হানাদারদের রোখো।"

যে লোকটা চিরকাল হিসাবের খাতা লেখে, খড়ি রেখে খাঁড়া ধরতে হলো তাকেও। "সৎ শ্রী আকাল!"

পিছন থেকে শোনা গেল বহু কণ্ঠে শিখদের রণ-হুঙ্কার। নূতন সৈন্যদল এসে পৌঁছেছে এতক্ষণে। ইস, আর একটুখানি, বুঝি পাঁচ মিনিট দেরি হলেই শেষ হয়ে যেত সব। নির্মূল হয়ে যেত ওসমানের সৈন্যদল। ফাঁড়া কেটে গেল যেন। যেন প্রায় কানের উপর দিয়ে গেল কোপ।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গেই এল ভারতীয় বিমান বাহিনীর খানকয়েক বোমারু বিমান। মাটিতে শিখ-সৈন্যের আক্রমণ আর আকাশে বোমারু বিমানের গুলিবর্ষণ। এ দু'-এর সামনে হানাদারেরা টিকে থাকবে কতক্ষণ?

সহস্র সহস্র হানাদারদের মৃতদেহ পড়ে রইল মাঠে, পথে, পাহাড়ের গায়ে, যেখানে সেখানে। ভারতীয় সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হলো দূর ও নিকটের গিরিকন্দর। নৌশেরার যুদ্ধ হলো সারা। যে-পথ দিয়ে শত্রু এসেছিল, সে-পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

শুরু হলো নতুন অভিযান।

নৌশেরা থেকে ঝানগড়। পথে পড়ল গায়কোটের বন। শত্রুর চক্ষু এড়াতে ভারতীয় বাহিনীকে এগোতে হলো অতি সাবধানে। ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। কখনও দৌড়ে, কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা কেবল বুকে চলে।

সৈন্যদল নিয়ে ওসমান পৌঁছলেন পৃথল পাহাড়ের সানুতে। শিকার-সন্ধানী নেকড়ে বাঘের মতো গোপনে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। সবাই লুকিয়ে রইলেন বড় গাছের আড়ালে আবডালে।

হানাদারেরা অনেক দিন থেকেই ঘাঁটি গড়েছিল এই পাহাড়ে। উঁচু চূড়ার উপর বসিয়েছিল হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরেছিল চার পাশ। যেখান দিয়ে পাহাড়ের ওঠার পথ, সেখানে ছিল সঙ্গীনধারী কড়া পাহারা।

পশ্চিমে আকাশে প্রদোষের ক্ষীণ আলো যখন গেল মিলিয়ে, শিশু গাছের মাথায় নামলো প্রথম অন্ধকার, শেয়ালকাঁটার বনে ঝিঁঝি পোকারা সমস্বরে ধরলো তান, তখন আচম্বিতে একজন ভারতীয় সেপাই একটা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রথম পাহারাওয়ালার ঘাড়ে। শক্ত মুঠিতে গলা টিপে নিমেষে সাবাড় করলো তাকে। টুঁশব্দটি করার অবকাশ পেলে না বেচারা। দ্বিতীয় প্রহরী ছিল খানিকটা দূরে। আর একজন সৈন্য গুটিগুটি এসে তাকে পিছন থেকে পিঠে বসিয়ে দিল ঝকঝকে ধারালো ছুরি। সামান্য একটু গোঙানি শব্দ শোনা গেল। তার পরেই সব নীরব, নিশ্চল। আল্লার নাম নেওয়ারও সময় মিললো না হতভাগার।

বাকী সৈন্যরা সব তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সামনে। যেন আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে পাষাণের বুক চিরে দেখা দিল দৈত্যদল।

হানাদারেরা এমন অকস্মাৎ আক্রমণের জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না। কিছুক্ষণ বাধা দিয়েই দেখালো পিঠ। ভারতীয় বাহিনী ঘাঁটি দখল করে দেখে, অস্ত্রশস্ত্রের তো কথাই নেই, জামা, জুতো ফেলে গিয়েছে অনেকে। রসুই ঘরে পড়ে আছে দিস্তা দিস্তা গরম চাপাটি, গামলা-ভরা সুরুয়া আর

ডেকচি-ভরা বকরীর গোস্ত। আহা রে! বাছারা পালাবার তাড়ায় বাবরগুলি মুখে দেওয়ার সময় পায়নি এতটুকু!

ঝানগড়ের ঝাড়াচকে আবার উঠতে লাগল ভারতীয় নিশান। গ্যাসের আলো জ্বেলে সেই রাত্রিতে সেখানে হলো সমুদয় বাহিনীর পংক্তি ভোজন। নাচ, গান, হৈ-হল্লা—বিজয়ের আনন্দোৎসব। ঠিক দু'মাস পঁচিশ দিন পরে ব্রিগেডিয়র ওসমানের ঘরে প্রথম বিস্তান হলো খাটিয়ার উপরে। রাজপুত প্রতাপ সিং-এর মতো তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন ঝানগড় উদ্ধার না হবে শত্রুর হাত থেকে, ততদিন ঘুমোবেন মেঝেতে।

নৌশেরা ও ঝানগড় যেন দেউড়ির দুই গম্বুজ, দরজার দুই পাটি। হাতছাড়া হওয়ায় প্রতিপক্ষ পড়ল বিপাকে। পাকিস্তান থেকে রসদ, অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহের রাস্তাগুলি পড়ল ভারতীয় কামানের পাল্লায়। হলো ভারতীয় গোলন্দাজদের সহজ নিশানা। বাঙের টেক্কার মতো ঝানগড়ের ছাউনি যার হাতে, তারই হবে জিৎ। তাই দূর থেকে হানাদারেরা মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ করতে লাগল ঝানগড়ের উপরে।

জুলাই মাসের আরম্ভ। সেদিন চার তারিখ। রাত্রিবেলা ঝানগড়ে শুরু হলো শত্রুর বোমাবৃষ্টি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত—কোনো দিকেই রইল না ফাঁক। দুম, দাম, দড়াম। মুহুর্মুহুঃ বোমা পড়তে লাগল ভারতীয় ছাউনির উপরে। কালীপূজার রাত্রিতে শতশত উড়ন তুবড়ি আর হাউই বাজির মতো আকাশের বুকে খেলছে শুধু আগুনের হল্লা।

সকল সংকটে নিজ সৈন্যের পাশে এসে দাঁড়ান ব্রিগেডিয়র ওসমান। সেদিনও সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তিনি আসা যাওয়া করেছিলেন এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন সবাকার। এমন সময় একটা বোমা ফেটে পড়ল তাঁর সামনে। একেবারে গায়ে বললেই হয়।

ছাউনীর ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীর দল করল-প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু তাঁরা তো ওষুধ দিতে পারেন। প্রাণ দিতে পারেন না। রাত্রিশেষে আকাশের তারাগুলি যখন একে একে গেল নিবে, চাঁদ ঢাকা পড়ল পাহাড়ের আড়ালে, তখন ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে মিশে গেল ব্রিগেডিয়র-ওসমানের শেষ নিঃশ্বাস। ঝানগড়ের ছাউনিতে কঠিন সৈনিকেরও চোখ হলো ছলোছল। খবর পেয়ে পাকিস্তানে উঠল আনন্দরোল। পেশোয়ারে হানাদারদের শিবিরে হলো দীপালী।

পুষ্পস্তবকে সাজিয়ে বীরের মৃতদেহ বিমানযোগে নিয়ে আসা হলো খয়া দিল্লীতে। সেখানে হিন্দু, শিখ, খ্রীস্টান, পারসিক ও মুসলমানেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়িয়ে দিল শবাধারে। জাতীয় পতাকায় ঢেকে কামানের গাড়িতে হলো পূর্ণ সামরিক সম্মানে শবযাত্রা। শবানুগমন করলেন স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন সর্বাধিক্ষ্য ও অন্যান্য সেনানায়ক, মন্ত্রিসভার সমুদয় সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু। পথের দু'ধারে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারী।

স্বাধীন ভারতে এর আগে গান্ধীজির শবযাত্রা ছাড়া আর কারো মৃত্যুতে দিল্লীতে পড়েনি এমন সর্বজনীন বিষাদের ছায়া। ঘটেনি এমন রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানিবেদন।

বারো

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভারতীয় বাহিনীর জয়রথ। তার চাকার তলায় পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ হলো হানাদারদের অভিলাষ, পাকিস্তানের সাধ এবং ষড়যন্ত্র। মুক্ত হলো কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুর বহু শত্রুকবলিত অঞ্চল। গায়ের জোরে কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনা হলো বিফল। শ্রীনগরের রাজভবনে পাকিস্তানী নিশান তোলার স্বপ্ন আর সফল হলো না।

ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল কাশ্মীরে। ব্যবসা-বাণিজ্য আবার চলতে লাগল হাটে বাজারে। আগের মতো স্কুল-কলেজে বসলো ক্লাশ, আপিস আদালতে শুরু হলো কাজকর্ম। ধীরে ধীরে আসতে লাগল বাইরে থেকে দেশ-ভ্রমণকারীর দল। গুলমার্গের গালিচার মতো নরম সবুজ ঘাসের চত্বরে দেখা দিল ক্যাডির কাঁধে গলফের ব্যাগ চাপিয়ে পুরু টুইডের প্লাস-ফোর্স-পরা প্রৌঢ়ের দল। বরফ-জমা পাহাড়ের গা বেয়ে 'শী' করার উদ্দেশ্যে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে

খিলনমার্গের পথে রওনা হলো দুঃসাহসী তরুণ-তরুণীরা। ঝিলমের বুকে হাউসবোটগুলির বন্ধ ঝাঁপি খুলতে লাগল একে একে। শিকারায় কাঠের কারুকাজ, কাগজমণ্ডের সৌখীন কৌটা, আর বুটিদার শালের সওদা সাজিয়ে ফিরিওয়ালার দল ফিরতে লাগল বিদেশী যাত্রীদের দুয়ারে দুয়ারে।

রাজধানীর বিপদ কাটল। কিন্তু রাজার দিন ফুরিয়ে এল রাজত্বের। মহারাজা হরি সিং-এর সিংহাসনে পড়ল টান।

তেরো

রূপকথার রাজপুত্র রাজা হয়, মন্ত্রীপুত্র—সচিব, সওদাগরের ছেলে সপ্ত ডিঙায় সওদা সাজিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যায় বাণিজ্যে।

কাশ্মীরের অধিপতি হরি সিং কিন্তু রাজার পুত্র নয়,—ভ্রাতুষ্পুত্র। বুড়ো মহারাজ প্রতাপ সিং ছিলেন হরি সিং-এর জ্যাঠামশাই। নিজের ছেলে ছিল না। ভাইপোকে তিনি রাজত্ব দিয়ে গেলেন মরার পূর্ব মুহূর্তে। অনেকেই অবাক হয়েছিল :

অবাক হওয়ারই কথা। হরি সিং-এর বাপ অমর সিং ছিলেন মহারাজ প্রতাপ সিং-এর আপন সহোদর। শৈশবে এক মায়ের বুকের দুধ খেয়েছেন, একসঙ্গে করেছেন খেলা, সন্ধ্যাবেলায় একই আইমার কাছে বাঙ্গমা-বাঙ্গমীর গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন পাশাপাশি পালঙ্কে। কৈশোরে এক শিক্ষকের কাছে নিয়েছেন পাঠ, যৌবনে একত্র গিয়েছেন মৃগয়ায়। কিন্তু বড় হয়ে তিনিই হলেন বৈরী। সিংহাসনের লোভে ভাই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল ভাই। প্রতাপ সিংকে সরিয়ে নিজে রাজা হওয়ার চক্রান্ত করলেন অমর সিং। সে-কাহিনী জানতে হলে তাকাতে হবে অনেক পিছনে, একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে পুরানো ইতিহাসের ধুলো-জমা পাতায়।

সে প্রায় একশ বছর আগের কথা। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং তখন শিখ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তার সৈন্যদলে ছিল এক তরুণ সেনানায়ক। ডোগরা রাজপুত গোলাব সিং। যেমন বীর তেমনি চতুর। খুশি হয়ে মহারাজ রণজিৎ সিং তাঁকে দান করলেন জম্মু প্রদেশ। সেনাপতি গোলাব সিং হলেন রাজা গোলাব সিং।

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল জম্মু রাজ্যের সীমানা। গোলাব সিং যোগ করলেন বালটিস্থান, জয় করলেন লাডাক। তাঁর তলোয়ার আর বুদ্ধি, দুই-ই সমান ধারালো। তাঁর বুঝতে দেরি হলো না যে, মোগলরাজ্যের দিন ফুরিয়েছে, আশা নেই শিখ সাম্রাজ্যের, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হবে ইংরেজ। ততদিনে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু ঘটেছে লাহোরে।

উদ্যোগী পুরুষকে সুযোগ দেন লক্ষ্মী, বুদ্ধিমানেরই সহায় হয় ভাগ্য। সীমান্ত যুদ্ধে বিব্রত হয়ে ইংরেজ সাহায্য চাইল গোলাব সিং-এর কাছে। রাজা ইংরেজ সৈন্যদলকে অকাতরে দিলেন অর্থ, দিলেন আহার, দিলেন আশ্রয়। চার বছর পর ইংরেজ শিখ সৈন্য পরাজিত করে লাহোর দখল করল। অমৃতসরের সন্ধিসূত্রে দু'কোটি টাকা দিয়ে রাজা গোলাব সিং পেলেন জম্মুর পাশাপাশি সমুদয় পাহাড়ী এলাকা। তার সীমানা সিন্ধু নদের পূব দিক থেকে রাবি নদীর পশ্চিম তীর অবধি বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে কাশ্মীর আর গিলগিট।

গোলাব সিং নতুন রাজ্যের অধিকার পেলেন কিন্তু দখল পেলেন না। কাশ্মীরের শাসনকর্তা শেখ ইমামুদ্দিন কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। অবশেষে জম্মু থেকে রওনা হলো সৈন্যদল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইমামুদ্দিন মান ল হার। কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজা গোলাব সিং।

গোলাব সিং-এর মৃত্যুর পরে রাজা হলেন তাঁর পুত্র রণবীর সিং। বাপের ধারা বজায় রাখল ছেলে। বহুভাবে সাহায্য করলেন ইংরেজকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য পাঠিয়ে রক্ষা করলেন অনেক ইংরেজপ্রাণ।

কিন্তু দুর্দিনের বন্ধুকে সুদিনে মনে রাখা ইংরেজের স্বভাব নয়। বিপদ কেটে যেতেই ইংরেজ ভুলে গেল ডোগরা রাজবংশের উপকার। ততদিনে বড়লাট ও অন্যান্য ইংরেজ বড়কর্তারা জানতে পেরেছেন কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব। বুঝেছেন, আফগান ও চীন এবং জারের রাশিয়াকে রুখতে

হলে গিলগিটে রাখা চাই ইংরেজ ঘাঁটি। কাশ্মীর হাতছাড়া করে নিজের হাতে নিজেদের স্বার্থ হানি করেছেন,—একথা ভেবে তাঁদের আপসোসের আর শেষ রইল না।

তখন শুরু হল নানা কূটকৌশল। নানা ছলে ইংরেজ কর্তৃত্ব বহাল করতে চাইল কাশ্মীরে। রণবীর সিং-এর বড় ছেলে প্রতাপ সিং নেহাতই নিরীহ মানুষ। রাজা হয়েও জপ, তপ, পূজো-অর্চনা নিয়েই সময় কাটান বেশী। সুযোগ পেয়ে ইংরেজ কাশ্মীরে বসালেন এক রেসিডেন্সী, মানে—নিজেদের এক খবরদারি-আপিস। তার কর্তা হয়ে এলেন স্যার অলিভার সেন্ট জন্—কাশ্মীরের প্রথম রেসিডেন্ট।

কথামালার উট জানতো, জানালা দিয়ে একবার নাক গলাতে পারলে আস্তে আস্তে গোটা ঘরটা দখল করতে দেরি হয় না। সে কৌশল ইংরেজ রেসিডেন্টের অজানা ছিল না। বিশেষ করে রেসিডেন্ট প্লৌডেন লোকটা ছিল যেমন খল, তেমনি ধড়িবাজ। সে মহারাজের দরবারের কাউকে দেখাল লোভ, কাউকে দেখাল ভয়। দু'হাতে ঘুষ দিয়ে একে একে হাত করল কর্মচারীদের অনেককে। মহারাজার রাজস্বমন্ত্রী গোপনে যোগ দিল প্লৌডেনের দলে।

একদিন সকালবেলা মহারাজ প্রতাপ সিং আহ্নিকে বসেছেন। এমন সময় ছোট ভাই অমর সিং এসে বললেন, "দাদা, বাইরে এস ; জরুরী কথা আছে।"

পূজোর আসনে বসে কথা বলা চলে না। মহারাজ ইসারা করে বোঝালেন, আহ্নিক শেষ হতে তখনও কিছু বাকি।

অমর সিং চড়া মেজাজে বললেন, "নিকুচি করেছে তোমার আহ্নিক। পারো তো, আগে রাজা সামলাও, পরে করো পূজো-পার্বণ। নিজের মাথা বাঁচাতে পারলে ঠাকুর দেবতার মাথায় গঙ্গাজল ঢেলো ঘটি ঘটি।"

মহারাজ ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর দালানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী ?"

অমর সিং বললেন, "এখানে নয়। চল শোবার ঘরে।" সাবধানে সমস্ত দোর জানলা বন্ধ করে চুপি চুপি অমর সিং দিলেন সংবাদ। নিদারুণ দুঃসংবাদ।

ইংরেজ রেসিডেন্টের হাতে ধরা পড়েছে অনেকগুলি গুপ্ত চিঠি। সমস্তই মহারাজ প্রতাপ সিং-এর নিজের হাতে লেখা। রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি। রেসিডেন্ট প্লৌডেনকেও গোপনে হত্যা করার চেষ্টায় আছেন মহারাজ।

শুনে মহারাজের দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বললেন, "এ শুধু মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাকে রাজ্যচ্যুত করার চক্রান্ত।"

অমর সিং বললেন, "চক্রান্ত ?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তাই, আর সে চক্রান্তে আছ তুমি।" ছোট ভাই-র দুই হাত ধরে মহারাজ কাতরভাবে অনুনয় করলেন, "ভাই তুমি কাশ্মীরের গদিতে বসতে চাও, আমি জানি। কিন্তু এমন অধর্ম ভগবান সইবেন না, এমন কাজ করো না।"

অমর সিং আমতা আমতা করে বললেন, "আমি—ইয়ে—চক্রান্ত—সে কি কথা—মানে—!" তাঁর মুখে আর কথা যোগাল না। তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন মহারাজার সম্মুখ থেকে।

মহারাজার বুঝতে বাকী রইলো না যে, রেসিডেন্ট প্লৌডেন ও ভাই অমর সিং মিলে তাঁর চারদিক থেকে জাল পেতেছে—বিষম ফাঁদ। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাবেন ভেবে না পেয়ে ফাঁদে আটকে-পড়া শিকারের মতোই তিনি অসহায়ভাবে শুধু ছটফট করতে লাগলেন। অবশেষে মহারাণীকে বললেন, নিজের ভাই যখন শত্রু হয়েছে তাঁর, তখন পরিত্রাণের চেষ্টায় আর কী ফল ? অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক।

সেদিন থেকে অন্ন-জল ত্যাগ করলেন প্রতাপ সিং।

রেসিডেন্ট তৈরী করল এক 'ইরসাদ'। তাতে লেখা, মহারাজ প্রতাপ সিং স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করছেন। রাজ্য সুশাসনের জন্য ভারত গভর্নমেন্ট যেন ব্যবস্থা করেন অবিলম্বে।

মহারাজ প্রথমে অস্বীকার করলেন সেই চিঠিতে সই করতে। কিন্তু অমর সিং ভয় দেখাতে লাগলেন অবিরত। শেষকালে তিন দিন উপবাসে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নিরুপায় প্রতাপ সিং দিলেন

দস্তখত। নিজ হাতে স্বাক্ষর করলেন নিজের বরখাস্ত পরোয়ানায়।

রাজ্য শাসনের ভার নিল এক নতুন মন্ত্রণা পরিষদ। সে পরিষদের সভাপতি হিসাবে তার প্রকাশ্য প্রধান হলেন রাজা অমর সিং। অপ্রকাশ্য কর্তা রইলেন অবশ্য রেসিডেন্ট প্লৌডেন। গিলগিটে দুর্গ তৈরী হলো ইংরেজের। তাতে কামান, বন্দুক নিয়ে জাঁকিয়ে বসলো ব্রিটিশ রেজিমেন্ট,—গোরা সৈন্যদল।

নিজের রাজ্যে নিজ রাজপ্রাসাদে এক কোণে প্রায় বন্দী হয়ে রইলেন অক্ষম, অসহায়, গদিচ্যুত মহারাজ। প্রতাপহীন প্রতাপ সিং।

নিরাশায় নিরানন্দে, তাঁর দিনগুলি মনে হয় দীর্ঘ। মাসের বুঝি শেষ নেই, বছর যেন সংখ্যাহীন, অনাদি অনন্ত। অবশেষে মরীয়া হয়ে মহারাজ নিজ হাতে এক চিঠি লিখলেন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে! সে পত্রের ভাষা অনিপুণ, রচনা অপটু, কিন্তু ভাব সরল ও সুস্পষ্ট। তিনি বললেন, রাশিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কথা আগাগোড়া মিথ্যে। রেসিডেন্ট যে চিঠিগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি সমস্তই জাল। হয় মহারাজকে তার নিজের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হোক, নয় তো বুকের মাঝখানে গুলী করে তাঁকে হত্যা করা হোক। এমন অপমানিত লাঞ্ছিত জীবন আর তিনি সইতে পারিছেন না।

হঠাৎ একদিন কলকাতার এক খবরের কাগজে বেরুলো এক সরকারী দলিলের হুবহু নকল। তাতে প্রকাশ হয়ে গেল কাশ্মীরে ইংরেজের কীর্তিকাহিনী, রেসিডেন্ট প্লৌডেনের কারসাজি। পার্লামেন্টে উঠল তরঙ্গ। উদারনৈতিক সদস্য চার্লস ব্র্যাডলো মহারাজের পক্ষ নিলেন। উইলিয়ম ডিগবী ছিলেন সেকালের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ। তিনি মহারাজার প্রতি অবিচারের নিন্দা করলেন জোরালো ভাষায়। অগত্যা ভারত সরকার মহারাজকে তাঁর শাসনভার ফিরিয়ে দিলেন। পনেরো বছর পরে আবার কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজ প্রতাপ সিং।

তারপরে আরও কুড়ি বছর বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর আগেই অমর সিং মারা গেলেন। যুবক হরি সিং হলেন মহারাজের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য।

প্রতাপ সিং-এর পাটরাণী বললেন, "পুষ্যিপুত্র নেব আমি। আর যাই হোক, বিশ্বাসঘাতক অমর সিং-এর ছেলেকে বসতে দেব না সিংহাসনে।"

প্রতাপ সিং কিন্তু চুপ করে থাকেন। তাঁর মনের কথা কেউ জানতে পায় না।

ক্রমে মহারাজের চুলে ধরল পাক, চোখে পড়ল ছানি। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হয়ে বাধল বিষম ব্যাধি। শয্যা নিলেন তিনি। রাজবৈদ্য এসে নাড়ী দেখেন দুবেলা, চরক ও সুশ্রুতের শ্লোক আউড়ে বড়ি ব্যবস্থা করেন নানা রঙের, ত্রিফলার জল আর মধু দিয়ে মেড়ে খাওয়ানো হয় প্রহরে প্রহরে।

বৃথা। মহারাজের রোগের উপশম হয় না। প্রতাপ সিং বুঝলেন, তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন। পাত্র মিত্র, সভাসদদের ডাকলেন কাছে। ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিং-এর মাথায় হাত রেখে বললেন, "সবাই জেনে রাখো এই আমার উত্তরাধিকারী, জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবী অধীশ্বর।"

মহারাণী ছিলেন পাশে।—তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "হায়, কি করলে মহারাজ? শেষকালে অমর সিং-এর ছেলেকেই দিলে রাজ্যভার!"

সে প্রশ্নের জবাব মিললো না। প্রতাপ সিং ততক্ষণে চোখ বুঁজেছেন। সে চোখ আর খোলেননি।

সিংহাসনে বসে মহারাজ হরি সিং প্রথমে মন দিলেন প্রজার কল্যাণে। রাজ্যের বড় চাকরিগুলি যাতে বিদেশীরা না দখল করে সেজন্য করলেন আইন, কর্মচারীরা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় সেদিকে রাখলেন কড়া নজর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন চাষী মজুরদের অবস্থা। ঝিলমে বান এলে শিকারা নিয়ে নিজে উদ্ধার করতে লাগলেন বন্যার এলাকা থেকে বিপন্ন নরনারীর দল। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা দিলেন,—ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত ভারতীয়দেরই হাতে। একজন দেশীয় রাজার মুখে এমন কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেনি।

ইংরেজ গভর্নমেন্ট খুশি হলেন না। কাশ্মীরে পুরোপুরি ইংরেজ কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা তুষ্ট

ছিলেন না। এখন রুষ্ট হলেন। কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন তাঁরা।

উপায় ছিল সহজ। কাশ্মীরের প্রজারা অজ্ঞ মুসলমান। তাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উস্কে দিতে কতক্ষণ ? ওয়েকফিল্ড নামে এক ইংরেজ ছিল মহারাজ হরি সিং-এর মন্ত্রী। তারই মারফতে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হলো কাশ্মীর ও জম্মুতে। রাজ্যের বাইরে থেকে সে অসন্তোষের আগুনে যোগান হলো প্রচুর ইন্ধন। মুসলমানদের নির্যাতন করছে হিন্দু মহারাজ আর তার হিন্দু কর্মচারীরা,—এই বলে চেঁচাতে লাগল পাঞ্জাবের অর্হর এবং আহমদীয়া দলের নামজাদা সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা আর তাদের দলের উর্দু খবরের কাগজগুলি।

লাহোরের দৈনিক শিয়াশৎ পত্রিকা খোলাখুলি কাশ্মীরী মুসলমানদের কাছে জানাল আবেদন,—আল্লার নামে; শপথ নিয়ে তারা জান কবুল করুক। ইসলামের মান রাখতে তারা কোতল করুক দুশমনদের, সাবাড় করুক বিধর্মী সরকার। পত্রিকার হাজার হাজার সংখ্যা রোজ বিনামূল্যে হলো বিতরণ শ্রীনগর, সপুর, বিজবিহারা ও অন্যান্য শহরে। গুপ্তচর পুস্তিকা "কাশ্মীর মজলুস" আর "মকতবি কাশ্মীর" ছড়িয়ে পড়ল হাটে বাজারে, মজলিসে, মসজিদে। সুদূর পাড়াগাঁয়ের মক্তব মাদ্রাসার মুসলীম ছাত্রমহলে। আসতে লাগল অসংখ্য, কখনও ডাকে, কখনও বা হাতে হাতে। সেগুলির ছাপার কালি লাল, লেখার ভাষা হিংস্র। পড়লে নেহাত শান্ত মানুষেরও রক্ত তেতে ওঠে, মাথায় চাপে খুন।

রাজ্যের ভিতরে আন্দোলনের নেতা হলেন এক তরুণ শিক্ষিত মুসলমান। তাঁর নাম—শেখ মহম্মদ আবদুল্লা।

চৌদ্দ

কাশ্মীরের এক সাধারণ গৃহস্থ ঘরে জন্ম হয়েছে শেখ আবদুল্লার। তাঁর বাপ তৈরী করতেন পশমী শাল। মা রান্না করতেন, ঘর নিকোতেন, বিকালে হাটে বেচার জন্যে উদুখলে কুটতেন শালীধানের চিড়া। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে আবদুল্লা কলেজে পড়তে যান লাহোরে। সেখান থেকে আলীগড়।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান বিরোধের বীজ বুনেছে ইংরেজ। তার জমি তৈরী হয়েছে আলীগড়ে। আলীগড় মুসলীম কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ মিস্টার বেক আর থিওডর মরিসন সে মাটিতে যুগিয়েছেন সার ও জল। যত্নে বাড়িয়ে তুলেছেন সাম্প্রদায়িক হিংসার চারা গাছ। সরকারী উৎসাহ আর উস্কানির আলো হাওয়ায় শাখা প্রশাখা মেলে পরে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট বিষবৃক্ষ। সর্বাঙ্গে তার কাঁটা। সে গাছের ছায়াতে বসে থেকে যে নিয়েছে পাঠ, সেখানকার ঘাসের উপর যে চলেছে পথ, সেখানকার বাতাস থেকে যে নিয়েছে নিঃশ্বাস সে কি হবে সাক্ষাৎ প্রেমাবতার ? মরুর দেশে ফুটবে কি নাগকেশরের ফুল। আলীগড়ের ছাত্র শেখ আবদুল্লা যে কাশ্মীরে ফিরে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন হিন্দু বিদ্বেষে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

তিনি প্রথমে ফতেকদলে স্থাপন করলেন এক মুসলীম পাঠাগার। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় যে সব তরুণ পড়তে আসত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। শ্রীনগরের শাহহামদানের মসজিদে জুম্মার নামাজে বড় জমায়েত হয়। তাতে দিতে লাগলেন উত্তেজক বক্তৃতা। অজ্ঞ মুসলীম জনসাধারণ মোল্লাদের কথায় ওঠে বসে। চতুর আবদুল্লা শ্রীনগরের প্রধান মীরওয়েজ মৌলানা ইউসুফ শাহকে দলে টানলেন। তাঁর ফতোয়া হাতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুললেন নিজ সমর্থকের সংঘ।

কাশ্মীরের রাজকর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন বুদ্ধিহীন। তাদের হঠকারিতায় মুসলীম জনগণের বিক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চলল।

এই সময়ে হরি সিং-এর ঘটল মতিভ্রম। খ্রীস্টানেরা বললেন, ভগবান যাকে মারতে চান, আগে-ভাগে তার বুদ্ধি দেন গুলিয়ে। মহারাজ রাজ্যশাসনের বদলে মাতলেন প্রমোদ ভ্রমণে। রাজকার্য গেল চুলোয়, প্রজাহিতের কথা তোলা রইল শিকায়। আজ লন্ডন, কাল প্যারিস, পরশু রিভিয়ারায় কাটে তাঁর দিন। সেখানে তাঁর কীর্তি-কলাপ মাঝে মাঝে প্রায় কেলেঙ্কারির কোঠায় গিয়ে ঠেকে।

বিদেশে বিলাস বাসনের সহস্র ছিদ্রপথে দ্রুত শূন্য হয়ে আসে রাজকোষের সুবর্ণ ঝারিটি। তলানি সামান্য যেটুকু থাকে সেটুকুও লাগে আমলা গোমস্তার ভোগে। তখন তারা টাকার তাগিদে দরিদ্র প্রজার গলায় ট্যাক্সের ফাঁসে আরও কষে লাগান টান।

ফল্ ফলতেও দেরী হলো না। অতি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করেই ঘটলো বিপর্যয়। বারুদের স্তূপে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গই তো বৃহৎ বিস্ফোরণের পক্ষে যথেষ্ট।

ইংরেজী উনিশ শ একত্রিশ সাল। মে মাসের মাঝামাঝি। জম্মুর পুলিশ ব্যারাকে সেদিন একজন মুসলমান পুলিশ কাজে হাজির হয়নি। তার উপরওয়ালা,—লাভরাম হিন্দু। কাশ্মীরী পণ্ডিত। তিনি এসে দেখেন, লোকটা বিছানায় শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। শাসন করতে গেলে সে উল্টে লাভরামকেই গাল-মন্দ শুরু করল। রাগে লাভরাম পুলিশের বিছানাটা টান মেরে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। বালিশের তলায় ছিল পবিত্র কোরানশরীফের কয়েকটি পৃষ্ঠা, তা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কী! এত বড় স্পর্ধা। কাফেরের হাতে কোরানের হতাদর? বিধর্মী করে ইসলামের অপমান? ফতেকদলের পাঠাগারে গর্জে উঠল শেখ আবদুল্লা আর তার সমস্ত দলবল। জম্মু ও কাশ্মীরে যেখানে যত মুসলমান ছিল তাদের সবার কানে পৌঁছে দিল তারা এই খবর। ধূমায়িত অসন্তোষের অগ্নিতে পড়ল ঘৃতাহুতি।

গভর্নমেন্ট বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। তাঁর মন্ত্রিসভার এক সদস্যকে দিলেন তদন্তের ভার। সাক্ষ্য প্রমাণে বোঝা গেল লাভরামের দোষ নেই। বিছানার ভিতরে যে ছিল ধর্মগ্রন্থ তা তার জানা ছিল না। তবুও মুসলীম সম্প্রদায়কে খুশি করতে লাভরামকে দেওয়া হলো চাকরি থেকে অবসর। অবাধ্যতার অপরাধে অবশ্য মুসলীম পুলিশটিকে করা হলো বরখাস্ত।

মুসলীম জনমত শান্ত হলো না। শেখ আবদুল্লা এক সভা ডাকলেন শ্রীনগরে খান কোয়াইমুল্লার চত্বরে। সেখানে হাজার হাজার উত্তেজিত মুসলমানের কাছে হিন্দু মহারাজ, তাঁর হিন্দু কর্মচারী ও হিন্দু প্রজাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তৃতা দিল এক পাঠান। নাম আবদুল কাদের। লোকটা এক ইংরেজের রাঁধুনি—বাবুর্চী। মনিবের সঙ্গে সদ্য এসেছে শ্রীনগরে। গভর্নমেন্ট সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

তেরোই জুলাই শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে আবদুল কাদেরের বিচারের দিন। সকাল থেকেই জেলের দরজায় জড়ো হতে লাগল জনতা। দলে দলে মুসলমান ছোট বড় শোভাযাত্রায় পৌঁছল এসে নানা অঞ্চল থেকে। তারা চেঁচাতে লাগলো, আবদুল কাদের শহিদ। তাদের মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারে কাঁপতে লাগল জেলখানার দরজা জানলা

অবশেষে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো বিক্ষোভকারীর দল ঢুকে পড়ল জেলের আঙিনায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তার সহকর্মীরাও চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করার কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই করলেন গুলীবর্ষণ। নিহত হলো জন দশেক, আহত ততোধিক।

কোথাও আর কোনো মাত্রা রইল না। মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে বিপুল জনতা রওনা হলো গোরস্থানে। দশ হাজার ক্ষুব্ধ মুসলমানের শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলেন পাঠাগারের নেতারা। তাদের হাতে আহতদের রক্তমাখা জামা কাপড়ে তৈরী বৃহৎ পতাকা। মুখে মহারাজার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ধ্বনি। শোভাযাত্রা তো নয় যেন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত তপ্ত লাভার স্রোত।

প্রধান রাজপথ দিয়ে জনস্রোত এসে পৌঁছলো মহারাজগঞ্জের বাজারে। সেটা রাজধানীর সবচেয়ে বড় ব্যবসায় অঞ্চল। মুহূর্তে উত্তেজিত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল পথচারী হিন্দু স্ত্রী পুরুষের উপর। শ্রীনগরে শুরু হলো ভয়াবহ দাঙ্গা। দেখতে দেখতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল বিচরনগ এবং শহরের আরও অন্যান্য এলাকায়।

হিন্দু দোকান পসার হলো লুট, হিন্দু বাড়ি-ঘর হলো পুড়ে ছাই। তিনজন হলো খুন, একশ' তেষট্টি জন জখম। দাঙ্গাকারীরা থানা করল তছনছ, টেলিফোনের লাইন করল খানখান্।

ওয়েকফিল্ড তখন কাশ্মীরের দেওয়ান। দাঙ্গার সময়ে তিনি হলেন নিখোঁজ। ক্রিং ক্রিং শব্দে মুহুর্মুহুঃ টেলিফোন বাজছে তাঁর বাংলোতে। ভয়ার্ত হিন্দুরা জানাচ্ছেন ধন, প্রাণ, মর্যাদা রক্ষার

কাতর আবেদন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী কর্মচারীরা চাইছে নির্দেশ। ওয়েকফিল্ডের বেয়ারা টেলিফোন ধরে কেবলি বলছে, "সাহেব কোঠিমে নেহি হ্যৈ।"

কখন ফিরে আসবে?

তা সে জানে না, "নেহি মালুম।"

শেষটায় ছাউনি থেকে মহারাজার সৈন্যদল এসে গুলী করে থামালো লঙ্কাকাণ্ড, শান্তি ফিরিয়ে আনলো শহরে।

গভীর রাত্রে দেওয়ান দিলেন দেখা। যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "হাঁা, লঙ্কা হয়েছে না কি? কী আস্পর্ধা! বদমাশদের শায়েস্তা করছি এবুনি। ডাকাত ব্যাটাদের আগে পাঠাবো জেলে, ফাঁসিতে লটকাবো তারপর—।" বলতে লাগলেন ওয়েকফিল্ড।

আসল ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না মহারাজের। তিনি আবদুল্লা আর তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে আটক করলেন হরি পর্বতের গারদে। ওয়েকফিল্ডকে করলেন বরখাস্ত তাড়িয়ে দিলেন অপদার্থ অকর্মণ্য অনেক কর্মচারীকে। শক্ত হাতে দমন করলেন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অজুহাতে মহারাজকে সরিয়ে কাশ্মীরের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার যে চক্রান্ত ছিল ইংরেজের, তা সফল হলো না।

পনেরো

কয়েক বছর পরের কথা।

শেখ আবদুল্লা গিয়েছিলেন পেশোয়ারে। সেখানে দেখেন এক বিরাট জনসভা। প্রায় লক্ষাধিক শ্রোতা। দীর্ঘদেহ পাঠানরা অধীর আগ্রহে শুনছে বক্তৃতা। কৌতূহলে আবদুল্লা এগিয়ে গেলেন কাছে।

মঞ্চের উপরে শুভ্র খদ্দরের টুপি মাথায় বক্তা নাতিদীর্ঘ ঋজুদেহ, উন্নতনাসা গৌরকান্তি পুরুষ। ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি, চক্ষে সাহসের বহ্নি, চিবুকে কাঠিন্যের ইঙ্গিত। কণ্ঠে তীব্রতা নেই অথচ দৃঢ়তা আছে। যেন ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার। ব্যক্তিটি কে?

বক্তা আর কেউ নন—কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সভা শেষ হলে শ্রোতারা জয়ধ্বনি করতে করতে নেহরুকে ভক্তের মতো ঘিরে ধরলো চারদিকে।

শেখ আবদুল্লা অবাক হলেন। তাই তো, হিন্দু নেহরু মুসলমান পাঠানদের এমন মন জয় করলেন কেমন করে? কী তাঁর কৌশল? কোথায় তাঁর আকর্ষণ? গেলেন নেহরুর কাছে। একবার নয়, দু'বার নয়, অনেকবার অনেক কথা বললেন। অনেক কথা শুনলেন। জানতে পারলেন ভারতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, কংগ্রেস আন্দোলনের ধারা।

আবদুল্লা নেহেরুকে জানালেন কাশ্মীরে মুসলীম চাষী মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা। হিন্দু মহারাজ তাদের শোষণ করছেন।

নেহরু বললেন, চাষীরা গরীব বলেই দুঃস্থ, মুসলমান বলে নয়। সরকার হৃদয়হীন, তার কারণ এ নয় যে তাঁরা হিন্দু বা ডোগরা, তার কারণ তাঁরা স্বৈরাচারী।

আবদুল্লার চোখ খুলল।

পেশোয়ার থেকে ফেরার পথে আরও একটি ঘটনা ঘটল। কাশ্মীরের এক আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে আসছিলেন আবদুল্লা। বাগানের মালিক এক ধনী মুসলমান। নিজে দাঁড়িয়ে ফল পাড়াচ্ছিলেন। মজুরেরা হিন্দু। গাছের কোনোখানে একটি ফলও যাতে বাদ না যায় সেদিকে মালিকের কড়া দৃষ্টি। তাঁর তাড়ায় মজুরেরা ক্রমশঃ নীচের ডাল থেকে উঠছিল উঁচু ডালে। মানুষের ভারে গাছের শাখাগুলি এমন ঝুঁকে পড়ছে যে, আবদুল্লার ভয় হলো, কখন বুঝি বা—কড়ড়-কড়াৎ—'বুঝি বা' নয়, সত্যি সত্যিই একটা গাছের সব আগ-ডাল ভেঙে পড়ল মাটিতে। বছর কুড়ি বয়সের একটি মজুর ধপাস শব্দে হলো ধরাশায়ী।

হা হা করে মালিক ছুটে এলেন। বসিয়ে দিলেন শপাং শপাং করে কয়েক ঘা বেত। মাথায়,

উপর খাঁড়ার ঘা। গর্জন করতে লাগলেন। উল্লুক কোথাকার, গাছের একটা ফলন্ত ডাল ভেঙে ফেললে। হায় হায়, কত টাকা লোকসান হলো। হতভাগার মজুরি কেটে নিতে হবে সবটা। তাতেই বা ক্ষতিপূরণ হবে কতটুকু ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবদুল্লা ও আর পাঁচজন মিলে কোনো মতে মাটি থেকে তুললেন আহত অচৈতন্য মজুরকে। নিয়ে যাওয়া হলো তার বাড়িতে। সেখানে আবদুল্লা দেখলেন, ঠিক একই দুঃখ, কষ্ট, একই অভাব অনটন যা এতকাল দেখেছেন মুসলীম শাল কারিগরদের বাড়িতে। নেহরুর কথা মনে পড়ল, জনগণের যে দুর্দশা তার মূলে ধর্ম নয়,—অর্থ।

বদলে গেল শেখ আবদুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি, বদলে গেল তাঁর মত। বদলে গেলেন তিনি নিজে। যেন তাঁর নবজন্মলাভ।

সেবার শহরে কী নিয়ে যেন হিন্দু-মুসলমানে বাধলো এক বিতর্ক। তর্ক থেকে কলহ। কলহ থেকে ক্রোধ। তার পরেই দুই পক্ষে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি। হিন্দুদের বিপদ বেশী। সংখ্যায় তারা নগণ্য। এক ঘর হিন্দুবাড়ি ঘিরে বাস করে দশ ঘর মুসলমান।

ঝিলমের দু'নম্বর পুলের পাশে একটি ছোট হিন্দু মেয়ে জ্বরে মরে পড়ে ছিল দু'দিন। তার সৎকারের উপায় নেই। ভয়ে হিন্দুরা ঘরের বাইরে বেরোয় না। নিজেদের হাটবাজারে যাওয়া বন্ধ। শব নিয়ে শ্মশানে যাবে কে ? মড়া পোড়াতে গিয়ে নিজেরা মারা পড়বে না কি ? প্রাণহীন মেয়ে কোলে নিয়ে মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন রাত্রি দিন।

শুনতে পেয়ে শেখ আবদুল্লা গেলেন সেই বাড়িতে। দু'হাতে তুলে নিয়ে এলেন ছোট্ট মেয়েটির মৃতদেহ। ঝিলমের স্রোতে নিজ হাতে শিকারা বেয়ে নিয়ে চললেন শ্মশানে। নদীর দুই তীরে শত শত মুসলমান চলল শিকারার পিছনে। তারা ধিক্কার দিতে লাগল, "ছিঃ ছিঃ, কাফেরের মড়া পোড়াতে যাচ্ছে আবদুল্লা ! শেষ কালে শেখ হলো কাভোগ !"

কাভোগ মানে ডোম।

আবদুল্লা চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, "ধেৎ, মড়ার কী কোনো জাত থাকে রে, বোকার দল ?"

সেই থেকে শেখ আবদুল্লা হলেন এক নতুন মানুষ ! সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে তিনি, গড়লেন নতুন সমিতি। মুসলীম কনফারেন্স ভেঙে হলো ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। বৃদ্ধ শিখ সর্দার বুধ সিং তার সভাপতি, তরুণ ব্রাহ্মণ প্রেমনাথ বাজাজ তার কর্মকর্তা, মুসলমান শেখ মহম্মদ আবদুল্লা তার অধিনায়ক।

জনগণকে নিয়ে কাশ্মীরে শুরু হলো গণ-আন্দোলন। এতকাল যিনি ছিলেন মুসলীম নেতা এখন তিনি হলেন গণনায়ক। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি করল তাঁর "শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ।" কাশ্মীরের ঘরে ঘরে সহস্র সহস্র অন্ধ, অন্ধ ও অসহায় নরনারীর কাছে তিনি আনলেন নবীন অরুণালোক। বঞ্চিত, লাঞ্ছিতকে তিনি দিলেন অভয় ও আশ্বাস। দিলেন বর্তমানের মন্ত্র ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মৃতের দেশে তিনি নব ভাব-গঙ্গার ভগীরথ।

ষোলো

কৃষ্ণণে মহারাজ হরি সিং-এর প্রধান মন্ত্রী হলেন রামচন্দ্র কাক। কাশ্মীরী পণ্ডিত। লোকটা সুচতুর। গোড়াতে শ্রীনগরের প্রতাপ সিং কলেজে লাইব্রেরীর কেরানী ছিলেন কুড়ি টাকা বেতনে। সেখানে থেকে ধীরে ধীরে হয়েছেন সরকারী দপ্তরের নানা বিভাগের কর্তা, আইন সভার সভ্য, মন্ত্রিসভার সদস্য, সবশেষে দেওয়ান। রাজকার্যে তাঁর কড়া দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রাজনীতিতে দূরদৃষ্টি ছিল না। কংগ্রেসকে তিনি করলেন মহারাজের শত্রু। তারই হুকুমে কাশ্মীর রাজ্যে গ্রেপ্তার হলেন পণ্ডিত নেহরু চিরকালের মতো বিরোধ ঘটে রইল কাশ্মীরের মহারাজ আর ভারতবর্ষের ভাবী প্রধানমন্ত্রী মধ্যে !

দুর্ভাগ্য আর গরুর গাড়ি, আসে যখন ভিড় করে আসে ! শ্রীনগরের পথে একদিন দেখা দিল এক সন্ন্যাসী ! স্বামী সত্যদেব। কেউ বলে তাঁর বয়স দু'শ বছর কেউ বলে পাঁচশ'। হিমালয়ের

গুহায় বসে তপস্যা করেছেন এতদিন। ভক্তরা বাঁচল কবে স্বামীজী সিদ্ধপুরুষ। ভূত, ভবিষ্যৎ, ইতিহাস, আর পর জন্মের আগাম কাহিনী।

ক্রমে তাঁর খ্যাতি পৌঁছল মহারাজারও কানে। স্বামীজীর ডাক পড়ল রাজপ্রাসাদে। সেখানে সন্তদেব দেবতার মতোই আসন পাকা করে বসলেন দুদিনে।

সন্ন্যাসী মহারাজকে বললেন, "ইংরেজ চলে যাচ্ছে ভারতবর্ষ ছেড়ে। তোমার ললাটে দেখছি রাজ্য ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট সামুদ্রিক লিখন। ইংরেজী 'এল' অক্ষরের মতো। বেশ শব্দের আগে আছে 'এল' ? লাহোর এবং এবং লাডাক। কুছ ফিকির নেই, মহারাজ, হনুমানজী কি কৃপাসে লাহোর থেকে লাডাক রাজ্য হবে তোমার।"

গুরুজীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস হলো হরি সিং-এর।

সেদিন থেকে হরি সিং-এর কাল হলো দুই,—কাক আর সন্তদেব। যেন ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত। মন্ত্রী দেয় দুর্বুদ্ধি, গুরু দেয় দুরাশা। সর্বনাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন মহারাজ। অন্য সব দেশীয় রাজারা যখন একে একে যোগ দিচ্ছেন ভারত সরকারের সঙ্গে, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মাঝখানে এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্যের। লাহোর থেকে লাডাক। ইংরেজী 'এল' আছে তাঁর ললাটে! হুঁ, সে কি আর অমনি?

নদীর জোয়ারের মতো সংসারে সুযোগ আর সময়ও বসে থাকে না কারো জন্যে। মহাকালের কাছে মহারাজারও খাতির নেই। দিন আর মাস বয়ে গেল হেলায়। স্বপ্নভঙ্গে হরি সিং যখন চোখ মেললেন, রাজধানীও তখন যায় যায়, রাজ্যপাট টলমল। অগত্যা প্রাণের দায়ে পাকিস্তানী হানাদার ঠেকাতে ধরনা দিতে হলো ভারত সরকারেরই কাছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন, সৈন্য তিনি পাঠাবেন। কিন্তু মহারাজের পিছনে চাই জনমতের সমর্থন।

আগের কালের রাজারা তাঁদের আপন খেয়ালে রাজ্য চালাতেন। রেগে কারো নিতেন শির, কাউকে চড়াতেন শূলে। খুশিতে কাউকে দিতেন ধন-দৌলত, কাউকে বানাতেন সভাসদ। রাজকন্যাসহ অর্ধেক রাজত্ব দান করতেন ইচ্ছামতো। তখন প্রজা শুধু চোখ বুজে খাজনা যোগাত, মুখ বুজে দুঃখ সইত। পাইক পেয়াদার পকেট পুরিয়ে খালি পেটে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলতো, "রাজ্যেশ্বরো জগদীশ্বরো বা।"

সেদিন আর নেই। প্রজা ফেলবে কড়ি, রাজা মাখবে তেল—এ রীতি একালে অচল। এখন দেশের লোক চায় দেশ শাসনের ভার। রাজাকে রাজ্য চালাতে হয় প্রজার পরামর্শ শুনে। নেহরু বললেন, জননেতাকে দিতে হবে কাশ্মীরের জনশাসনের ভার।

তথাস্তু। আবদুল্লা হলেন কাশ্মীর শাসন ব্যবস্থার সাময়িক অধিকর্তা,—হেড অব য়্যাডমিনিস্ট্রেশান।

রাজ্য সরকারের মাথা হয়েই কিন্তু আবদুল্লার মাথা গেল ঘুরে।

আসলে আবদুল্লা লোকটার নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই। যখন যার বুদ্ধি নেন, তখন তারই কথা বলেন, যার সাথে থাকেন তারই পথে চলেন। সঙ্গদোষ বড় দোষ। তার উপরে আছে আবার ক্ষমতার স্বাদ। লোভী বালকের ভোজন স্পৃহার মতো তা কেবলই বাড়তে থাকে।

আবদুল্লার আশপাশে আবার এসে জুটল কয়েকটি ক্রুর ও স্বার্থপর মুসলমান। তারা রাত্রিদিন ঘিরে থাকে তাঁকে। দুধের বাটির চারপাশে যেমন ভন্‌ভন্‌ করে মাছি। দুই সরস্বতীর মতো তারা কেবলই দুষ্টবুদ্ধি দিল অষ্টপ্রহর।

দেখতে দেখতে আবদুল্লার মন আর মতি দুই-ই আবার হলো ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন ও স্বার্থান্ধতায় মলিন। জাতীয়তাবাদের উন্নত শীর্ষ থেকে ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়লেন সাম্প্রদায়িকতার অতল গহ্বরে। জলভেজা পুতুলের মতো তাঁর রং ধুয়ে মুছে বেরিয়ে পড়ল ভিতরের কাদামাটির ডেলা। রূপ ঘুচে গিয়ে দেখা দিল স্বরূপ।

আবদুল্লার রাগ ছিল হরি সিং-এর উপরে ষোল আনা। মহারাজ যে তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সেকথা ভুলতে পারেননি তিনি কোনো দিন। কিন্তু কথামালার উটের গল্প জানা ছিল তাঁরও। দড়িতে একবারেই হেঁচকা টান দিলে তা' ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে

আনলেন তিনি। এগোলেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।

আবদুল্লা প্রথমে চাইলেন কাশ্মীরে পুরোপুরি এক মন্ত্রীসভা। হরি সিং হবেন ক্ষমতাহীন নিয়মতান্ত্রিক মহারাজ। যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আছে রাজ্যপাল। কাজের জন্য নয়, সাজের জন্য। নৈবেদ্যের চূড়ায় যেমন সন্দেশ, খোঁপার উপরে যেমন গোলাপ ফুল।

ভারত সরকারের অনুগ্রহে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা হলেন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী।

কাটল কিছু কাল। হরি সিং-এর প্রতাপ নেই, কিন্তু প্রভাব আছে। সরকারী কর্মচারীরা তখনও মহারাজকেই মনে করে রাজ্যের মালিক। নিরক্ষর চাষী মজুরেরা পুরান অভ্যাসে তখনও বিপদে দেয় মহারাজের দোহাই, আমোদে আহ্লাদে মহারাজের গায় জয়। সেটা প্রধান মন্ত্রীর পছন্দ নয়। ততক্ষণে ভারতীয় সৈন্যদল হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে দূরে। আবদুল্লা ভাবলেন, এই সময়। তিনি তাঁর ধনুকে দিলেন টঙ্কার। তূণ থেকে বের করলেন দারুণ অগ্নিবাণ। হরি সিং-এর কপাল গেল পুড়ে।

ভারত সরকারের কাছে পত্র দিলেন আবদুল্লা, রাজ্যের জনগণ চায় না হরি সিংকে। সিংহাসন ছাড়তে হবে তাঁকে।

সে কী কথা ? শুনে চমকে ওঠেন মহারাজ। ছুটে আসেন দিল্লীতে। সেখানে তাঁর সহায় কে ? গেলেন নেহরুর কাছে। হায়, তিনি হরি সিং-এর বন্ধু নন। শেখ আবদুল্লার উপরেই তাঁর অটুট বিশ্বাস। রাজতন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা বেশী। তাঁর কাছে মহারাজের অনুনয় নিষ্ফল।

অবশেষে একটা মাসোহারা নিয়ে গদি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি রইল না আর। তরুণ যুবরাজ করণ সিং হলেন রিজেন্ট—অর্থাৎ পিতার অবর্তমানে কাশ্মীরের রাজ্যধর। তাঁর বয়স তখনও আঠারো পার হয় নি।

রাজপুত্র না হয়েও রাজা হয়েছিলেন হরি সিং। রাজা হয়েও রাজ্য হারালেন তিনি। ইংরেজী 'এল' অক্ষরটা আছে আরও একটা ইংরেজী শব্দের গোড়ায়। সেটা 'লস্ট'। গুরু সন্তদেবের তা' জানা ছিল না। শিষ্য হরি সিং-এর তা' মনে ছিল না। মূর্খ হরি সিং!

রাজ্যহারা হরি সিং গেলেন বম্বে। নিরালা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলেন সেখানে।

ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় অদূরে সমুদ্র তীর। বেলাভূমিতে কেবলই আছাড় খেয়ে পড়ছে ফণাতোলা সাপের মতো অসংখ্য সাগর তরঙ্গ। ঢেউ-এর পরে ঢেউ। বিরামহীন, সংখ্যাহীন। দিনের পর দিন কর্মহীন হরি সিং তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই মন উধাও হয়ে যায় দূর দূরান্তের দেশে। সেখানে পাহাড়ের মাথায় সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করছে রূপালী বরফের আস্তরণ, চার-চেনারীর, পাতায় বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া, ঝিলমের স্রোতে হরতনের টেক্কার মতো বৈঠা নিয়ে মাঝিরা বাইছে ঝালরআঁটা রঙিন শিকারা, আমীরাকদলের পুলের কিনারায় লাঠি হাতে নিঃস্ব দুঃখীর দল 'মিস্কিন', 'মিস্কিন', বলে, হাত বাড়িয়ে মাগছে ভিখ্।

সে দেশ থেকে চিরকালের মতো বিদায় হয়েছেন হরি সিং। সেখানে কোনোদিন আর ঘটবে না তাঁর পদক্ষেপ।

মন্দমতি, ভ্রষ্টনীড়, ভাগ্যহত হরি সিং।

লঘুকরণ

স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের কৈফিয়েৎ শীর্ষক ভূমিকাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বর্তমান পক্ষে প্রযোজ্য। যদিও পুরোপুরি "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহা লইয়াই এই পুস্তকের কারবার" নয়, তবু এই গ্রন্থটিও খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে-রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেননা এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।"

প্রকাশ

হাকিমেরা জানেন, বিচারকার্য সহজসাধ্য নয়। বিচারকের দায়িত্ব একাধিক। সে-দায়িত্ব আইনের প্রতি, আসামীর প্রতি, ন্যায় এবং নীতির প্রতি। তাই জেলের হুকুম দিতে নবীন ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বিধা ঘটে। ফাঁসির আদেশ দিয়ে জজ সাহেবের মুখে অন্ন বিস্বাদ হয়, চোখে ঘুম আসে না। অথচ মেকলে থেকে শুরু করে বেভারলী নিকলস পর্যন্ত যে-সকল ইংরেজ ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও ভ্রমণকারীরা ভারতীয়দের সম্পর্কে রায় দিয়েছেন তাঁদের কাজ কঠিন ছিল না। কারণ তাঁরা জজিয়তির ভান করে আসলে করেছেন ওকালতি। বিচারের অছিলায় বাতিল। উকীলের বুদ্ধি থাকাটা আবশ্যিক, বিবেক না থাকলেও ক্ষতি নেই। তাই আমাদের সম্পর্কে ইংরেজ লেখকদের ভাষা এবং ভাব কোনোটাই এমন হয়নি গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। সংসারে একমাত্র প্রেমের দৃষ্টিতেই স্খলন অপরাধ অনুদ্‌ঘাটিত থাকে। রাষ্ট্রীয় বিবাহতন্ত্রে একদা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ইতিহাসের ছাঁদনাতলায় ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল। পুরাকালে স্বামীরা স্ত্রীদের স্বাতন্ত্র্য দিতেন না। দিতেন আশ্রয় ও ঐশ্বর্য। সে-দিনের ইংরেজও আমাদের কর্তৃত্ব দেয়নি, দিয়েছিল নিরাপত্তা, জাতীয় ঐক্য এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের দীক্ষা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের দ্বারা ভারতবর্ষের নিদ্রিত আত্মাকে সে বহুধা বিকাশের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল,— একথা নীরদ চৌধুরী বলার আগেও অনেকেরই জানা ছিল।

জগতে বিবাহ মাত্রেরই আদিতে কুসুম ও অন্তে কণ্টক। প্রারম্ভে প্যারাডাইস ও পরিণামে পারগেটরী। মধুমাসের মতো মধুচন্দ্রিকারও আয়ুষ্কাল পরিমিত। হানি-মুনের পরে যে দীর্ঘ দিনগুলি আসে তাতে মোহের বদলে থাকে মুদ্‌গর, ফুলশয্যা হয় হুলশয্যা। ভারত ও ইংলন্ডের নব পরিণয়ের বিহ্বলতাও স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন শেষ হয়েছে। তার পরবর্তী অধ্যায়ে না ছিল পূর্বরাগের ব্যাকুলতা, না ছিল উত্তর প্রণয়ের প্রশান্তি। দুপক্ষেরই গলার মালা ততদিনে গলার দড়িতে পরিণত। আশ্চর্য নয় যে, তখন একের চোখে অন্যের ভিল পরিমাণ ত্রুটি বিচ্যুতি তাল পরিমাপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ত্রুটির সংজ্ঞা তো ধ্রুব নির্দিষ্ট নয়। আইনস্টাইনের অঙ্কের মতো সেটা রিলেটিভ। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তার রূপান্তর ঘটে। একই প্রথা বা কাজ একক্ষেত্রে গর্হিত ও অন্যক্ষেত্রে নমস্য হয়ে ওঠে। শ্যালিকা বিবাহ বিলাতী সমাজে নিন্দনীয়। অথচ পত্নীবিয়োগে স্ত্রীর অনূঢ়া অনুজাকে জায়ারূপে গ্রহণ করা এদেশে শুধু অনুমোদিত নয়, বিশেষ অবস্থায় পিতৃকুলা ও শ্বশ্রূকুল দুদিকের অভিপ্রেতও বটে। ওদেশে যে সকল লজ্জাবতীরা অস্টারেটি ক্রোদস-এ পথে বিচরণ করেন, এদেশের পুরুষদের দেহের উপরার্ধ অনাবৃত দেখলে তাঁরা প্রায় মূর্ছা যান। ইলেকশানে রাজা মহারাজারা স্বতন্ত্রপার্টির ছাপ নিলে হন রিঅ্যাকশনারী, কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলে হন ডেমোক্রেসিত। পররাজ্যগ্রাস এমেরিকা করলে এ্যাগ্রেশান, চীন করলে লিবারেশান!

তবে একথা ঠিক যে, সকল দেশে এবং সকল কালেই এমন কতগুলি ব্যাপার আছে যা অনুচিত গণ্য হয়। অসত্যভাষণ যে দূষণীয় এবং পতিতাবৃত্তি যে অশ্রদ্ধেয় সে বিষয়ে কোথাও কোনো দ্বিমত নেই। বৃহত্তর পাপ পুণ্যের কথা বাদ দিলেও সামাজিক আচরণে এমন কয়েকটা লিখিত বা অলিখিত অনুশাসন আছে যা সকল সভ্যতায়ই স্বীকৃত। মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার পক্ষে সেগুলি অনুকূল। সিনাই পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে যে-দশটি অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল,অস্ত্রীস্টীয় সমাজেও সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। কারণ আমার প্রতিবেশীর সুন্দরী স্ত্রীর দিকে আমি বার দুই অপাঙ্গে তাকালে স্বর্গস্থ ভগবানের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কি না জানিনে; কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকের যে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং মেনে নেয়া যাক যে, দোষ ত্রুটি নামে সংসারে কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় আছে। সেগুলির উল্লেখ মাত্রই দুরভিসন্ধির পরিচয় নয়। অন্ততঃ কোনো বিদেশী পর্যটক যদি কোনো দিন বলে থাকেন যে, বাঙালী হাসতে জানে না তবে আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে না আসাই ভালো। তাতে

বিক্রম যদি বা প্রকাশ না পায়, বিবেচনার পরিচয় মিলবে।

ভ্যালেন্টাইন চীরল যাঁরা পড়েননি এবং মিস মেয়োর নামটাও যাঁদের কাছে অজ্ঞাত তাঁদের মধ্যেও অনেকেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, বাঙালীর রসবোধ, ইংরেজীতে যাকে বলে সেন্স অব হিউমার, অল্প। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে হাসির চিহ্ন নেই। বাংলাদেশে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আছে শুধু আলপনায়, তাঁর বাহনটি দেখা যায় সর্বত্র।

পরলোকগত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। নামটা কিছুটা ভ্রমাত্মক। কারণ বইটির বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। পরবর্তী কালের সাহিত্যের উল্লেখ যা আছে তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং আলোচনাটা আংশিক। অবশ্য কারণটা বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সংখ্যা এত প্রচুর নয় যে তা নিয়ে তিন চার খণ্ড বই লেখা যায়। পঞ্চানন্দ থেকে পরশুরাম অবধি বছর অনেকগুলি, কিন্তু রসরচনা সামান্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা হয়। সেটা একেবারে নিরর্থক নয়। ঘটা করে ঐ শতকের কলকাতা কর্পোরেশানে প্রতি সপ্তাহে রাস্তার নাম বদলাতে যাঁদের নাম কাজে লাগে জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যায় এমন বাঙালী একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র ছাড়া সমস্তই তাঁদের কেউ এ শতাব্দীতে জন্মাননি।

চিন্তায় ও কর্মে আচার ও আচরণে বিগতযুগের বাঙালী পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহের গতিশীল উচ্ছলতায় মহিমান্বিত হয়েছিল। একালের মাপকাঠিতে সেকালের অনেক রীতি, নীতি, সংস্কার ও অনুষ্ঠান হয়তো অর্থহীন, অনাবশ্যক, এমনকি অশ্রদ্ধেয় মনে হতে পারে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সমস্ত সত্তা একটা বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির সতেজ প্রকাশের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। প্রাণ-চাঞ্চল্যের অজস্রতায় তাদের জীবন ও সমাজ সেদিন বসন্তের বহুপুষ্পিত তরুবীথিকার মতো একটা বেহিসেবী প্রাচুর্যের প্লাবনে ধন্য হয়েছিল। তাঁদের অন্দরে স্ত্রী, সদরে এয়ার এবং পরিবারে আশ্রিতের সংখ্যা যেমন ছিল একাধিক, তাঁদের আহার, ঔদার্য এবং অট্টহাসিও তেমনি ছিল অপরিমিত। ছেলেদের গোঁফ এবং মেয়েদের নথের মতো বাঙালীর জীবন থেকে হাসিও তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়েছে। তাই সাহিত্যে কমলাকান্ত, নাটকে নিমে দত্ত এবং সঙ্গীতে নন্দলালের কোনো পরিশিষ্ট নেই। ডি· এল· রায়ের পরে বাংলা ভাষায় কোনো হাসির গান রচিত হয়নি।

জানি, আধুনিক বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে লাভ নেই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব বৈভব অল্প, পরস্ব কলরব প্রচুর। তার অহঙ্কার তার মালার মণি নিয়ে নয়, গলার ধ্বনি নিয়ে। সুতরাং সাহিত্যের কথা থাক।

ইংরেজীতে একটা চলতি কথা আছে,—টেল মি দি কম্পানী হি কিপ্‌স, আই শ্যাল টেল ইউ দি পারসন্ হি ইজ। লোকটা কাদের সঙ্গে মেশে তা জানলেই বোঝা যায় লোকটা কী প্রকৃতির। প্রাচীন প্রবাদের ঈষৎ পরিবর্তন করে বলা যায়,—টেল মি দি প্রেস দি পিপল হ্যাভ, আই শ্যাল টেল ইউ দি পিপল দে আর। বাস্তবিক দেশের সংবাদপত্র দেখে দেশের মানুষগুলি সম্পর্কে অনেকটা সঠিক ধারণা করা চলে।

ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজী খবরের কাগজ 'হিকির গেজেট' বাংলা দেশে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আগে শুরু করলেই যে আগে থাকা যায় না একথা ঈশপের গল্পে কে না পড়েছে?

অপ্রীতিকর হলেও স্বীকার করা ভালো, ভারতবর্ষের ইংরেজী সাংবাদিকতায় বাঙালীর আসন প্রথম সারিতে নয়। যে ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক প্রথম পদ্মভূষণ, তিনি বাঙালী নন, যে ইংরেজী দৈনিকের সর্বাধিক সার্কুলেশান সে বাংলা দেশে নয়, এবং যে ইংরেজী সংবাদপত্র মুদ্রণ সৌষ্ঠবে প্রথম পুরস্কৃত সে বাঙালী পরিচালিত নয়।

কিন্তু দেশীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাঙালীর কৃতিত্ব আছে। সংবাদ পরিবেশন এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে বাংলা সংবাদপত্র অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার তুলনায় অগ্রগামী। বাঙালীর সমাজ ও জীবনের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্র ধীরে ধীরে অনন্য-সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং তার মধ্যে আধুনিক বাঙালীর জীবনধর্মের অনুসন্ধান করা বোধ হয় অসমীচীন নয়।

কিছুকাল পূর্বে এদেশে সদ্য আগত এক মার্কিন সাংবাদিক কথাচ্ছলে আমাদের ইংরেজী কাগজগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—ডাল, ড্রাই, ড্রিয়ারী। চমৎকৃত হয়েছিলাম। অনুপ্রাসের জন্য নয়, তাঁর প্রশংসনীয় পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য। শুধু চমৎকৃত নয়, শঙ্কিতও। আমাদের ভাগ্য ভালো যে ভদ্রলোক বাংলা পড়তে পারেন না।

বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা উৎসাহজনক। অবশ্য এদেশের মাপকাঠিতে। কিন্তু সেগুলি অনাবশ্যকরূপে হাস্য-লেশহীন। ধরনটা প্রায় সুনীতি সঙ্ঘের সভাপতির মতো, শুষ্কং কাষ্ঠং। মনে হয়, বুঝিবা সংসারে বীতরাগ নিরন্তর কোপন স্বভাব একদল এডিটর, সাব-এডিটর, রিপোর্টার ও প্রিন্টার ইত্যাদি মিলে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ বিরক্তিতে সেগুলি লিখে ও ছেপে বের করছে। হাসি নেই, চটুলতা নেই, কোথাও একটু লঘু পরিহাসের বাষ্প-মাত্র নেই। সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি থেকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন—শ্রীঅমুক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পর্যন্ত—সবই যেন রক্ত চক্ষু, রুক্ষ কেশ দুর্বাসা মুনির মতো কটমট তাকিয়ে আছে! আগে বছরে একবার অর্থাৎ পূজা সংখ্যাগুলিতে এই কঠোপনিষদের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটতো। সম্প্রতি একাধিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের চাপে সেখানেও রসরচনার ঠাঁই মিলে না।

সাধারণতঃ অবাঙালীদের প্রতি আমাদের মনে একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব আছে। মেড়ো শব্দটা মাড়োয়ারীর অপভ্রংশ, সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে আপত্তিকর নয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে সেটা শুধু মাড়োয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসীদের বোঝায় না। আসানসোলের ওপারে—বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ, এমনকি দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত ভূখণ্ডে যাদের বাস—তারা সবাই বাঙালীর কাছে মেড়ো এবং অনুকম্পার পাত্র। কথাটা আর যাই হোক খুব সম্মানার্থে ব্যবহৃত নয়।

আমাদের আর্থিক দুর্গতি নিয়ে বাইরের কেউ যখন খোঁটা দেয়, আমরা আর্যতেজে দর্পভরে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলি,—জান, আমরা ইনটেলেকচুয়্যাল জাতি? জান, আমাদের রবিঠাকুর ইত্যাদি ইত্যাদি। গলায় যাঁদের জোর কম এবং লজ্জা সরম যাঁদের একেবারেই খায়নি তাঁরাও অন্ততঃ মনে মনে ভাবেন, বড়বাজারের ঝুনঝুনওয়ালাদের ব্যবসা, বাণিজ্য বিরাট বাড়ি ও বিশাল গাড়ি আছে বটে কিন্তু কালচার নেই। বাঙালীর টাকা নেই, কিন্তু রিফাইনমেন্ট আছে। মেড়োদের কাছে চাঁদের চাইতে চাঁদির কদর বেশী। ছ্যা।

বাইরে কারো কাছে তর্কে হারতে বলিনে। কিন্তু ঘরে ফিরে একান্তে একবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে ক্ষতি কী? তামিল ভাষায় চৌষট্টি পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক কৌতুক পত্রিকা আনন্দ নিকেতনের প্রচার সংখ্যা দু'লক্ষ পঁচাত্তরের কাছাকাছি। বাংলায় হাসির পত্রিকা অধুনালুপ্ত সচিত্র ভারতের আকার, প্রচার ও স্থিতিকাল স্মরণ করতেও লজ্জা বোধ হয়। ব্যঙ্গ কৌতুকের লেবেল ললাটে এঁটে যে শনিবারের চিঠি সাহিত্যের আসরে নেমেছিল অল্পদিনেই তার চেহারা পাল্টাতে হয়েছে। অন্য আর পাঁচটা মাসিক পত্রিকার মতো পরে তারও ছিল গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে সন্ন্যাসীর বেশ, শিরে জটাজাল এবং বদন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নবজলধর আবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় গুরুগম্ভীর।

সম্পাদককে দোষ দেওয়া বৃথা। গভর্নমেন্ট সম্পর্কে একটি অতি পুরাতন উক্তি এই যে, দেশের লোক যে-রকম শাসনের যোগ্য ঠিক সে-রকম শাসনতন্ত্রই তারা পায়। এই খাঁটি কথাটা সংবাদপত্র সম্পর্কেও খাটে। কারণ একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সিনেমা প্রযোজকের দৃষ্টি যেমন বক্স আপিসের দিকে, পত্রিকা প্রকাশকেরও একটা চোখ থাকে সার্কুলেশনের খাতায়। অতি উৎসাহী সম্পাদককেও কিছুদিন পরেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে এদেশে রসের নিবেদনটা নিতান্তই অরসিকেষু।

জীবনে হিউমারের অভাবকে ত্রুটি বললে কম বলা হয়। তাকে বলা উচিত অভিশাপ। বাঙালীর সকল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সংক্রামিত। বাংলা নাট্যশালায় প্রহসন নামে কোনো বস্তু নেই। হাসির নাটক সেখানে মাঝে মাঝে যা অভিনীত হয় তা দেখে হাসা যায় না,—হাসি পায়। বাংলা সিনেমায় হাসাবার চেষ্টা তো রীতিমতো হাস্যকর।

যা হওয়া উচিত বা যা হতে পারত তার বিপরীত কিছু ঘটার মধ্যেই আছে হাসির উৎস। কিন্তু

অপ্রত্যাশিত ঘটনামাত্রই হাসির উপাদান নয়। দু'পায়ে চলা মানুষের রীতি। সুতরাং সার্কাসে যে লোকটা দু'হাতে ভর দিয়ে চলে সে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ তাতে অসঙ্গতির অংশটাই প্রধান। কিন্তু যে বিপুলকায় ব্যক্তি চলতে গিয়ে পথের কদলীবল্কলে পদস্খলন হেতু পতনটা একেবারে অসম্ভব নয়,—অস্বাভাবিক। মানুষের আকৃতি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা চিরন্তন ধারণা আছে। কেশশূন্য মস্তক, সুদীর্ঘ লম্বমান গুম্ফ ও উদরের বিরাট পরিধি সহ কর্নেল ব্লিম্প সে ধারণাকে অতিক্রম করে অথচ পুরোপুরি অবিশ্বাস্যের কোঠায়ও পৌঁছায় না। তাই কার্টুন হিসাবে সে সার্থক সৃষ্টি। সে হাসির উদ্রেক করে; কিং কং জাগায় বিস্ময়।

স্বাভাবিক যখন বিকৃত আকৃতি বা অভাবিত আচরণের মধ্য দিয়ে অসামঞ্জস্যরূপে দেখা দেয়, তখনই তা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। জাত বৈষ্ণবের কন্যা যদি সূত্রধরকে রন্ধনশালায় প্রবেশে বাধা দেয় তা হলে সেটা অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইনের আওতায় আসে কি না জানিনে। কিন্তু বিশ বছর এক সঙ্গে ঘর করার পরেও টগর বোষ্টমী যখন রেঙ্গুনের নন্দ মিত্রীকে শুধু সাত পাকের সোয়ামী নয় এই যুক্তিতে হেঁসেলে ঢুকতে দেয়না তখনই তা হাসির খোরাক যোগায়।

কোনো একটা বিশেষ বয়সে যুবকেরা প্রথমে বিয়ের প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এটা স্বাভাবিক। পরে কোনো একটি ধনীকন্যা অথবা রূপসী তরুণী দেখলে বিয়ের জন্য ব্যগ্র হয়। এতেও নূতনত্ব নেই। কিন্তু চুলের কাঁটা, গানের খাতা দেখা মাত্রই চিরকুমার সভার যে সকল সদস্যের কৌমার্যের অন্তিমদশা উপস্থিত হয় তাদের কাহিনী ন্যায্যতই প্রহসনের বিষয়।

আমাদের জীবনে এবং জীবনের নানা অভিব্যক্তিতে হাসির অভাবদ্বারা যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, আমরা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত তবে ক্ষোভ ছিল না। পরিতাপের বিষয়, চিন্তায়, কর্মে, জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আমরা অহরহ কেবলই হাসির উপকরণ পুঞ্জীভূত করে তুলছি। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্ত্রীর হিস্টিরিয়া নিরাময়ের জন্য স্বপ্নাদ্য মাদুলী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিত্তবান জমিদার-নন্দন কার্ল মার্কস উদ্ধৃত করেছেন, বাঘা বামপন্থী গভর্নমেন্টের পারমিট সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন এমন দৃষ্টান্ত ঝুরি ঝুরি। আমাদের মেয়েরা একই সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর উজ্জয়িনীর জনপদবধূদের অনুকরণে কঙ্কন এবং বিংশ শতাব্দীর মার্কিন তরুণীর অনুসরণে জাম্পার পরিধান করেন। ছেলেরা একাধারে জন্ম-নিরোধ ও ঠিকুজীতে বিশ্বাসী। ভোজনে একই সঙ্গে সুফলে ও সন্দেশ এবং কফুতায় কমিউনিজম ও জন্মান্তরবাদ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

হাসির কারণ হওয়া সহজ; হাসি উপভোগ করা কঠিন। প্রথমটির জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টির জন্য চাই নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরাসক্ত মনোভাব। সেটা অনুশীলন ও শিক্ষা সাপেক্ষ। মোহনবাগান শীল্ড ফাইনালে হারলে যেখানে বিষ খাওয়ার গল্প আছে, সেখানে আত্ম নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি সহজলভ্য নয়। এদেশে মতভেদ ঘটলে মনোভেদ হয়। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি ঘটে।

গ্রীষ্মে স্নিগ্ধকারী ও শীতে উষ্ণতাদায়ক রূপে বিজ্ঞাপিত এক পানীয় সম্পর্কে কোনো এক বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একদা একটু নির্দোষ রসিকতার আভাস ছিল। ফলে পরের দিনই পত্রিকায় ঐ কোম্পানীর মোটা টাকার বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্ট নাকচ হওয়ার উপক্রম। একটি নিরীহ রসরচনা প্রকাশের ফলে জনৈক তরুণ সাহিত্যিকের বন্ধুবিচ্ছেদ, স্বজন বিরোধ, এমনকি পত্নীলাভে বিঘ্ন ঘটেছিল, এমন জনশ্রুতি আছে। বিয়ের কথাবার্তা যখন প্রায় পাকা, শুধু পাঁজি দেখে শুভদিন নির্ধারণটুকু বাকী, তখন সম্ভবপর স্ত্রীর মেজদা পশুপতিবাবু হঠাৎ সম্বন্ধ ভেঙে দিতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবী বরের রচনায় "এ জগতটা এক বিচিত্র পশুশালা" এ লাইনটা তাঁকে লক্ষ্য করেই লেখা!

আমাদের রসবোধ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ নয় বলেই পরিহাসকে আমরা পরিবাদ জ্ঞান করি এবং সে কারণেই কৌতুক ও ভাঁড়ামির প্রভেদ বেশীর ভাগ বাঙালীর নিকট খুব পরিষ্কার নয়। পিঁড়ির নীচে সুপারী রেখে জামাইকে আছাড় খাওয়ানোকে আমাদের দেশে বলে রসিকতা এবং নির্জলা গালাগালিকে ঠাট্টা। নাটকে সিনেমায় কমিক বলতে বোঝায় পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বাঙাল উচ্চারণ;

বাসরঘরে রসিকতার অর্থ শ্যালিকার হাতে কানমলা। বাংলাদেশে সাংবাদিক আছেন, সাহিত্যিক আছেন, কবি ও শিল্পী আছেন একাধিক। নেই কার্টুনিস্ট। কলকাতায় বাজারে ল্যাংড়া আম, হেঁসেলে রাঁধুনী এবং রাস্তায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো দৈনিক কাগজের সার্থক কার্টুনও বাংলার বাইরে থেকে আসে।

প্রতিবাদের যুক্তি অনুমান করা কঠিন নয়। "বাঙালীর অভাব, অনটন, বেকার সমস্যা, অবাঙালীদের বাঙালী বিদ্বেষ, দিল্লী সরকারের উপেক্ষা ইত্যাদি"—বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের নিত্যকার অবলম্বন।

অভাব, অনটন আছে। হয়তো বেশী পরিমাণেই আছে। কিন্তু পাটালি গুড় বা জামদানী শাড়ির মতো দুঃখ দৈন্য তো একমাত্র বাংলাদেশেরই নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। দারিদ্র্যের তো কোনো সোল এজেন্সি নেই। উত্তর ভারতে দেখা যায়, মজুর মেয়েরা দিন শেষে গোধূলি বেলায় কর্মান্তে গৃহে ফিরছে। কেউ সারাদিন রাজমিস্ত্রীর কাজে ইঁট যোগান দিয়েছে, কেউবা মাটি কেটে পি-ডব্লিউ-ডির রাস্তা বানিয়েছে। কারো কাঁকালে শিশু কারো মাথায় পুঁটুলি বাঁধা বাজরা, কারোবা কাঁধে পথের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া জ্বালানি কাঠের আঁটি। ঘাগড়া দুলিয়ে বা আঁচল উড়িয়ে দল বেঁধে চলেছে। তাদের হাস্য পরিহাস এবং সম্মিলিত সঙ্গীতে পথঘাট আলোড়িত বললেই চলে। তাদের একটি সন্ধ্যার কাকলি কলরব দেখে বাঙালী পথিকের মুখব্যাদন দীর্ঘ হয়। বাজি রেখে বলা যায়, বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল থেকে প্রফুল্ল সেনের আমল পর্যন্ত বাংলা দেশের মুটে মজুরেরা একযোগে এতখানি হাসেনি। অথচ অনাহার ও অনটন সেদেশে কিছু অশ্রুতপূর্ব নয়। বাজপুতনার অনেক অঞ্চলে ওজন করে জল কিনতে হয়। এবং সেটা জলের দরে নয়।

জীবন যতিপতনহীন ছন্দোবদ্ধ কাব্য নয়। ব্যর্থতার ব্যথা ও পরাজয়ের বেদনা দ্বারা তা ক্ষণে ক্ষণে খণ্ডিত। জানি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা কঠিন। আপন পরাভবের গ্লানি নিয়ে হাস্যপরিহাস দুরূহতর। কিন্তু ফুটবল মাঠের দর্শকের মতো নিরাপদ দূরত্বে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে (হায়, ফুটবলের মাঠ কি আর নিরাপদ আছে? কোন একটি বিশেষ দল না জিততে পারলে রেফারীর তো কথাই নেই, দর্শকদের মধ্যেও অনেকের শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হতে কতক্ষণ। থান ইঁট বা সোডার বোতলকে যারা স্থাণু পদার্থ বলে জানেন তারা নিশ্চয়ই লীগ বা শীল্ড ম্যাচের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন!) যাঁরা সেই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা ও তার অগণিত ধাবিত যাত্রীদের অবলোকন করার সুযোগ পান সেই বাঙালী সাহিত্যিকেরা কি সেখানে কোনো হাসির উপকরণ দেখেন না? বিখ্যাত ইংরেজী রসরচয়িতার একটি বিশিষ্ট উক্তিতে আছে,—দুঃখ থেকেই হাসির জন্ম। স্বর্গে দুঃখ নেই, তাই সেখানে হাসিও নেই। স্বর্গে এখনও যাওয়া ঘটেনি; সেখানকার কোনো খবরও রাখিনে। কিন্তু বাংলাদেশ যে স্বর্গরাজ্য নয় একথা বোধহয় সবাই মানেন। অবশ্য মন্ত্রীমণ্ডলী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীরা ছাড়া।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর এস্কুইথ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। যুদ্ধের যখন অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্ত, জার্মেন অগ্রগতির মুখে ইংরেজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিধ্বস্তপ্রায়, তখন এক নিদাঘ সন্ধ্যায় তাঁকে এক বন্ধুগৃহে ব্রিজ খেলতে দেখা যায়। কাহিনীটি হয়তো সত্য, হয়তো বা কল্পিত। কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন যে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র, অপরিসীম বীরত্ব ও গোড়ায় বিস্ময়কর সাফল্যের পরেও জার্মেনী পরাজিত হয় এবং ইংরেজ সন্ধির শর্ত নির্দেশ করে, এই গল্পের মধ্যে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যে সকল দেশনায়ক দেশের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব অভিযোগকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান করে এই রূপ, রস, আলো ও গন্ধভরা জননী বসুন্ধরার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন এবং অহর্নিশি তারস্বরে 'ইনকিলাব' ধ্বনি দ্বারা গগন বিদীর্ণ করাকেই পৃথিবীতে একমাত্র সার জ্ঞান করেন তাঁরা নিশ্চয়ই নমস্য লোক। তাঁদের নিন্দা করিনে। কিন্তু সবিনয়ে তাঁদের এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, ধনুতে সর্বদা জ্যা যুক্ত করে রাখলেই তার তীরক্ষেপণ ক্ষমতা বাড়ে না, বরং কমে।

সমাজের অসচ্ছল শ্রেণীর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। বিত্তবানদের কথাই ধরা যাক। অর্থ যাঁদের অজস্র এবং অবসর যাঁদের অখণ্ড তাঁদের সংসারেও হাস্য পরিহাস আনন্দমুখর

পরিবেষ্টনটি সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। সম্পন্ন বাঙালী গৃহে ভোজের অনুষ্ঠানে দেখা যায়, অনুরোধ উপরোধে অতিথিকে ক'খানা মাছের ফ্রাই খাওয়ানো যায় গৃহকর্তার শুধু সেই উৎকণ্ঠা। পেটে জায়গা নেই ? আহা তবুও নিন না আর একখানা। পাতেই যদি কিছু পড়ে না রইল, তবে আর পাত পাতা কেন ?

যাঁরা নিমন্ত্রিত তাঁরাও এতেই অভ্যস্ত। তাঁরা আসেন, পংক্তিতে বসেন, আহার সমাধা করেন, তার পরে রুমালে হাত মুছে পান মুখে পুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম বা বাস ধরতে ছোটেন। না আছে দু'দণ্ড বসে বিশ্রম্ভালাপ, না আছে পরিহাসকুশল বাগবিভূতি। হাস্য, কৌতুক, গান, গল্প ও হাস্কাধরণের ক্রীড়াকৌশলের মধ্য দিয়ে যে বন্ধুসমাগমকে আনন্দ রসঘন করে তোলা যায়, একমাত্র গলদা চিংড়ির কাটলেটের উপরেই যে ভোজসভার উৎকর্ষ নির্ভর করে না এ তথ্য অনেক আধুনিক বঙ্গললনাই অবাঙালীদের কাছে শিখতে পারেন।

সামাজিক ভোজের নিমন্ত্রণে মেয়েরা যাঁরা আসেন তাঁরাও হাসিতে, খুশিতে, সহজ বাকপটুতা ও সাবলীল গতিতে বিশিষ্টা নন। অপাঠ্য উপন্যাসের অতিবর্ণাঢ্য প্রচ্ছদপটের মতো তাঁদের দ্যুতিও তাঁদের ঝলমল করা শাড়ি ও গয়নার মোড়কে। অকুণ্ঠিত পরিহাসপটু, সজীব ও নেকামিবর্জিত, সহজ, সতেজ, অথচ স্নিগ্ধ বাঙালী তরুণী প্রায় ভেজালহীন ঘি-এর মতো দুর্লভ এবং যদ্দরহীন নেতার মতো অভাবনীয়। তাঁরা বেশীর ভাগই স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের ছড়া বিশেষকে স্মরণ করিয়ে দেন।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আনন্দের অভাব সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। তাঁরা তিরস্কারের যোগ্য নন, কৃপার পাত্র। কিন্তু এ নীরস, নিরানন্দ জীবনযাপনকে যাঁরা আমাদের সারবত্তার অর্থাৎ সিরিয়াসনেসের পরিচয় জ্ঞান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁরা হয় জলে, স্থলে, অসীম নভোমণ্ডলে মাথায় রং। অন্ধকার গুরুভার। তাতে আছে কেবল ভয়। সে শুধু নীরস নয়, নিরেটও বটে। বসন্তে পীচের শাখায় অকারণ শিহরণ জাগিয়ে যে অজস্র ফুল ফোটে সেটা হিসেবী লোকের কাছে অনাবশ্যক চপলতা মনে হতে পারে। কিন্তু তারই পরিণতি ফল। বাবলার ডালে থাকে অসংখ্য কাঁটা। তাতে ফলের আশ্বাস নেই। আছে পট করে গায়ে বিঁধবার আশঙ্কা। সেটা যথেষ্ট সিরিয়াস সন্দেহ নেই, যদিও ভিন্ন অর্থে। বাস্তবিক, বিরসবদন মাত্রই বিদগ্ধ মনের প্রতীক নয়, ঠিক যেমন গেরুয়া বসন মাত্রই নয় সাধুত্বের গ্যারান্টি। সংসারে বেশীর ভাগ মুখই গোমড়া হয় বিজ্ঞতায় নয়, অজ্ঞতায়।

উত্তরাধিকার এবং পারিপার্শ্বিক—হেরিডিটি অ্যান্ড এনভারনমেন্ট—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি দ্বারা মানুষের প্রকৃতি প্রভাবান্বিত হয় সে সম্পর্কে একটা অন্তহীন তর্ক আছে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। তবে যুগধর্মটা দু'পক্ষই স্বীকার করেন। আধুনিক বাঙালীর জীবনদর্শন যুগের প্রভাব দ্বারা কতখানি চিহ্নিত সে প্রশ্ন সযত্ন গবেষণার অপেক্ষা রাখে। একথা ঠিক যে, তার জীবন ও সংস্কৃতি বর্তমানে নানা পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণে বিপর্যস্ত। যুগপরিবর্তনের মধ্যপথে সেটা অপরিহার্য। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণটি যেমন দিবসের দীপ্তি ও নিশীথের গাম্ভীর্য উভয় বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত, সমাজের বিবর্তনকাল—পিরিয়ড অব ট্র্যানজিশানও তেমনি নিষ্ফলা। পুরাতনকে বর্জন এবং নূতনকে গ্রহণ—এ দুয়ের কোনোটাই তখন পুরোপুরি হয়ে ওঠে না। ফলে যা দাঁড়ায় তা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণপর্বের ন্যায় করুণরসাত্মক।

বাঙালী জীবন ও সমাজে এখন এই প্রদোষকাল, যার না আছে প্রভা না আছে প্রশান্তি। আমরা ফরাস ছেড়েছি, কিন্তু চেয়ারেও সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইনি। কৌচের উপরেও পা তুলে না বসলে আমাদের আরাম হয় না। আশ্চর্য নয় যে, আমাদের সোফাসেটের কুশন বছর-খানেকের বেশী টেকে না।

দোটানার প্রতিক্রিয়া আছে আমাদের অশন, বসন ও আহারে, বিহারে। প্রাচীন সমাজে মজলিস নামে একটা ব্যাপার ছিল। সেখানে আলাপ আলোচনা সর্বদাই সুরুচির সীমানা মেনে চলতো, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাতে প্রচুর প্রাণ এবং প্রচুরতর হাস্যপরিহাসের সন্ধান মিলত। তাকিয়া, তামাক ও সতরঞ্জ সহ সে বারোয়ারী মজলিসগুলি কলকাতার রাজপথ থেকে

ফিটনগাড়ির মতোই অন্তর্হিত। অথচ ক্লাবকেও আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। ক্লাবে বাঙালী ব্রিজ খেলতে পারে, বড়া বা ছোটা পেগ হুকুম করতে পারে কিম্বা অত্যন্ত দুঃসাহসী হলে নিতান্ত পরিচিত একান্ত নিরাপদ পার্টনারের সঙ্গে দু'পাক ওয়লজ চেষ্টা করতে পারে ; প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। কারণ ক্লাব বস্তুটা আমাদের সমাজের গায়ে চেপে বসেনি, ডিনার জ্যাকেটের নীচে শার্টের স্টিফ ফ্রন্টের মতো খাড়া হয়ে আছে।

জগতে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা অনেক কিছুই আয়ত্তে আনা সম্ভব। কিন্তু হাসির ক্ষমতা আয়াসলভ্য নয়। কষ্ট করে ব্ল্যাক কফি গেলা রপ্ত হয়, কষ্ট করে কায়দামাফিক হাস্যবিকাশও অসাধ্য নয়। কিন্তু কষ্টকরে সহজ সরল হাসি হাসা যায় না। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পন্টেনিয়স। মার্কারের কাছে বিলিয়ার্ড বা কনভেন্টে পড়ে এ্যাকসেন্টের মতো সেটা শেখার বিষয় নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি আমরা একেবারেই অপদার্থ ?

নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, "আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাই পদার্থ !"

পরিবারে নূতন বধূটি আগন্তুক। বংশ বিচারে যেখানে স্বঘর এবং কোষ্ঠী অনুসারে যেখানে রাজযোটক, সেখানেও পিতৃপরিচয়ে সে ভিন্নকুলোদ্ভবা। স্বামীগৃহে গাছের ডালে পাতার মতো সে সহজাত নয়, জড়িয়ে-ওঠা লতার মতো বহিরাগত।

বাইরে থেকে এসেও এই বধূই ধীরে ধীরে ঘরের ঘরণী গৃহিণী হয়ে ওঠে। নূতন পরিবেশ ও পরিজনের সঙ্গে সে এক হয়ে মিশে যায়। তখন সে শ্বশ্রূকুলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছুকাল পরে নিজের পিতৃকুলের কথা তার নিজেরই বুঝিবা তেমন মনে পড়ে না। বাংলার পল্লী অঞ্চলে একটি অতিপ্রচলিত ছড়া আছে,—

কান্দিয়া কেন মর ?
আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।

সদ্যবিবাহিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় অশ্রুমুখী জননীকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাতনামা গ্রাম্যকবির এ রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষাতত্ত্বেও অনুরূপ গোত্রান্তরের দৃষ্টান্ত আছে। ভাষার উৎপত্তি এবং প্রসার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা জানেন, ধনের মতো ভাষারও বৃদ্ধি ঘটে সংযোজনে। বাস্তবিক, জগতের সমস্ত জীবন্ত ভাষায়ই ভাষান্তর থেকে শব্দ গ্রহণের চিহ্ন আছে। সেটা অপহরণ নয়, আহরণ।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি তাদের নিজস্ব নয়। বহু ব্যবহারের ফলে সেগুলি ক্রমশঃ ঐ সব ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাদের মূলের কথা সবাই ভুলে গেছে। কলম যে বাংলা শব্দ নয় একথা যাঁরা কলম চালিয়ে খান তাঁরাও অনেকেই জানেন না। ইঞ্জিন কথাটা আছে ওয়েবস্টার ডিক্সেনারীর পাতায়। কিন্তু বিহারের গণ্ডগ্রাম নিরক্ষর চাষীর কানেও সেটা আজ আর অশ্রুতপূর্ব নয়। শুচিধর্মী সনাতনী পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, যিনি জুতা, চিনি ও সাবান বর্জন করেছিলেন, তিনিও অবিচলিত চিত্তে রেল ব্যবহার করেছেন, অনাবশ্যক লৌহাবর্ত্মের খোঁজ করেননি। জয়প্রকাশ নারায়ণের দলহীন গণতন্ত্রেও ভোট বাদ দেওয়ার প্রস্তাব নেই।

আমাদের নিত্যব্যবহার্যের তালিকায়ও বহু বিদেশী দ্রব্যের স্বদেশীকরণ ঘটেছে। গডাদর চন্দ্রের মতো একই সঙ্গে যদিও নয়, আলু এবং তামাক আমরা অনেকেই খেয়ে থাকি। কিন্তু দুটোই যে গোড়াতে সাগরের ওপার থেকে এসেছে, সে খবর আমরা অনেকেই রাখিনে। ধুতিপরিহিত স্যালভেশান আর্মির মতো স্যালাড ও ক্যাপসিকামের গায়ে সাহেবী গন্ধটা এখনও আছে বটে। তবে যে পরিমাণে তারা এখন আমাদের লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে পরিদৃশ্যমান, তাতে আশা হয়, অদূরভবিষ্যতেই তারা পুঁইশাক ও ট্যাঁড়শের নায় নির্জলা নেটিভ রূপে গণ্য হবে।বিলাতী বেগুনের বিলাতিত্ব তো আছে কেবল নামে। কলকাতার নাহার, মহাতব বা বর্মনদের অবাঙালীত্ব যেমন শুধু পদবীতে।

বর্তমানে ভারতীয় সমাজে 'জন্মদিন' নামে একটা নূতন উৎসবের প্রচলন হয়েছে। ক্রিকেট ব্যাট ও গ্রিটিংস্কার্ডের মতো এটাও আমরা ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। কংগ্রেসী রাজত্বে দেশে বিলাতী জিনিসের উপরে ইম্পোর্ট কন্ট্রোল আছে, বিলাতী প্রথার উপরে নেই। দিল্লী, সিমলা বা মুসৌরীতে অভিজাত হোটেল, রেস্তোরাঁয় সালোয়ার কামিজ-পরা পাঞ্জাবী নিতম্বিনীদের 'টুইস্ট' দেখলে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অতি আধুনিকতাই একমাত্র বস্তু যা আমদানী করতে ফরেন এক্সচেন্জ লাগে না।

অবশ্য 'জন্মোৎসব' এদেশে অভূতপূর্ব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এ অনুষ্ঠানটি অজ্ঞাত ছিল না। তবে সেটা একান্তভাবে দেবদেবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যুগযুগান্ত ধরে ধর্মপ্রাণ হিন্দুনরনারী জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করে আসছেন। আজও ক্রিসমাসে খ্রীস্টের অনুগামীরা যিশুর জন্মক্ষণটিতে গীর্জায় হাই-মাস এ যোগ দিয়ে থাকেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধদেবের জন্মতিথি। সে দিনটিতে দেশদেশান্তরে বৌদ্ধশ্রমণদের সম্মিলিত কণ্ঠে ওঠে ভগবান

তথাগতের স্তব-ধ্বনি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

প্রতি বৎসর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়, পন্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দের। গভীর অনুরাগে ও নিষ্ঠায় থিরুমানমালাইতে রমণ মহর্ষির জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেন তাঁর অগণিত শিষ্য শিষ্যার দল। তাঁরা পুরাণোক্ত ঠাকুর দেবতার ন্যায় পূজনীয়। দেব না হলেও দেবতুল্য।

হাল আমলে ভক্তির ধারা বদলেছে। এখন দেবতারা পাণ্ডার এবং দ্বিজরা চাকরির অধীন। তাঁরা স্বভাবতঃই ভক্তির অতীত। কিন্তু জগতে কোন স্থানই শূন্য থাকে না। ভ্যাকুয়াম অসম্ভব শুধু ফিজিক্সে নয়, মেটাফিজিক্সেও। তাই ভজন, পূজন, আরতি, আরাধনার ক্ষেত্র এখন ধর্মজগৎ থেকে কর্মজগতে স্থানান্তরিত। কর্মটা অবশ্য রাজকর্ম।

অতীতে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল। রাজাজয়ে ইসলামের একহাতে ছিল তলোবার অন্যহাতে কোরান। য়ুরোপে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের ভারকেন্দ্র ছিল চার্চের পুলপিটের তলায়। রাজাশাসনে রাজার চাইতে রাজগুরুর গুরুত্ব অধিক ছিল। দৃশ্যতঃ একজন রাজদণ্ড ধারণ করতেন, কার্যতঃ অন্যজন তা চালনা করতেন। কার্ডিন্যাল রিশলু ধর্মযাজক ছিলেন কি, রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মনেও সন্দেহ জাগতে পারে।

অতীতের ভারতবর্ষেও কি রাষ্ট্রতন্ত্রে ধর্মমতের ছাপ লেগেই বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন ঘটেনি? মুসলিম শাসনে হিন্দুদের মাথায় যে জিজিয়া করের বোঝা চেপেছিল তার পিছনে কি ছিল রাজস্বের প্রয়োজন না বিধর্মী বিদ্বেষ?

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে একালের রাজনীতিতে ধর্মনীতির চাইতে অর্থনীতির প্রভাব বেশী। হবেও বা। অর্থ না থাকলে যে রাজনীতি অর্থহীন একথা ইলেকশানে ধরাশায়ী রাজনীতিকেরা সবাই বলেন।

বর্তমানে ধর্মের ঐক্য রাজনৈতিক মৈত্রীর গ্যারান্টি নয়। ইংরেজ ও জার্মেন দুইই ভগবান খ্রীস্টের উপাসক। অথচ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে দু' দু'টো মহাযুদ্ধ বাধাতে তাদের বাধেনি। পাকিস্থান ও আফগানিস্থানের কর্তৃপক্ষের ধর্মের মিল সত্ত্বেও মনের মিল ঘটেনি। তবুও একথা মানতেই হবে যে, বেশীর ভাগ দেশেই রাষ্ট্রনীতি আজও সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিযুক্ত নয়। বিধর্মীনির্যাতনের দৃষ্টান্ত হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়নি। এমন রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রাত্যহিক যেখানে পরোধর্ম সত্যি সত্যিই ভয়াবহ।

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের জন্মভূমি ব্রিটেনেও রাজা বা রানীকে ডিফেন্ডার অব ফেইথ না হয়ে উপায় নেই। ক্যান্টরবেরীর আর্চবিশপের মাইনে আসে রাজকোষ থেকে। সেদিক দিয়ে তিনি রাজানুচর। কিন্তু তাঁর বিরোধিতায় এই শতকেও রাজাকে ছাড়তে হয়েছে সিংহাসন, রাজকন্যাকে ছাড়তে হয়েছে প্রেমাস্পদ।

সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিধি যে সব দেশে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকৃত সেখানেও সংখ্যালঘুদের সমস্যা রাজনীতিকে ধর্মের ছোঁয়াচ দিতে ছাড়ে না। মাইনরিটি কথাটা আসলে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিভাগেরই ভদ্র পরিভাষা। সম্ভ্রান্ত হোটেলে টিপস্‌কে যেমন বলা হয় সার্ভিস চার্জেস এবং বাথরুমকে টয়লেটস।

একথা ঠিক যে, এযুগের অগ্রগামী চিন্তাধারায় ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচির বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। তার সামাজিক বা সমষ্টি জীবন মৌলিক ন্যায় ও নীতিবোধের পরিবর্তে ধর্মীয় কিংবা লৌকিক অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এ ধারণা একালে অগ্রাহ্য। অন্ততঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো একটি ধর্মমতকে মূলমন্ত্র করে তুলতে শিক্ষিত সমাজের রুচিতে বাধে। দেশে ধনতন্ত্র চাই কি গণতন্ত্র চাই তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। আর যাই হোক, মোল্লাতন্ত্র যে চাইনে সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই,—দু একটা দেশে ছাড়া।

তবুও গয়লার দুধ থেকে জল বাদ দেওয়ার ন্যায় রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ কাজ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিকে ধর্মবিরহিত করার চেষ্টায় রাজনীতিই এখন ধর্ম হয়ে উঠেছে। গডের জায়গা দখল করেছে ডেমিগড। বিশ্বপতির স্থানে দলপতি। কনফেশান ও অবতারবাদে ক্যাথলিকদেরও হার মানায় এমন রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। প্রসিলিটাইজেশানের অত্যুগ্র আগ্রহে তারা মধ্যযুগের ধর্মান্ধতাকেও লজ্জা দেয়।

মাথা বেশী ঘামালেই যেমন মাথাধরার আশঙ্কা, তেমনি ধর্মের মাতামাতি অধিক হলেই ধর্মান্ধতার উদ্ভব অনিবার্য। মত ও পথের দিক দিয়ে ক্যাপিটালিজম ও সোসিয়েলিজমের মধ্যে আকাশ-পাতাল দূরত্ব। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমে অহি-নকুল সম্বন্ধ। কিন্তু সব ইজমেরই এক ও মিখাইল মলোটভ বা জর্জি ম্যালেঙ্কফ পদচ্যুত।

ভারতবর্ষে গান্ধী চেয়েছিলেন সত্যবাদ, নেহরু চান সাম্যবাদ। কিন্তু দেশের জলবায়ুতে যা আছে সে হচ্ছে ভক্তিবাদ। এখানে হাকিম থেকে পিয়াদা, বট থেকে তুলসী এবং গো থেকে গোময় সমস্তই পূজনীয়। পতিমাত্রই পরম গুরু এবং গেরুয়ামাত্রই গরিয়সী। আমাদের রাজনীতিতেও যুক্তির চাইতে ভক্তির ভাগ বেশী, প্রশ্নের চাইতে প্রণাম। তাই এখানে নেতারা নবী হন ; ভোটাররা ভোটারী। গান্ধী ইতিমধ্যেই গণেশে পরিণত। সিদ্ধিদাতা। সকল কাজেই তাঁর নাম নিতে হয়। নইলে ইলেকশান সিদ্ধ হয় না।

স্বর্গস্থ ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর নয়। মর্তের দেবতা অথবা উপদেবতারা পার্থিব সংজ্ঞায় অনেক বেশী সত্য। বহুরূপে বিরাজিছে সম্মুখে তোমার। ত্রিকোণ কাঁচের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মতো তাঁদের মাহাত্ম্য চাকরি, প্রমোশন, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় ভক্তদের পানে বিচ্ছুরিত। আশ্চর্য নয় যে, রাষ্ট্রনায়কদের জন্মোৎসব ক্রমশঃ হোলী বা দেয়ালীর মতো বার্ষিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে।

সেকালে গ্রামে গঞ্জে বারোয়ারি তলায় কবি, যাত্রা বা পালাকীর্তন হতো। একালে শহরের ক্লাব ও সমিতিতে নেতাদের জন্মদিন হয়। পাড়ায় পাড়ায় সবজনীন দুর্গোৎসব বা সরস্বতীপূজার মতো এগুলি সংখ্যায় যেমন বহুল আড়ম্বরেও চমকপ্রদ। বিয়ের লগনসায় বাজারে মাছ দুর্ঘট এবং দৈ সন্দেশ দুর্মূল্য হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নেতাজী জন্মোৎসব বা নেহরু-জন্মতিথিতে রজনীগন্ধার দাম বাড়ে, সভাপতি দুষ্প্রাপ্য হন।

জন্মদিনকে পারিবারিক গণ্ডিতে নিয়ে আসেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ এবং বিলাত ফেরতা ক' ভাই, ডি· এল· রায়ের ভাষায় যারা সাহেব সেজেছে সবাই। কিন্তু জগতে নিম্নগামী শুধু জল নয়, ফ্যাশনও। ধনীর প্রাসাদ থেকে মধ্যবিত্তের ফ্লাটে পৌঁছে যেতে তার বিলম্ব ঘটে না। তারতম্য যেটুকু থাকে সেটুকু দামের। অবলীলাক্রমে মোটা অঙ্কের চেক লিখে র‍্যাম্কিন বা ফেলপস্ এর দক্ষিণা যোগানো যাদের সাধ্যাতীত, তারা কলেজ স্ট্রীটে বা মেটিয়াবুরুজের দর্জির হাতে দেহ সমর্পণ করে লাউঞ্জ সুটের শোক নিবারণ করে। গ্রেট ইস্টার্নে লাঞ্চ বা অশোকায় ডিনার যাদের কাছে অনধিগম্য, তারা মহামায়া কেবিন বা দিলখুশ রেস্টুরেন্টে মাটনচপের সন্ধানে ছোটে। মধুর অভাবে গুড়-এর বিধি সকল শাস্ত্রেই আছে। দুধের স্বাদ ঘোলে না মিটতে পারে ; কিন্তু দুধ যেখানে মোটেই জোটে না সেখানে শেষ পর্যন্ত পিটুলিকেই দুধ বলে চালাতে হয়, এ তথ্য মহাভারতের বৃদ্ধরাও জানতেন।

সুখের বিষয়, শিশুদের আনন্দ বস্তু বা বিষয়েই সীমাবদ্ধ। সেগুলির আনুপাতিক মর্যাদা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। ম্যাডাভিল গার্ডেনসে জজসাহেবের বাংলোতে ছেলের জন্মদিনে আসে ঘুরি

থেকে কেক বা ফ্যারিজিনি থেকে কারিপাফ্। বকুলবাগান রোডে উকীলবাবুর বাড়িতে আসে শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সিঙ্গারা বা সন্দেশ। মায়েদের কাছে এটা মনোবেদনার কারণ হতে পারে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ যদি কিছু থাকে তবে সেটা নিছক স্বাদের।

কিশোর জীবনে জন্মদিন অনুষ্ঠানটি সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নতুন পরিচ্ছদ বা লোভনীয় আহার্যের দিক দিয়ে গৃহে যে-কোনো পূজা পার্বণ বা সামাজিক উৎসবই ছোটদের পক্ষে আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু সে উৎসবে তাদের কোন বিশিষ্ট অংশ নেই। সেখানে তারা বড়দের আনুষঙ্গিক মাত্র। সংবাদপত্রের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাদের উল্লেখ থাকে না। একমাত্র জন্মদিনেই কিশোরের নিজস্ব ভূমিকা আছে এবং সে ভূমিকাটি অপ্রধান পার্শ্বচরিত্রের নয়,—মূল নায়কের। সেদিনের আয়োজন, আমন্ত্রণ, আনন্দ, কলরব সমস্তই তাকে কেন্দ্র করে। সে দিনটিতে সে রাজার রাজা রাজাধিরাজ। তাই জন্মদিনের জন্য বাল্যকালের আগ্রহ ও উত্তেজনা তুলনাহীন। প্রতীক্ষারত কিশোর মানসে বৎসরে তার আগমনটি সপ্তাহের শেষে রবিবারের মতো যেন বহুবিলম্বিত। তার স্থিতিকালও যেন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। বছরের অন্য দিনগুলির যাবার তাড়া নেই, অথচ জন্মদিনটি ভোর থেকে দুপুর, এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যায় গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়। মনে হয়, ঘন্টাগুলো বাজায় যেন আধঘন্টার পরে।

জন্মদিনে আধুনিক যুগের সমানাধিকারবাদের পরিচয় আছে। উত্তর ভারতে ভাইদোজ ও বাংলাদেশে ভাইফোঁটায় ছেলেদের সমাদর। সেঁজুতি বা মাঘমণ্ডল ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য। জন্মদিনই একমাত্র উৎসব যা ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত। অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা হিন্দুকোডের আগেই প্যারিটি লাভ করেছিল।

ধর্মভেদে সামাজিক প্রথার বিভেদ ঘটে, স্থানভেদে দেশাচারের। বাংলায় আছে নবান্ন, তামিলনাদে পোঙ্গল, পাঞ্জাবে ধূলন্ডী। জন্মদিন কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নয়। আধুনিক মতি-গতি যাঁদের তাঁরা শিলং থেকে সৌরাষ্ট্র এবং কাশ্মীর থেকে কেপ কমরীন যেখানেই থাকুন, সেখানেই জন্মদিনের প্রসার ঘটেছে। দেশে সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতীক আগে ছিল কংগ্রেস, এখন হয়েছে করাপশান। আশা করি ভবিষ্যতে হবে বার্থডে পার্টি। ইমোশন্যাল ইন্টিগ্রেশানের নামে যাঁদের চক্ষে অশ্রুর বন্যা বয়, একথাটা তাঁরা মনে রাখতে পারেন।

জগতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরই অন্তরের কামনা, জন্মদিনটা আরও ঘন ঘন আসুক। হায়, তারা তো কল্পনা করতে পারে না যে তাদের জীবনেই এমন এক সময় আসবে যখন প্রতিটি জন্মদিনের মধ্যেই থাকবে আসন্ন বার্ধক্যের ক্রমিক পদক্ষেপ। সেটা তখন যৌবনের ফেয়ারওয়েল পার্টি ; জরার ট্রাফিক সিগন্যাল। বয়স বাড়ছে এ অনুভূতি জীবনের পূর্বাহ্নে যেমনই আনন্দদায়ক, অপরাহ্নে তেমনি অপ্রীতিকর। দাদার চেয়ে অনেক বড় হওয়ার সাধ বড় হয়ে বাবার মতো হলে আপনিই উবে যায়।

চেষ্টা ভিন্ন সংসারে কোনো কিছুই মেলে না। কিন্তু না চাহিতে যারে পাওয়া যায় সে সাদা চুল। টাকার জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন, টাকের জন্য নয়। ধারের সুদের মতো বয়স আপনি বাড়ে। সেটা কমানোটাই সমস্যা। লাইফ ইনসিওরেন্সে নকল কোষ্ঠী, গভর্নমেন্টের আপিসে এফিডেভিট এবং দ্বিতীয় পক্ষে কেশে কলপ লেপনের দ্বারা বয়সের ঊর্ধ্বগতি গোপনের জন্য লোকের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে জন্মবার্ষিকীতে উৎসবের পরিবর্তে হরতাল করা উচিত। মায়ের মাথায় পনিটেল এবং দিদিমার গায়ে রঙিন শাড়ির মতো একটা বিশেষ বয়সের পরে 'জন্মদিন'টা হাস্যকর। ট্রেনে, বা এরোপ্লেনে যেমন হাফটিকিটের বয়স বাঁধা আছে জন্মদিনেরও তেমনি একটা সিলিং থাকা ভালো।

সম্প্রতি জন্মবার্ষিকীটা ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানেও সংক্রামিত হয়েছে। নৌবহরের প্রতিষ্ঠা

দিবসটি প্রতিবৎসর নেভি-ডে রূপে পালিত হয়। কলেজ-ডে বিদ্যায়তনের জন্মতিথি। বিশেষ সংখ্যা বা অন্ততপক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দ্বারা যে নববর্ষ উদযাপিত হয় সে মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিকপত্রের জন্মবার্ষিকী।

প্রাণীমাত্রেরই বেঁচে থাকার একটা সীমানির্ধারিত আছে। গুরুজনের আশীর্বাদ ও প্রিয়জনের প্রার্থনায় প্রত্যেক মানুষেরই শতায়ু হওয়ার কামনা থাকে। কিন্তু সেক্ষুরিটা যে হামেশাই ঘটে না একথা অন্তত ব্যাটসম্যানেরা জানেন। সর্বাধিক দীর্ঘজীবীর দেশ সিটজিল্যান্ডেও মানুষের গড়পরতা আয়ু বাষট্টি বছর মাত্র। গ্রীষ্মপ্রধান ও অনগ্রসর দেশে তার পরিধি হ্রস্বতর। সরকারী চাকরিতে এক্সটেনশন মেলে,—মন্ত্রী সহায় থাকলে। মহাকালের দরবারে সময় পার হলেই রিটায়ারমেন্ট।

পৃথিবীতে দিনের অন্তে আসে রাত, রাতের সমাধিতে দেখা দেয় দিনের উজ্জ্বল আভাস। আলো ও অন্ধকারের এই ক্ষান্তিহীন পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধরিত্রী আপন অঙ্কপথে ধীরে নিশ্চিত গতিতে সাঙ্গ করে সূর্য পরিক্রমায় একটি আবর্তন। শীতের বাতাসে তরুশাখা থেকে পরিত্যক্ত পীতপত্রের মতো ক্যালেন্ডারের সর্বশেষ পাতাটি পড়ে খসে। মানুষের বয়সের অঙ্কে ঘটে যোগ, জীবনের পুঁজিতে ঘটে বিয়োগ। বয়োবৃদ্ধির মানেই তো আয়ু হ্রাস।

পত্রিকার কোনো ধরাবাঁধা আয়ুষ্কাল নেই। তার জীবন তার কর্তৃপক্ষের আর্থিক সচ্ছলতা, পরিচালন নৈপুণ্য ও সাময়িক অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বোধ হয় সে কারণেই প্রেস রেজিস্ট্রারের কাছে পত্রিকার হিসাব থাকে, ডেথ-রেজিস্ট্রারের কাছে নয়, যদিও তার মৃত্যুর হার যে কোনো এপিডেমিকের সমতুল্য। ভারতবর্ষ শিশু-মৃত্যুর দেশ। এখানে সন্তান থেকে লিমিটেড কোম্পানী বেশীর ভাগের আঁতুড়েই অন্তিম। মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ইত্যাদিও এখানে নিত্য গজায়, নিত্য শুকায়। উদ্ভিদতত্ত্বে ওষধির ন্যায় কোনো কোনো পত্রিকার আবির্ভাব সংখ্যাই অন্তর্জলি সংখ্যায় পরিণত হয়।

সংবাদপত্রের পক্ষে সুবিধা এই যে, প্রাচীনতা তার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। সংসারে ওল্ড-ফুলদের কেউ পাত্তা দেয় না, কিন্তু ওল্ড ওয়াইনের কদর অসাধারণ। কবিরাজের কাছে পুরানো ঘি সেরের বদলে ভরি দরে বিক্রি হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাড়ে। তাই তার প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকে,—স্থাপিত আঠারশ' বিরানব্বই সাল, অথবা প্রকাশের অশীতিতম বৎসর। ঠিক যেমন থাকে ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর লেটারহেডে, জামাকাপড় বা মনোহারী দোকানের সাইনবোর্ডে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংবাদপত্রের কোথাও কোনো মিল আছে এমন ইঙ্গিত মাত্রেই সংবাদপত্রের পাঠকেরা বিস্মিত, মালিকেরা ক্রুদ্ধ এবং সম্পাদকেরা ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু এ দুয়ের সাদৃশ্য বাহ্যত যতখানি প্রতীয়মান ভিতরে তার চাইতে অনেক বেশী গভীর এবং সে সাদৃশ্য একান্ত আকস্মিকও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংবাদপত্রকে ফোর্থ এস্টেট বলা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সভ্যজগতে একটি অতি বাঞ্ছিত অধিকার এবং একমাত্র কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র ও সামরিক শাসন ব্যতীত সমুদয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা স্বীকৃত। অতীতে সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছে বৃত্তিরূপে নয়, ব্রতরূপে। কিন্তু প্রারম্ভের সঙ্গে পরিণতির সব সময়ে সঙ্গতি থাকে না। গাছের মূলের সঙ্গে ফুলের মিল কতটুকু? উৎস আর সঙ্গমে নদীর রূপ কি এক?

প্রাচীনপন্থীরা বলেন বর্তমানটা কলিযুগ। নবীনপন্থীদের ভাষায় এটা যন্ত্রযুগ, কলি নয় কলীয়। প্রকৃতপক্ষে এখন বৈশ্য যুগ। কমার্শিয়াল এক্সপ্লয়টেশান—ব্যবসায়িক প্রয়োগ ছাড়া একালে কোনো কিছুরই সার্থকতা নেই। টুরিস্ট আকর্ষণের কাজে না লাগালে নয়ন-ভুলানো প্রকৃতির

শোভাও বৃথা গণ্য হয়। তাই লেকের জলে প্যাডলো, পাহাড়ের গায়ে ফিউনিকুলার ও সমুদ্রতীরে হোটেলের পসরা সাজায়ে বসে রূপোপজীবীনীদের ন্যায় দেশজননীরাও এখন পরদেশীদের হাতছানি দেয়,—এস এস বঁধু, আধ আঁচরে বোস, নয়ন ভরিয়া আমা দেখ।

যুগধর্মে চিত্রকরকে হতে হয় বিজ্ঞাপনের ডিজাইনার, গায়িকাকে প্লে-ব্যক সিঙ্গার, টেনীস চ্যাম্পিয়ানকে উইম্বেলডনের সেন্টার কোর্ট থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, জ্যাক ক্রামারের ঝুলিতে। যেকালে স্কুল ফ্যাক্টরীতে এবং দেশসেবা ইনভেস্টমেন্টে পরিণত সেকালে সংবাদপত্রকেও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর খাতায় নাম না লেখালে চলে না।

ফ্রিডম অব দি প্রেস বলতে যা বোঝায় তা হলো শুধু সরকারী কর্মচারীদের এলোপাতাড়ি গাল পাড়ার অধিকার। নতুবা অন্য যে কোনো ব্যবসায়ীর মতো পত্রিকার স্বত্বাধিকারীরও মাসের শেষে কাগজের দাম, ব্লকের খরচ, বিজলীর বিল মেটাতে হয়। নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত দিনে লোকজনের মাইনে কড়ায় গণ্ডায় না চুকিয়ে দিলে পেমেন্ট অব ওয়েজেস এ্যাক্টে তার সাজার ব্যবস্থা আছে। সংসারে আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো সাংবাদিকেরাও ক্ষুধা তৃষায় কাতর, আধিব্যাধিতে ক্লিষ্ট এবং পুত্রকলত্রের ভরণপোষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন। সুতরাং সাংবাদিকতা যদি মিশন থেকে প্রফেশানে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তবে তাতে লজ্জার কারণ নেই। সংবাদপত্র কবির ভাষায় কথার বাণ্ডিল হতে পারে। কিন্তু কথার পিছনে যদি অর্থ না থাকে তবে তা নিতান্তই অর্থহীন।

অতীতে পূর্বপুরুষদের দিনের শুরু ছিল পাঁজিতে। বর্তমানে আমাদের দিনের আরম্ভ খবরের কাগজে। প্রভাতে গরম চায়ের পেয়ালার সঙ্গে দৈনিক পত্রিকার যোগাযোগ প্রায় অবিচ্ছেদ্য। হুইস্কির সঙ্গে যেমন সোডা, গানের সঙ্গে যেমন হারমোনিয়াম। পঞ্জিকা ও পত্রিকার সাদৃশ্য শুধু অনুপ্রাসে নয়, নানা দিকে তারা সমধর্মী। ব্যবহারের মিয়াদে উভয়েই ক্ষণস্থায়ী। বৈশাখের নূতন পঞ্জিকা চৈত্রের শেষেই ঘরের কোণে অনাবশ্যক পুরাতন জঞ্জাল। রবিবারের পত্রিকা সোমবারেই মুদির দোকানে সওদা বাঁধার সরঞ্জাম।

পত্রিকা এবং পঞ্জিকা দুইই মানুষের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়ে। পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্ধবিশ্বাসের উপর। বৎসরের কোনো একটি বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ে গঙ্গায় ডুব দিলেই পরিণামে অক্ষয় স্বর্গলাভ,—এ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল। তাই পঞ্জিকা দূরদূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে চূড়ামণি যোগ এবং মকরসংক্রান্তিতে দশাশ্বমেধের ঘাট বা ত্রিবেণী সঙ্গমে টেনে আনতে পারে। পত্রিকার প্রসার আমাদের অন্ধবুদ্ধির অনুসরণে। সে ভগবানের নামে নিরীহ পথচারীর পিঠে ছোরা বসিয়ে দেওয়ার প্ররোচনা এবং শান্তি আন্দোলনের নামে দূতাবাসের দরজায় চড়াও হতে উৎসাহ জোগায়।

সম্পাদক ও পঞ্জিকাকার উভয়েই সর্বজ্ঞ। পঞ্জিকাকারের ক্ষেত্র আধ্যাত্মিক। কত দন্ড কত পল গতে উত্তরে যাত্রা নাস্তি সে খবর তিনি জানেন। কোন তিথিতে বার্তাকুভক্ষণে কী দোষ স্পর্শে তারও হদিস আছে তাঁর কাছে। সম্পাদকের কারবার আধিভৌতিক। তিনি হনলুলুর রাষ্ট্রবিপ্লব, নাইজেরিয়ার সাহিত্য এবং ল্যাপল্যান্ডের শিল্পকলা সম্পর্কে সমান পান্ডিত্যপূর্ণ মতামত দিতে পারেন। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, পাটের বাজার, বাট্টার হার ইত্যাদি জগতের সমুদয় ব্যাপারে তাঁর যদৃচ্ছ বাগবিস্তারের ক্ষমতা আছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন রিভার ভ্যালী প্রজেক্টের মতো তাঁদের লেখনীও মালটি-পারপাস।

পঞ্জিকায় আকাশের গ্রহ উপগ্রহের গতি-বিধির নিশানা আছে। বৃদ্ধ পিতামহের কাছে সে তথ্য বিশেষ মূল্যবান ছিল। পুনর্বসু নক্ষত্র ঠিক কখন বৃশ্চিকে সঞ্চারিত হবে সে খবরটুকু ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডের মাপে না জানলে তাঁর পক্ষে হলকর্ষণ, নৌকাযাত্রা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি কোন শুভ কর্মেই হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানের পৌত্রপৌত্রীরা ওসব নৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে না।

তারা তারকা বলতে বোঝে চিত্র তারকা। তাঁদের হাঁড়ির খবর থাকে পত্রিকার পাতায়। বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিকের তা জীবনীরস,—রুগ্ন শিশুর পক্ষে যেমন গ্লুকোজ, চলন্ত মোটরগাড়ির পক্ষে যেমন গ্যাসোলীন।

ট্যাক্সির দাপটে যেমন শহরের রাজপথ থেকে ছ্যাকড়া গাড়ি বা টাঙ্গা অন্তর্হিত, পত্রিকার চাপে তেমনি পঞ্জিকা বাঙালীর গৃহচ্যুত। হায়, পঞ্জিকার ক্রমিক অবলুপ্তির ফলে হাঁচি, টিকটিকী, মঘা, অশ্লেষা, ঝাঁড়ফুঁক ইত্যাদি আমাদের সনাতন জাতীয় ঐতিহ্যও বিনষ্টপ্রায়। মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় একাধিক কমিটি, কমিশন গঠিত হয়েছে। পঞ্জিকা পূর্ব গৌরব উদ্ধারের জন্য অনুরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। এজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে অবিলম্বে একজন তিন পোয়া মন্ত্রী অর্থাৎ মিনিস্টার অব স্টেট নিযুক্ত করা আবশ্যক। পঞ্চায়েত মন্ত্রী অপেক্ষা পঞ্জিকামন্ত্রী নিশ্চয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁদের অধীনে ডিরেক্টার জেনারেল, ডিরেক্টার, জয়েন্ট ডিরেক্টার, ডেপুটি ডিরেক্টার ইত্যাদি সহ এক একটি মিনিস্ট্রী বা ডিপার্টমেন্ট অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বলাবাহুল্য, প্রাচীন তাঁতশিল্প, মৃৎ শিল্প প্রভৃতির ন্যায় পঞ্জিকার পুনঃ প্রচলনও একমাত্র যুগোপযোগী সংস্কারের দ্বারাই সম্ভব। আধুনিকীকরণ ছাড়া কোনো পুরানো বস্তু বা প্রথাই এযুগে আর গ্রহণযোগ্য হবে না। মডার্নাইজমের দাবীতেই এখন চানাচুর প্যাকেটে, সন্দেশ বাক্সে এবং ময়দা পলিথীনের ব্যাগে বিক্রী হয়। গরুর গাড়িতে রবার টায়ার ও চরখায় বল বিয়ারিং দেখা যায়। সুতরাং পঞ্জিকারও যথোচিত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন পঞ্জিকায় বর্ষারম্ভে লেখা থাকে শনি রাজা মঙ্গল মন্ত্রী ইত্যাদি। পরিবর্তিত সংস্করণে সে স্থলে হবে মেট্রোগল্ডুইন রাজা প্যারামাউন্ট মন্ত্রী। ফলং সিনেমাহলের টিকেট কাউন্টারে কিউ বৃদ্ধি। প্রচলিত পঞ্জিকায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের উল্লেখ থাকে। অধুনা মহাপুরুষদের ডেফিনেশান অর্থাৎ সংজ্ঞা বদলে গেছে। সুতরাং মডার্ন পঞ্জিকায় লিখতে হবে—সাতই বৈশাখ ওয়াহিদা রেহমান বা ব্রিগেড বার্ডোটের জন্মতিথি। বারোই শ্রাবণ ক্লার্ক গেবল বা ছবি বিশ্বাসের মৃত্যু-বার্ষিকী।

দুই বর্ণের সংযোগে সন্ধি। দুই নদীর সমাবেশে সংগম। দুই নরনারীর মিলনে পরিণয়। সঙ্গীতে যেমন ডুয়েট, রসায়নে যেমন কম্পাউণ্ড, রাজনীতিতে যেমন পি-এস-পি।

মানব-ইতিহাসে বিবাহের প্রবর্তন কবে তা জানিনে। তার প্রচলন কেন তা অনুমান করতে পারি।

সৃষ্টির গোড়ায় স্বর্গোদ্যানে মানুষ ছিল মাত্র দুটি। কোনো শুভদিন- নির্ঘণ্টের সুতহিবুক যোগে শ্রীমতী ইভের কুশণ্ডিকা হয়েছিল এমন জনশ্রুতি নেই। পুরাণে জেট-প্লেন ও বেদে এ-আর-পি'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পেয়ে থাকেন, তাঁরাও এখন পর্যন্ত আদমের বাসর-ঘর আবিষ্কার করতে পারেননি।

ক্যাফেটারিয়ায় স্বহস্ত-পরিবেশনের মতো নিজেরাই ফলমূল আহরণ করে আদি জনক-জননী মোটামুটি অনন্যনির্ভর জীবন যাপন করেছেন। শীত, আতপ এবং বর্ষা-বাদলের অকস্মাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে যকৃৎ বা পাকস্থলী বিকৃত হয়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহকে হয়তো বিকল করেছে। কিন্তু হাতের কাছেই বত্রিশ টাকা ফিজ-এর বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার না থাকায় সামান্য সর্দি কাশি বা অগ্নিমান্দ্য প্যারাটাইফয়েড বা গ্যাসস্ট্রো-এনট্রাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক নাম নিয়ে প্রাণঘাতিকা হয়ে ওঠেনি।

প্রথম মানব-মানবীর সন্তান-সন্ততির সঠিক সংখ্যা অপরিজ্ঞাত। গার্ডেন অব ইডেনে আর যাই থাক, সেন্সাস কমিশনার ছিল না। তবুও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ জীবনযাত্রা জটিলতর হয়েছে। মানুষ মৃগয়া ছেড়ে ধরেছে ভূমিকর্ষণ। শরাযুধ থেকে হয়েছে হলাযুধ। গুহাবাস পরিত্যাগ করে শুরু করেছে গৃহবাস।

চুলের সঙ্গে যেমন টেড়ি এবং কানের সঙ্গে যেমন দুল, গৃহের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দেখা দিয়েছেন গৃহিণী। প্রশ্ন উঠতে পারে, গৃহের তরে গৃহিণী, না গৃহিণীর জন্য গৃহ? এ-তর্ক শুধু অর্থহীন নয়, অন্তহীনও বটে। ধপাস করে পড়ে না, পড়ে ধপাস করে? নেতা হয়ে জেলে যায়, না, জেলে গিয়ে নেতা হয়?

অবশ্য নৈয়ায়িককে লজ্জা দিতে পারেন এমন সুচতুর ভাষ্যকারও আছেন। পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষার মতো শ্যাম এবং কুল বজায় রাখার কৌশল তাঁর আয়ত্তে। তিনি বলেছেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে,—গৃহ বলতেই বোঝায় গৃহিণী। অনুমান করি, লোকটা অকৃতদার।

আসল কথা, আদিযুগে সংসারযাত্রাটা নারী বা পুরুষ কারুর পক্ষেই এককসাধ্য ছিল না। নেহাত প্রয়োজনের তাগিদেই দু'পক্ষকে হাত মিলাতে হয়েছে। ব্যবসা চালাতে যেমন পার্টনারশিপ। গভর্নমেন্ট দখল করতে যেমন কোয়ালিশন। কলকাতায় যেমন স্যাণ্ডারসনস অ্যাণ্ড মরগ্যানস; ঢাকায় যেমন আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানী কংগ্রেস, প্রাক-আয়ুব পর্বে।

বিবাহকে কল্পনাবিলাসী কবিরা বলেন,—ফুলডোর। যুক্তিবাদী আইনজ্ঞেরা বলেন সামাজিক চুক্তি। কোষ্ঠী বা হস্তরেখা বিচারক জ্যোতিষশাস্ত্রীরা বলেন দৈবের নির্বন্ধ। এ-ছাড়াও পরিণয়ের একাধিক পরিচিতি আছে। তার সবগুলি কিছু শ্রুতিসুখকর নয়।

সকলেই জানি, জগতে একজাতীয় অতিসন্দিগ্ধ লোক আছে কোনো কিছুতেই যাদের আস্থা নেই। ইংরেজীতে এদের বলে সীনিক। এরা নিন্দুকের অধিক। সভাপতিত্বের অনুরোধের পিছনে এরা দেখতে পায় চাঁদার খাতা, সামনে নিজের সুখ্যাতি শুনে আশঙ্কা করে টাকা-ধারের ভূমিকা। ন্যাশানালাইজেশনের অর্থ জানে,—ইনেফিসিয়েন্সি। প্ল্যানকে বলে,—চাকরি-সৃষ্টি এবং জনগণের নামে অশ্রু-বরিষণ দেখলে ভাবে, আসন্ন ইলেকশন। অর্ধপূর্ণ কুম্ভ এদের চোখেই দেখায় অর্ধশূন্য। এই স্বভাব-সংশয়ীরা বিবাহের আখ্যা দেয়—বেড়ি। এরা বণ্ডকে বলে বণ্ডেজ উদ্বাহ-বন্ধনকে উদ্বন্ধন।

সংসারের বৈশিষ্ট্যহীন বাকী শতকরা নিরানব্বইজন, বাংলা দৈনিকের-সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাদের বলা হয় আপামর সাধারণ, এসব সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ধার ধারে না। শেক্সপীয়র তারা পড়েনি।

গোলাপের সন্ধানও বিশেষ রাখে না। কিন্তু জানে, পৃথিবীতে নামে কিছুই যায় আসে না। যে ট্রেনের নাম এক্সপ্রেস সেও টাইমটেবলের তিন ঘন্টা পরে পৌঁছায়। যে-দোকানী শিশিতে চিরতার আরক বেচে, সেও দোকানের সাইনবোর্ডে লেখে,—দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সুতরাং কোনো কিছুরই সংজ্ঞা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তাদের দিব্যজ্ঞান নেই, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আছে। বিবাহকে তারা মনে করে একটা লটারী। পৃথিবীতে ভীরু ব্যক্তিদের আদি, অকৃত্রিম ও একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। তবে ডার্বি বা রেস্তোরাঁর সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, ছোরে গিয়ে টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলা চলে না। চক্রব্যূহের মতো উদ্যোহরেও আগমন-পথ সহজ, নির্গমনপথ দুরূহ। আধুনিক অভিমন্যুদের জানা থাকা ভালো যে, দাম্পত্যনগরীর সবগুলি রাস্তাই ওয়ান-ওয়ে।

মানুষের জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিয়ন্ত্রিত উপক্রমণিকা ও উপসংহারের মধ্যপথে বিবাহ জীবনের স্বরচিত অধ্যায়। কোর্টশিপের তো কথাই নেই, চাক্ষুষ পরিচয় বিবর্জিত বর-কনের গুরুজন নির্ধারিত সনাতন হিন্দু-বিবাহও স্বয়ম্ভূ নয়। তার পিছনে দীর্ঘদিনব্যাপী সজ্ঞা আয়োজনের প্রাচুর্য আছে। বিবাহ স্থির যদি-বা হয় স্বর্গে, রেজেস্ট্রি হয় মর্তে। সেটা যথেষ্ট চেষ্টাসাপেক্ষ! মাসিকপত্রিকার নব পর্যায়ে প্রকাশের মতো নরনারীর বিবাহিত পর্ব যুগ্ম সম্পাদনায় জীবনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র।

বিবাহ পুরুষকে দেয় স্থৈর্য, নারীকে দেয় প্রতিষ্ঠা। স্বামীর বাড়ায় দায়, স্ত্রীর বাড়ায় দাম। সে-দাম নারীর নিজস্ব নয়। গালের উপরে পাউডার এবং নখের উপরে রঙের মতো সেটা প্রক্ষিপ্ত।

গণিতশাস্ত্রে শূন্যের নিজের কোনো সত্তা নেই। তার মূল্য নির্ধারিত হয় পার্শ্বস্থ সংখ্যাটির গুরুত্বে। দশের চাইতে কুড়ির কদর বেশী। ষাটের চাইতে আশীর ওজন অধিক। সমাজে নারীর মর্যাদা নিরূপিত হয় পিতা অথবা পতির গৌরবে। নায়েবকন্যা অপেক্ষা জমিদার-নন্দিনীর প্রতাপ প্রবল, থার্ড-মাস্টার অক্ষয়বাবুর মেয়ের তুলনায় ব্যারিস্টার নন্দী সাহেবের তনয়ার নাসিকা উন্নত।

পিতৃ পরিচয়ের চাইতেও ভর্তৃপরিচয় গুরুতর। সেকশন-অফিসর বসু-গিন্নীর চেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি সেন-মহিষী অধিকতর দুঃসহ। কবিরা যে নারীকে আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন সেটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। কে না জানে যে, চাঁদের আলো তার নিজের নয়,—সমস্তটাই পরস্ব।

মালাবদলের দ্বারা নারী বদল করে পদবী। সেটা প্রকাশ্যে পুরুষ পরিহার করে পদ। সেটা অলক্ষ্যে। সপ্তপদীর পর পরিবারের কর্তৃপদ থেকে স্বামীর ত্বরিত অপসৃতি লেবার-য়ুনিয়নে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের মতোই নিঃশব্দ কিন্তু নিশ্চিত।

কে না জানে যে যুক্তির চেয়ে শক্তি প্রবল, রূপের চেয়ে সোনা। কিন্তু সোনার চাইতেও জোরালো অস্ত্র আছে জগতে। তার নাম সোহাগ। অকারণ হাস্য এবং অকারণ অশ্রু—এই সাঁড়াশি-আক্রমণ, সামরিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'পিনসার মুভমেন্ট' দ্বারা স্ত্রীরা অবলীলাক্রমে স্বামী এবং সিন্দুকের চাবি আঁচলে বাঁধেন। মাল ও মালিক দুই-ই দখলে আনেন বিস্ময়কর তৎপরতায়।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নারীর জীবনের আরম্ভ। আইনসভায় ডিবেটের আগে কোশ্চেন-আওয়ারের ন্যায় তার প্রাগবৈবাহিক অংশটুকু বিবাহিত পরিচ্ছেদের মুখবন্ধ। পালার আগে প্রস্তাবনা। কবির ভাষায় বলতে গেলে, সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে সকালবেলার সলতে পাকানো। অতি আধুনিক অভিজাতমণ্ডলীর ভাষায় ব্যাখ্যা করলে, ডিনারের আগে যেমন ড্রিঙ্কস্, সিনেমায় অভিনয়ের আগে যেমন মেক-আপ।

বস্তুতঃ, গোত্রান্তরের দ্বারা প্রত্যেক নারীরই ঘটে জন্মান্তর। কাকে বিয়ে করব সে-ভাবনায় একালের যুবকেরা যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় সেটা একান্তই নিরর্থক। কারণ যাকেই বিয়ে করা যাক না কেন, দু'দিন পরেই দেখা যায়, সে অন্য আর কেউ।

পরিণয় পুরুষের জীবনে আনে সমাপ্তি। তার বিবাহোত্তর অস্তিত্ব শুধু পূর্বজীবনের ভগ্নাবশেষ। নাটকের এপিলোগ বা বক্তৃতার পেরোরেশানের মতো সেটা মূল কর্মকাণ্ডের অকিঞ্চিৎকর

অনুবর্তন। শুধু করুণ নয়,—কৌতুকাবহ। আশ্চর্য নয় যে, পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সাহিত্যেই বিবাহিত পুরুষকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সর্বাধিক প্রহসন।

দাম্পত্যে স্বামীর প্রয়োজন প্রকট, প্রভাব নাস্তি। ইংরেজী ভাষায় অ্যাপস্ট্রপি চিহ্নের ন্যায় তার অবস্থিতি আছে, উচ্চারণ নেই। কাঁঠালের বোঁটার মতো রস বা রসদ সংগ্রহের দিক থেকে তার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হলেও ভোজের থালায় সে মনোযোগের বাইরে। কর্তা ছাড়া কর্ম ব্যাকরণে অসিদ্ধ হতে পারে,—গৃহস্থালিতে নয়।

রাষ্ট্রনেতার পক্ষে বিদেশে রাষ্ট্রদূত হওয়া মানেই যেমন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায়, তরুণের জীবনে পত্নীযোগের অর্থ তেমনি দুঃসাহস ও দুঃসাধ্যের পথ থেকে পশ্চাদপসরণ। সোলার টোপরটি আকারে ক্ষুদ্র এবং ওজনে লঘুভার। সেটি শিরোধার্য করা মাত্রই মস্তিষ্ক থেকে নিশ্চিহ্ন হয় ছাত্রজীবনে উদগত যত বৃহৎ কল্পনার অঙ্কুর। প্রতিবাদ-সভা, ইন্‌কেলাব, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ, পরীক্ষার গার্ডকে প্রহার ইত্যাদি প্রগতিমূলক কার্যের সে সমাধি-স্তম্ভ। সেকালের সেজের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার ঠোঙা আর একালের ফয়ার-এক্সটিংগুইশারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য একান্ত অহেতুক নয়।

পাণিগ্রহণের ফলে পুরুষ ঘরে আনে স্ত্রী, ডাক্তারের বিল ও সেকরার ক্যাটালগ। কুইনিনের বড়ির উপরে চিনির প্রলেপের মতো তার সঙ্গে আসে কিছুটা যৌতুক। সেটা পাত্র-সংগ্রহের জন্য পাত্রীপক্ষের দেয়া ঘুষ। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য সিগারেট বা চা-এর প্যাকেটের সঙ্গে যেমন গিফ্‌ট-কুপন।

পরিণয়ের দ্বারা নারীর ঘটে বিস্তার। জায়া থেকে জননী তো প্রাণিতত্ত্বের সিঁড়িতে একটি মাত্র ধাপ। এমন কি একা গৃহিণীও একক নন। এ-যুগের মেয়েরা সচিব হলে সেক্রেটারিয়েটে বসে, অন্দরে নয়। সখীরা মিলে কলেজের করিডর বা রেস্তোরাঁয় এবং ললিতকলার দৌড় সিনেমা বা বড়জোর সঙ্গীত-সম্মেলন। সুতরাং কালিদাসের তালিকার সঙ্গে একালিনী গৃহিণীর ঠিকুজি মেলে না। কিন্তু গিলবার্ট-সলিভ্যানের গীতিনাট্য-বিশেষের মতো আধুনিক পারিবারিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সবক'টি মুখ্যপদেরই অধিকারিণী মাত্র একটি। পত্নীমাত্রেরই ধমনীতে বয় একনায়কত্বের রক্ত। অন্ততঃ একজিকিউটিভ ও জুডিশিয়ারির পৃথক অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই।

মোট কথা স্ত্রী হচ্ছেন সেই বস্তু যার অভাবে সংসার চলে না এবং উপস্থিতিতে সংসার অভাবে অচল হয়। যাকে পাওয়ার পূর্বে পুরুষেরা কবিতা পড়ে এবং পাওয়ার পরে গীতা। যাকে না পেয়ে খোঁজে পটাশিয়াম, সায়ানাইড বা লেক এবং পেয়ে সন্ধান করে গেরুয়া বা রুদ্রাক্ষ। বোধহয় তার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে—যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। সম্ভবতঃ কবিগুরুরও এটি বিবাহিত জীবনেরই রচনা।

বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেই প্রেমের কথা আসে। য়ুনিয়নের নাম নিলেই যেমন ধর্মঘট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেমের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। প্রেম ও পরিণয়কে যাঁরা শাড়ির সঙ্গে সায়া অথবা ভোটের সঙ্গে ক্যানভাসিং-এর মতো অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেন, তাঁরা পণ্ডিত হলেও সংসার-অনভিজ্ঞ।

সাগরের ওপারে বিদেশী সমাজের রীতি,—আগে প্রেম, পরে বিবাহ। আগে সুর সাধা, পরে গান। সাগরের এপারে স্বদেশী শাস্ত্রের বিধান,—আগে বিবাহ, পরে প্রেম। আগে অস্ত্রোপচার, পরে ব্যাণ্ডেজ। প্রথম পক্ষের ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাদ দুই সমতুল্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মেশাতে গেলে ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট হয়। বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণের চেষ্টাও হাস্যকর। প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে বিয়ে করা, টাকা বাড়ানোর জন্য রেস খেলার মতোই সর্বনাশা হঠকারিতা।

তির্যক অক্ষি

জ্যোতির্বিদেরা বলেন, সৌরমণ্ডলের মধ্যবিন্দুতে আছে সূর্য। তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষ-পথে অবিরত আবর্তিত হচ্ছে নানা গ্রহ-উপগ্রহের দল।

মর্তলোকে বাঙালীজীবনের মর্মস্থলে আছে আপিস। সেখানে তার ভারকেন্দ্র—ইংরেজীতে যাকে বলে সেন্টার অব গ্র্যাভিটি।

প্রাগেতু ষোড়শ বর্ষে মারোয়াড়ী বসে গদিতে, শিখ চালায় ট্যাক্সি গুজরাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে, বঙ্গবালকেরা সে-বয়সে সেন বা মিত্র কোম্পানীর নোট মুখস্থ করে গোলদীঘির ধারে পরীক্ষা দেয় লালদীঘির পারে ঠাঁই পাওয়ার আশায়।

পুরাকালে জাতিভেদে বৃত্তিভেদ হতো। ব্রাহ্মণ করত যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয় করত যুদ্ধ। বৈশ্যের ছিল বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবা।

এযুগে দ্বিজ বলতে বোঝায় মন্ত্রী, ডেপুটি-মন্ত্রী বা নিদেনপক্ষে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। আর যাই হোক, পড়াশুনা তাঁদের কোয়ালিফিকেশান নয়।

অহিংস অসহযোগের দেশে সত্যমেব জয়তে। সেখানে নিজের রাজ্য পরের দখলে গেলে সৈন্য না পাঠিয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠানোই রীতি। সুতরাং যুদ্ধ এখন যা ঘটে তা ভোটের। তাতে হাতিয়ারের বদলে হাত তুললেই যথেষ্ট।

বাণিজ্য ধীরে ধীরে এসে ঠেকছে স্টেট ট্রেডিং-এর দপ্তরে এবং সেবার উল্লেখ থাকে একমাত্র ইলেকশানের বক্তৃতায়। বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্মবিভাগ একালে অচল।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, সব রাস্তাই মেশে রোমে। রোম যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কথাটা সত্য নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, সব বাঙালীই যায় আপিসে, যেমন ঝাণ্ডা হাতে সব "আমাদের দাবি মানতে হবে"-র মিছিলই ধায় এসেম্বলী বা পার্লামেন্টের দিকে।

শিক্ষিত বাঙালীর নেশা অনেক : কারো ফুটবল, কারো সাহিত্য, কারো বা কার্ল মার্কস। কিন্তু পেশা এক এবং অদ্বিতীয়,—চাকরি। তাই এম-বি পাস করে তারা হতে চায় চা-বাগান, কয়লার খনি বা বিলাতী জাহাজের মেডিক্যাল অফিসার। বি-এল পাস করে সওদাগরী আপিসের ল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

শৈশবে মুখে কথা ফোটার আগেই চাকরির কথাটা বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প শে থাকে। সন্ধ্যাবেলা মৃদু-দীপালোকিত শয্যায় ঠাকুমা-দিদিমাদের কণ্ঠে যে ছেলে-ভুলানো ছড়া শুনে বাঙালী খোকাখুকুদের চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে তাতেও চাকরির উল্লেখটা খুব স্পষ্ট ঃ—

হাঁড়ির ভিতর ধনে,
গৌরী বেটী কনে ;
নোকে বেটা বর
টাকশালেতে চাকরি করে, ঘুঘুডাঙায় ঘর।

নোকে বেটার ঘর ঘুঘুডাঙার বদলে চেতলা বা খিদিরপুরে হলেও কারো কোনো আপত্তি হতো না। তার বয়স কত, চেহারা কেমন তা নিয়েও বিশেষ উদ্বেগ আছে এমন মনে হয় না। কনে এবং কনের অভিভাবকদের কাছে যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে ঐ তার টাকশালে চাকরির খবরটা। সেটা সঠিক জানতে পারলেই গৌরীর মা-মাসিরা ঠেকিতে আনন্দ-নাড়ু কুটতে শুরু করেন, বাপ-কাকারা ময়রার দোকানে দৈ-সন্দেশ ফরমাস দিতে ছোটেন।

কালিদাসের কালে যাই হোক না কেন, আমাদের কালের পাত্রীপক্ষের সবারই কামনা এক। এমন সি গেস্ট-কন্ট্রোলের দাপটে মিষ্টান্নম অনেক বিয়েতেই জোটে না।তখন ইতরে জনাঃও বর ভালো চাকরি করে জেনেই খুশি। পাত্র ব্যবসা করে শুনলে ভাবী বধূর মুখ মলিন এবং সম্ভবপর শ্বশুঠাকুরাণীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়। বরের বাজারে দোকানের মালিকের চাইতে ম্যানেজারের দর বেশী।

হর্স-পাওয়ার দিয়ে ইঞ্জিনের দাম বাড়ে, সিলেন্ডার দিয়ে মোটর গাড়ির [illegible] দ্যুতিতে,

চাপরাসীর ভার তকমায়। সাবালক বাঙালীর দাম নিরূপিত হয় চাকরির ওজনে। তার পক্ষে পদবীর চাইতে পদের বিবরণটা গুরুতর। সাব-ইনস্পেক্টরের চাইতে ইনস্পেক্টর বড়; ডিরেক্টারের চাইতে ডিরেক্টার-জেনারেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী জানায় বইপড়ার হিসাব। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তার খোঁজ পড়ে না। মাইনের অঙ্ক বোঝার কর্মকুশলতা, সাদা কথায় যাকে বলে কাজ-বাগানোর ক্ষমতা। সংসারে সেটাই মুখ্য। বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ কতখানি সে তত্ত্ব কোনো বৈজ্ঞানিকের জানা নেই। কিন্তু টাকার সঙ্গে কৃতিত্বের খ্যাতি ধারের সঙ্গে সুদ বা জ্বরের সঙ্গে মাথাধরার মতোই প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। জগতে বিদ্যুতের মাপ এম্পিয়ারে, গতির মাপ বেগে এবং বিচক্ষণতার মাপ ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সে। মেট্রিক পদ্ধতিতেও তার নড়চড় নেই।

স্থানের দ্বারা যে দ্রব্যের আদর বাড়ে সে দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হামেশাই চোখে পড়ে। বর্ষায় দিনে ইলিশ মাত্রই বাঙ্গালীর রসনায় উপাদেয়। সে ইলিশ গঙ্গার হলে তার স্বাদ বাড়ে কি না তা নিয়ে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু দাম যে বাড়ে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। স্থানগৌরবেই গোয়ালন্দ বা পাকশীর যে চালানী ইলিশ সকালবেলায় ছাতুবাবুর বাজারে তিন টাকায় বিকোয়, সন্ধ্যাবেলা তল্লাঘাটে তা পাঁচটাকার কমে মেলে না। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বে সাজানো ল্যাংড়া বেনারসের কি দ্বারভাঙ্গার তা দিয়ে শাশুড়ীরা বেয়ানের নজর বিচার করেন। ফ্ল্যাট আকারে এক এবং প্রকারে সদৃশ হলেও ভাড়ার হিসাবে করোলবাগ এবং গলফ্-লীঙ্কস্ কিম্বা গলু ওস্তাগরের গলি আর হ্যারিংটন স্ট্রীটে কি তফাত নেই?

শুধু বস্তু নয়, ব্যক্তিও বহুক্ষেত্রেই তার বসতি দিয়ে কৌলীন্য লাভ করে। সে কালে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণেরা রিষড়া, কোন্নগর, আগরপাড়া বা হালিশহর যেখানেই থাকুন, সবাই টিকি, নস্য এবং পাত্রাধার তৈলের তর্ক নিয়ে মোটামুটি জীবন কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু ভাটপাড়ার নাম করলেই ব্রাহ্মণত্বটা যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠত। শাস্ত্রজ্ঞান পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের সর্বত্রই সমান সম্ভব। মোনাজাইট বালুকা বা ম্যাঙ্গানীজ ধাতুর মতো তার অবস্থিতি কোন মানচিত্রের গায়ে দাগ দেওয়া নেই। তবুও কাশীর অথবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিধানই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য ছিল। বৈদ্যসমাজে কুল মিলিয়ে যাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতেন তাঁরা কালিয়া বা সেনহাটির সেনগুপ্ত-দাশগুপ্তের ঘরে পাত্র খুঁজতেন। বাংলার বাইরে হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও কাশ্মীরী মিশ্র, কনৌজের চতুর্বেদী ও মথুরার পাঁড়েজীরা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামনের সারিতে আসন দাবি করেন।

ঠিকানার জোরে মর্যাদাবৃদ্ধি এ যুগেও কিছু কম নয়। কে না জানে যে, হার্লে স্ট্রীটে চেম্বার হলেই ডাক্তারের এবং বন্ড স্ট্রীটে দোকান হলেই দর্জির বিল বিপুলাকার হয়?

চাকরিরও মান বাড়ে আপিসের নামে। খ্যাংরাপটিতে রামসুখদেওর আড়তে টাইপিস্ট যে চিঠি টাইপ করে তার পরিমাণ ফেয়ারলী প্লেসের হেন্ডারসন ব্রীজের টাইপিস্টের চাইতে কিছু কম নয়। বেতনেও হয়তো পার্থক্য নেই। কিন্তু ঘরে স্ত্রী এবং পাড়ায় প্রতিবেশীদের কাছে দ্বিতীয়জনের মর্যাদা অধিক। বিদ্যাদানের মতো একান্ত নির্বিরোধী কাজেও প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক মশাই যে হালিশহর কলেজের প্রফেসারের চাইতে অধিকতর মনোযোগের পাত্র সে কি শুধু মাইনের পার্থক্যে?

বাঙালীর অশন, বসন, আচার আচরণে আপিসের প্রভাব অনেকখানি। বাঙালী মেয়েদের পোশাক নিয়ন্ত্রণ করে সিনেমার নায়িকা। সেটা অভূতপূর্ব নয়। বিদেশেও তাই। এলিজাবেথ টেলার বা সোফিয়া লরেনের স্কার্টের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারাই পনর আনা ইংরেজ, আমেরিকান বা ফরাসী মেয়েদের ফ্যাশান নির্ধারিত। ক্রিশ্চেন ডিয়র তো আছে শুধু মুষ্টিমেয় ঊর্ধ্বচোখিলী উচ্চাভিলাষিণীদের জন্য কোর্টে প্রোজেক্টেড না হওয়া পর্যন্ত যাদের দিবস বিস্বাদ এবং রজনী নিদ্রাহীন।

বাঙালী পুরুষের পোশাকের ধারা স্থিরীকৃত হয় আপিসের প্রয়োজনে। অধিকারীভেদে তত্ত্বসাধনার মতো চাকরিভেদে পরিচ্ছদ। ইংরেজের আমলে সিভিল সার্ভেন্ট কর্তাব্যক্তি কলের সঙ্গে

সরকারী আপিসে পরিধেয়ের নিয়মকানুন বাঁধা ছিল। বেসরকারী আপিসগুলিতেও অলিখিত আইনে কেরানীর ছিল ধুতি, অফিসারের সুট। ব্রিটিশোত্তর যুগে সরকারী অফিসারদের জন্য একটা পোশাকের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু বিয়ের বরযাত্রীর গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবির মতো সেটাও শুধু বিশেষ উপলক্ষেই ব্যবহৃত।

এখন ধীরে ধীরে অফিসারেরা ছাড়ছেন টাই, কেরানীরা ধরেছেন প্যান্ট। এই নীচের মহলে যোগ ও উপরের মহলে বিয়োগের ফলে পোশাকের একতলা ও দোতলার দূরত্ব কমে গিয়ে মাঝখানে একটা নতুন তলার উদ্ভব হয়েছে স্থপতিদের ভাষায় যাকে বলে মেজেনাইন ফ্লোর। সেখানে শ্রী ছন্দহীন একটা অঙ্গাবরণের সর্বব্যাপী বিস্তার। তার নাম—বুশ-শার্ট। প্রাচীন ফতুয়ার আধুনিক শোভন সংস্করণ ; ইংরেজীতে যাকে বলে ডিল্যুক্স এডিশান। ভারতবর্ষে কালোবাজার ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বিগত মহাযুদ্ধের এটি তৃতীয় অবদান।

জামাকাপড় থাকে মানুষের দেহে। তার রকমফের তাকালেই দেখা যায়। মনের পরিবর্তন থাকে গভীরে, সেটা সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। আমাদের জীবনযাত্রা ও মনোভাবের উপরে আপিসের কাজের প্রভাব কতখানি সেটা নিরপেক্ষ গবেষণার বিষয়। বৃদ্ধ মহেশবাবুর বড় ছেলে রেলের মালবাবু। তিনি মেজেতে পিঁড়ি পেতে বসে খাগড়াই কাঁসার থালায় ভাত খান। এলুমিনিয়মের কৌটয় টিফিন নিয়ে ট্রামে চেপে আপিসে যান। পাটের গাঁট, চালের বস্তা ও কয়লার ওয়াগানের 'বিল্‌টি' লিখে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের আড্ডায় মোহনবাগান, সুচিত্রা সেন, বা ক্রুশ্চেভ নিয়ে বাগবিস্তার করেন। তাঁরই অনুজ রেলের অফিসার। তাঁর খাবার ব্যবস্থা টেবিলে, বাসন কাচের বা চীনেমাটির। দুপুরে বেয়ারা আপিসে বয়ে নিয়ে আসে হট কেসে-ভরা লাঞ্চ। বিকালে ক্লাবে গিয়ে খেলেন দু' সেট টেনিস বা দু' রাবার অকসান ব্রীজ।

সদরের মতো অন্দরমহলেও দু' পক্ষের প্রভেদটা সুস্পষ্ট। কেরানী-গিন্নী ঘরসংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরবেলা সময় পেলে পাশের-বাড়ির বউদের সঙ্গে মাছের দাম, গয়লার শঠতা বা ছোটখুকীর হুপিং কাশি নিয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করেন। দিবানিদ্রা ও প্রেমের উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে অফিসারের মিসেস সেজেগুজে করেন সোশ্যাল ওয়ার্ক বা মহিলা-সমিতির সভানেতৃত্ব।

বাস্তবিক, জন্মশাসন থেকে সাম্যবাদ এবং হুইস্কি পান থেকে অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিতর্কমূলক বিষয়েই আমাদের মতবাদ আমাদের পদাধিকার দিয়ে প্রভাবান্বিত। উচ্চপদের সঙ্গে অতি-আধুনিকতার যোগাযোগ প্রায় বাসরঘরের সঙ্গে শ্যালিকার চতুরালির মতোই অবিচ্ছেদ্য।

জোয়ার ভাঁটা দিয়ে নৌকাযাত্রার মতো আপিস দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত। আপিসের ঘড়ি দেখে রাস্তায় ট্রাম চলে, আপিসের সময় মেনে হেঁসেলে হাঁড়ি চড়ে। আপিসের ছুটি হিসাব করে বৌভাতের দিন থেকে টেস্টম্যাচের তারিখ ধার্য হয়। কাশী বৃন্দাবন বা পুরী দার্জিলিঙে পুণ্যকামী বা স্বাস্থ্যান্বেষীদের আগমন নির্গমনের মর্শুমও আপিসের দরজা বন্ধ এবং খোলার উপরে নির্ভর করে। অধিকাংশ বাঙালীরই আপিসের ফাইলে ছাড়া লেখা নেই, আপিসের তাড়া ছাড়া জীবনে তাগিদ নেই। কানু বিনা গীত এখন হয়, শিবহীন যজ্ঞও। কিন্তু আপিসের গল্প নইলে সান্ধ্যবৈঠকের গল্প জমে না।

রূপকথায় রাক্ষসের প্রাণ ছিল জলের নীচে পাথরের কৌটার ভিতরে। বাঙালীর প্রাণ আপিসের হাজিরাখাতায়। হাতে মারার চাইতে ভাতে মারার শাস্তি তার পক্ষে বেশী ভয়াবহ। ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী কোন বল্লভে স্মরণ করে সে খবর আছে কবিসম্রাটের কল্পনায়। উৎসুক নেত্রে বাঙ্গালী কেরানী যেদিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে হচ্ছে মাসের পহেলা। 'পে-ডে'টাই তার 'ডি-ডে'। স্যামসনের চুল কেটে নেওয়ার মতো চেয়ার কেড়ে নিলেই সে ভূমিসাৎ,—একাধিক অর্থে।

চাকরি বাঙালীকে দিয়েছে ইংরেজী-শিক্ষার আগ্রহ ও সুযোগ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ ও সন্ধান। মন্থরগতি গ্রাম্যজীবনের নিস্তরঙ্গ পরিবেষ্টন থেকে তাকে শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার কোলাহলমুখর আঙিনায় টেনে এনেছে। তারই ফলে গড়ে উঠেছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ—ভারতীয় দেশাত্মবোধের যা সূতিকাগার, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার যা অবলম্বন এবং

সুকুমার রুচি ও প্রগতিপরায়ণতার যা ধারক ও বাহক।

কিন্তু এযুগে মধ্যপন্থার কোনো স্থান নাই। হয় কংগ্রেস নয় কমিউনিস্ট,—পি-এস-পি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। পঞ্চাশোর্ধ্বে মাথার চুলের মতো সবকিছুই একদম সাদা আর কালোর ভাগাভাগি। ধূসরের অস্তিত্ব নেই। সমাজেও মধ্যবিত্তেরা অপাঙ্‌ক্তেয়।

ধনীজনের আছে টাকার জোর। সেটা প্রকাশ্যে ধিকৃত হলেও অপ্রকাশে সবারেই শিরোধার্য। গণজনের আছে সংখ্যার জোর। গণতন্ত্রের গণনায় মস্তিষ্কটা অপ্রাসঙ্গিক, খেত পড়ে মাথার। তাই জানকীর চরণ-নখরে নিবদ্ধদৃষ্টি বনবাসী লক্ষ্মণের মতো রাজনৈতিক নেতা থেকে দৈনিক কাগজের সম্পাদক পর্যন্ত সবাই তাদের পানে অবিচলনেত্রে তাকিয়ে থাকে। ঘরেও নহে,পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে সেই মধ্যবিত্তেরাই বসেছে ঘাটের কিনারায়। চাকরি একদিন তাদের বিভিন্ন প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল। চাকরির কারণেই তারা আজ সেখান থেকে বিতাড়িত। যে কারণে একদা তারা পেয়েছিল প্রতিষ্ঠা সেকারণে আজ তারা পাচ্ছে প্রহার।

প্রহার বা পীড়ন মাত্রই অকল্যাণকর নয়। না পোড়ালে কোন সোনা শুদ্ধ হয়? না পেটালে কোন লোহা শক্ত হয়?

আঘাতে পাথর থেকে বেরোয় আগুনের ফুলকি, মাটির ডেলা থেকে শুধু ধূলিকণা এবং তিল, তিসি থেকে নির্গত হয় তরল তৈলাক্ত ধারা। গভীর পরিতাপের বিষয়, দুঃখে বাঙালী দৃঢ়ীভূত হয় না দ্রবীভূত হয়।

এক গালে চড় খেয়ে যাঁরা অন্য গাল এগিয়ে দেন, অন্ততঃ খ্রীস্টের অনুগামীদের কাছে তাঁরা নমস্য। কিন্তু মার খেয়ে যারা শুধুই করে নামটা সহি লম্বা পিটিশানে তাদের দু'গালেই চুনকালি মাখা। কেবলই নাকীসুরে কান্না শিশুর হলেও বিরক্তিকর; প্রাপ্তবয়স্কের বেলায় সেটা নিতান্তই অসহ্য।

চাকরি বাঙালীকে কায়িকশ্রমে বিমুখ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুৎসাহী ও দুঃসাহসিকতায় পশ্চাৎপদ করেছে এ অভিযোগ অতি পুরাতন ও বহুশ্রুত। সবচেয়ে শোকাবহ এই যে, নিশ্চিত আয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ার মোহ দিয়ে চাকরি তাকে করেছে রিক্ততেজ, হতোদ্যম, ঐক্যহীন ও বাক্যসার। তিন কোটি সন্তানেরে রেখেছে বাঙালী করে, মানুষ করেনি।

কালকের পোষাক

মনের ভাব ঠিক মতো ব্যক্ত করার জন্যই পৃথিবীতে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একথা ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আমরা পড়েছি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বহু অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছি ব্যাপারটা আসলে বিপরীত। হামেসাই দেখি, দজ্জাল শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে পিত্রালয় থেকে পুত্রবধূ লেখেন,—আপনার অসুখের সংবাদে বিশেষ চিন্তিত আছি। কলকাতার ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে যখন কুটুম্বের দল ছেলে-মেয়ে নিয়ে অতিথি হয়, বাড়ির গৃহিণীকে তখন শরৎচন্দ্রের নায়িকার মতো আনন্দে মুখ কালি করে বলতে শোনা যায়,—এস ভাই এস, বড় খুশী হলেম!

মনে যা নেই তা প্রকাশ করার জন্যেই যেমন ভাষা, দেহে যা নেই তা প্রমাণ করার জন্য তেমনি পোষাক। কুলগুরু শিষ্যগৃহে আসেন নামাবলী গায়ে জড়িয়ে, চেহারাটা যেন যথেষ্ট সাত্ত্বিক দেখায়। চাকরির উম্মেদার সুট পরে ইন্টারভিউ দিতে যায়, যাতে বেশী স্মার্ট দেখায়। বিয়ের কনেকে দেখানো হয় নীলাম্বরী পরিয়ে,রংটা যাতে বেশী ফর্সা মনে হয়। বস্তুতঃ আমাদের বেশীর ভাগ বেশই হচ্ছে ছদ্মবেশ।

অবশ্য বেশের সঙ্গে পরিবেশের একটা যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। বরফে ঢাকা এস্কিমোর দেশে চর্মনির্মিত পোশাক আত্মরক্ষার তাগিদেই অবশ্যক। আন্দীর পাঞ্জাবি বা ঢাকাই উড়ুনী গায়ে লন্ডনের রাস্তায় বেরুলে পুলিশে ধরার আগেই ধুরিসীতে ধরে। ব্যাঙ্কক শহরে ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তিকে পাগলা গারদে নেওয়ার পূর্বে হাসপাতালে নিতে হয়।

শুধু পরিবেশ নয়, পেশাও অনেকাংশে মানুষের পোশাকের জাত নির্ধারণ করে থাকে। বিভিন্ন জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক চলতি আছে। তার নাম য়ুনিফর্ম। জজকে পরতে হয় উইগ, ক্যাথলিক ধর্মযাজককে গায়ে দিতে হয় আলখাল্লা, পুলিশকে মাথায় বাঁধতে হয় পাগড়ি, নার্সকে রুমাল। এগুলি নিয়ম! তা ছাড়া সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করেও এক এক ধরনের কাজের জন্য এক এক রকমের পোশাক আপনিই প্রচলিত হয়। ডেস্কে বসে লেজার লিখতে ধুতিই যথেষ্ট। কিন্তু ল্যাবরেটারীতে এ্যাসিড, কেমিক্যাল নিয়ে যারা কাজ করেন এপ্রনটা তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং কারখানায় যারা মেশিন চালান শর্টস্ তাদের দরকার। অবশ্য বৃত্তিভেদে পরিচ্ছদভেদটা একমাত্র পুরুষের বেলায়ই ঘটে মেয়েদের বেলায় নয়। কারণ জগতে মেয়েমাত্রেরই শুধু একটিমাত্র পেশা আছে,—সে হলো স্বামী-পরিচালনা। তার জন্য শাড়ি, ফ্রক, সালোয়ার, পায়জামা, ঘাগরা সব পোশাকই সমান উপযোগী।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পোশাকের যত রকমারি, যত আয়োজন, যত বর্ণবিন্যাস তার সবটাই মেয়েদের জন্য। স্বর্গোদ্যানে আদি মানব-মানবী আদম ও ইভের পোশাকে পার্থক্য ছিল না। উভয়ে একইভাবে তিনটি মাত্র ডুমুরের পাতা সেলাই করে দেহাচ্ছাদন করেছিলেন। অবশ্য আমার বিশ্বাস, বসন ব্যবহারের সেই প্রথম মুহূর্তটিতেও বৃক্ষপত্র নির্বাচনের ব্যাপারে আদম অপেক্ষা ইভের অনেক বেশী সময় লেগেছে। বৌভাতের নেমন্তন্নে যেতে আজকের দিনের মিসেস সেন, মিসেস ঘোষেরা যেমন কোন শাড়িটা পরবেন তা স্থির করতে দিশেহারা হন, সেদিনের আদি জননী ইভও তেমনি ডুমুরপত্রগুলির আকার, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে থাকবেন।

সৃষ্টির সেই উষাকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পোশাকের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বৃক্ষপত্র থেকে নাইলন অনেকটা পথ; পোশাক বিবর্তনের এই সুদীর্ঘ পথে ইভের উত্তরাধিকারিণীরা আদমের জাতকে অনেক পিছনে ফেলে গেছেন। গারো পাহাড়ের নাগা কুটির থেকে নিউ ইয়র্কের ড্রয়িং রুম পর্যন্ত সর্বত্রই মেয়েদের তুলনায় পুরুষের পোশাক সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দু'দিক দিয়েই অনেক বেশী সরল এবং সাধারণ। বাড়ির কর্তা দুদিনের ছুটিতে পুরি বা মিহিজামে বেড়াতে যেতে একটা ছোট এটাচী কেস হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে পারেন। গিন্নীকে সঙ্গে নিলে স্টেশানে স্টেশানে কুলি ভাড়া দিতেই প্রাণান্ত। একালের মেয়েদের সৌষ্ঠব সব জমা থাকে তাদের ওয়াড্রোবের মধ্যে।

সকলেই জানি, বাঙালী পুরুষের মূল পোষাক ধুতি, মেয়েদের পোশাক শাড়ি। এরই সঙ্গে

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে কালে কালে তার রকমফের ঘটেছে। সে পরিবর্তনের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক থাকেনি। থাকলে এই গরম দেশে গলায় শক্ত কলারে টাই বেঁধে কেউ ধর্মতলে কলেবর হতে চাইতো না। সত্যি কথাটা এই যে আমাদের পোশাক ঠিক হয়েছে রুচি নিয়ে নয়—রীতি দিয়ে। আর পুরুষের বেলায় সে রীতিটা রাজরীতি।

আমাদের গত কালকের রাজপুরুষেরা ছিলেন সাহেব। তাদের কোট, ট্রাউজার্স, হ্যাট, বুটকেই অফিসার থেকে হাসপাতালের ডাক্তার এমন কি সিগারেটের ক্যানভাসার পর্যন্ত সবাই সুট পরাটা তাই চোগা চাপকান ছিল ভদ্র পোশাকের নিদর্শন। আমাদের দাদামশায়দের দেহে তাদের স্থান হয়েছে সমাদরে।

আজ দিল্লীর রাজপাটে প্রভাব আছে আগ্রা, অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চী ও কোশলের। তাই শেরোয়ানী ও চোস্ত ধীরে ধীরে আমাদের রাজবেশ হয়ে উঠেছে। ঢিলে পাজামা পাঞ্জাবী ও তার উপরে ওয়েস্ট কোট হয়েছে আটপৌরে পোশাক।

সুতরাং কাল আমাদের ছেলেদের পোশাক কী হবে তা নির্ভর করবে কাল আমাদের রাজা শাসন কারা করবেন তারই উপরে। যারাই করুন, পাজামা ও পাঞ্জাবীকে তাঁরা বাতিল করবেন মনে হয় না। বামপন্থীরাও পণ্ডিত নেহরুর যে একটি মাত্র জিনিস সমর্থন করেন তা হচ্ছে তাঁর ওয়েষ্ট কোটটি। এমনকি লালপন্থীদেরও ঝান্ডা আলাদা বটে, কিন্তু পোশাক আলাদা নয়। শুধু এদেশে নয় য়ুরোপেও। এনড্রি ভিসিনস্কী এবং আর্নেস্টবেভিনের মধ্যে পরিচ্ছদের তফাৎ ছিল না। কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের পোশাক এক।

তবে হিন্দী যেমন ভারতের রাষ্ট্রভাষা, পাঞ্জাবী, পাজামা এবং ওয়েস্ট কোটও ঠিক তেমনি হবে ভারতের রাষ্ট্রবেশ। অর্থাৎ হিন্দীও যেমন কোনকালেই ভারতের সব লোক সব সময়ে বলবে না, ঐ পোশাকটাও তেমনি সর্বদা সর্বত্র পরা হবে না। কালকের দিনেও বিয়ের আসরে বাঙালী বরযাত্রীর দলকে গিলে কোঁচানো ধুতিতেই দেখা যাবে, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি আড্ডা দিতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকেরাও একখানা বিছানার চাদর আধখানা করেই পরবেন। সর্বভারতীয় পোশাকটা হবে সত্যি সত্যিই পোশাকী।

অবশ্য নকল করতে গেলেই কিছুটা নাকাল হতে হয়। নবাবী আমলে আমরা চাপকানের সঙ্গে চাদর গায়ে জড়িয়েছি, সাহেবী আমলে পাঞ্জাবীর উপরে কোট পরেছি, আসছে কালও হয়তো ধুতির সঙ্গে শেরোয়ানী চালাতে থাকবো। তবে বাঁচোয়া এই যে, সংখ্যা বেশী হলেই যেমন পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ডের কলঙ্ক স্খালন হয়, বহু ব্যবহারের দ্বারাও তেমনি রুচি-বিকৃতি ফ্যাশানে পরিণত হয়।

ফ্যাশান কথাটার মধ্যেই যেন একটা লঘুচিত্ততার আভাস আছে। অস্কার ওয়াইল্ডের নায়ক বলেছেন, অতি আধুনিক ফ্যাশান হলো সেই কদর্য বস্তু যা এত অসহ্য যে প্রতি ছ'মাস পরেই বদল করতে হয়। মেয়েদের দেখে ও কথাটায় আমার বিশ্বাস জন্মেছে।

অজ্ঞাতবাসকালে একদা মায়া সরোবরের তীরে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন। যুধিষ্ঠির সব কটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। তার একটি ছিল এই, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল কি ? পাণ্ডুতনয় উত্তর করলেন, মানুষের মন। আজকের দিনে ধর্ম বালীগঞ্জে লেকের পারে দাঁড়িয়ে যদি ঐ প্রশ্ন করতেন, তবে যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাঁর আগের ভ্রম সংশোধন করে জবাব দিতেন, জগতে সবচেয়ে পরিবর্তনশীল মেয়েদের কানের দুল। শুধু দুল নয়, মেয়েদের সমস্ত সাজ-সজ্জাই হচ্ছে স্বল্পায়ু। এ পূজায় যে জর্জেটটি শোভা পায় সামনের শো কেসে, পরের পূজায় তাই পড়ে থাকে পিছনের গুদামে। আমাদের ঠাকুমাদের আমলে শাড়িতে পাড় ছিল তিনটে। মায়েদের আমলে পাছাপাড় উঠে গিয়ে তার সংখ্যা হলো দুই। বউদিদের কালে তার আকার শীর্ণ হয়ে দাঁড়ালো অর্ধেক, পাইপিং। বোনেদের সময়ে তাও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে শাড়ি হলো পাড়হীন। আমাদের মেয়েদের যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে। এখন চলছে আঁচলঃ

যাকে বলে পলু। জামা প্রথম যুগে ছিল লেস, ফ্রিলে ভরা পুরো আস্তিনের জ্যাকেট। তারপর এলো ব্লাউজ। তার হাতার দৈর্ঘ্য কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চাঁদের মতো ক্রমশঃ কব্জির কাছ থেকে কাঁধের উপরে এসে পৌঁচেছে।

ব্লাউজের আদি যুগে সম্মুখ দিকটা ছিল গলার সঙ্গে আঁটা : তাতে নেকলেস পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেতো। সদ্যবিগত যুগে তার নিম্নগতি নীতিবাগীশদের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সদ্য আগত যুগে শুরু হয়েছে কটি থেকে তার ঊর্ধ্বগতি। আমার কাছে দুটোই সমান মারাত্মক ঠেকে। প্রথমটাতে চোখ চাইলেই দেখতে হতো বিশীর্ণ কণ্ঠা ; দ্বিতীয়টাতে দেখতে হচ্ছে মেদবাহুল্য।

কিন্তু এসবই তো হলো গতকাল এবং আজকের কথা। আগামীকালের মেয়েদের পোশাক হবে কী ?

ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। মেয়েদের মন যেমন দেবতাদেরও অজ্ঞাত, মেয়েদের পোশাকও তেমনি মানুষের গবেষণার বাইরে। তবে কিছুটা হয়তো আঁচ করা যেতে পারে। সেজন্য যেতে হবে দার্জিলিং কিংবা মুসৌরীতে। সেখানকার ম্যালে দর্শন মিলে স্ল্যাকস্ পরিহিতা বঙ্গললনার। ফ্যাশান নভোমণ্ডলের সর্বাধুনিক তারকার দল। পুরুষের পোশাক মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে বাইবেলে অনুশাসন আছে বটে, কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের আমলে মেয়েদের তো শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভানেতৃত্ব করতে হয়নি, করতে হয়নি পোস্টার হাতে নিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে অবস্থান ধর্মঘট।

কালকের দিনে ট্রামে, বাসে, সিনেমার দরজায় দেখা যাবে শুধু এই স্ল্যাকস্ : পুরুষের ট্রাউজার্সের সামান্য পরিবর্তিত মহিলা সংস্করণ। হায়, সেদিন আর তরুণীর রঙ্গিন অঞ্চল দেখে তরুণের নাড়ী চঞ্চল হবে না, বউমার আঁচলে ছেলে বাঁধা পড়েছে বলে শাশুড়ী আক্ষেপ করবেন না এবং "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর"—বলে কবির দল দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না !

কিন্তু সাজ বদল হলেই তো ছাঁচ বদল হয় না। সেদিনও জ্যোৎস্না নিশীথের বান্ধবীকে সকাল বেলার প্রখর সূর্যালোকে দেখে আজকের মতোই চমকে উঠতে হবে। কারণ সংসারে সব মেয়েরই দুটো করে চেহারা ; ঠিক যেমন ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক অসাধু ব্যবসায়ীর দুটো করে হিসেবের খাতা ! ★

★ অল ইন্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

এক

আমাদের বাড়ির পাশেই বৃন্দাবন চাটুয্যের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়। আমি কখনও তাঁহাদের বাড়ি যাই না। অপরাহ্নে কেশ পরিচর্যার ছলে ছাদে উঠিয়া কাহারো সঙ্গে গল্প করি না। সকালে জানালায়-দাঁড়াইয়া পাঠাভ্যাসের ফাঁকে কোনো সুযোগান্তরে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপও করি না। নিয়মিতভাবে ছাপা শাড়ি ও হাই হিলের জুতা পরিয়া বেথুনের বাসে চাপিয়া কলেজে যাই।

বৃন্দাবন চাটুয্যের সেজ ছেলে বিকাশ। বয়স পঁচিশ। সে কেন আমাদের বাড়িতে আসে? সকালে সদর দরজায় অপেক্ষা করে,—কখন বাহির হইব। বিকালে পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কখন ফিরিব। সন্ধ্যায় বাড়ির ভিতর আসিয়া প্রার্থনাপূর্ণ নয়নে মুখের পানে চাহিয়া রহে। তাহাকে অনেক দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছি। সে বারণ মানে না। ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়াছি। সে নিরস্ত হয় নাই। বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়াছি। সে অবিচল। চিঠির উত্তর না পাইয়াও চিঠি লেখে। বারবার 'রং-নাম্বার' পাইয়াও টেলিফোন করিতে ছাড়ে না। হায়, তাহাকে কী ভাবে ফিরাইব?

আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক নই। মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারি না। কেবল ভয়ে ভয়ে থাকি। পদশব্দে সচকিত হই। ছায়া দেখিলে চমকিয়া উঠি। নিজের দুর্বলতায় নিজেই বিক্ষুব্ধ হই। ইচ্ছা করে, ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি, রাধিকা কেন তাহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন,—

"বারণ কর লো সই, আর যেন
শ্যামচাঁদ আসে না আসে না।"

বুঝিতে পারি, চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন,—

"যে না দেশে পুথির ঘর সেই দেশে যাব
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

কিন্তু পাঠক আমার এ হৃদয়বেদনা কি তুমি বুঝিয়াছ?

উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি ছাপা শাড়ি ও হাই হিলের জুতা পরিয়া বেথুনে যাই না। কারণ আমি পুরুষ মানুষ। ঘরে স্ত্রী আছেন, এবং সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করি।

কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি বাড়ি আছে। একেবারে সংলগ্নই বটে।

সে বাড়ির একটি ছোকরা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট। সবেমাত্র কাজে নামিয়াছে, এখন পর্যন্ত একটিও 'কেস' দিতে পারে নাই। সে প্রত্যহই আমাদের বাড়িতে আসে। সকালে আসে, বিকালে আসে, অনেক রাত্রি অবধি বসিয়া মাসিক দেয় চাঁদা এবং বার্ষিক প্রাপ্য বোনাসের অঙ্ক নামতার মত শুনাইয়া যায়। পথে ঘাটে দেখা হইলেই ফস করিয়া ফরম সামনে ধরিয়া সই করিতে বলে।

অনুনয়, বিনয় ব্যর্থ হইয়াছে। কটুবাক্য নিষ্ফল। আমিও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। পদশব্দে শঙ্কিত হই। ছায়া দেখিলে চমকিয়া উঠি। ইচ্ছা করে, শুধু ঘর নয়,—এ পাড়া ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাই।

বুঝিতে পারিতেছি, রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন,—

"বারণ কর লো সই আর যেন
শ্যামচাঁদ আসে না আসে না।"

শ্যাম বোধকরি তখন একটা পাঁচ হাজার টাকার এন্ডাউমেন্ট পলিসি গছাইবার ফিকিরে ছিলেন।

বুঝিতে পারি, চন্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

"যে না দেশে পুথির ঘর সেই দেশে যাব
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

বোধহয় ফি ডাকেই চন্ডীদাসের নামে বীমা কোম্পানীর ঝুড়ি ঝুড়ি প্রসপেক্টাস আসিতেছিল। আমার বাড়ির পাশে যাঁহাদের বাড়ি তাঁহারাও চাটুয্যে। বোধহয় যে ছোকরা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি করে তাহারই নাম 'বিকাশ' হইবে।

ইতি
শ্রীইনসিওরেন্সভীত।

দুই

আমার এ কী হইল ? এ কী বেদনা ? দিনে আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। মনে সুখ নাই। "অথির হইয়া ফিরি এখানে ওখানে।"

মলয় পবন, ফুলের সৌরভ, কোকিলের কুহুস্বর ও চন্দ্রের কিরণ সমস্তই আমার নিকট নিরর্থক মনে হয়। জীবন বিস্বাদ ঠেকে। নববরষার মেঘাড়ম্বর দেখিয়া হৃদয় আমার ময়ূরের মতো নাচে না, অধিকতর বেদনাভারাক্রান্ত হয়।

মনোবেদনায় নিশি জাগরণান্তে প্রভাতে উঠিয়া ভাবি,—আজিকার দিন ব্যর্থ যাইবে না। আজি মিলাইবে বিধি। দিন সাঙ্গ হয়, সন্ধ্যায় হৃদয় যন্ত্রণায় অধিকতর কাতর হইয়া পড়ি।

শুনিয়াছি কাব্যালোচনায় উদ্বেল হৃদয় শান্ত হয়। অমরশতকের অনুবাদ পাঠ করি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করি। কোন ফল হয় না।

আমার ন্যায় কোনো হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় কবি লিখিয়াছেন,—

"আর কতকাল থাকবো বসে ?"

বুঝিতে পারি, গ্রাম্য কবি কেন গাহিয়াছেন,—"আমার বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল শ্রীরাধা বিহনেরে।" হায়, আমি কী হইলাম ? আমি কী করিব ?

উত্তর

তুমি রিট্রেঞ্চমেন্টে পড়িয়া বেকার হইয়াছ। অতএব আহার, নিদ্রা এবং মনে সুখ না থাকিবারই কথা। অস্থির হইয়া এখানে ওখানে ফেরাটাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু মুরুব্বির জোর না থাকিলে কিছুই হওয়ার আশা নাই।

মলয় পবন, ফুলের সৌরভ, কোকিলের কুহুধ্বনি ও চন্দ্রালোকের সহিত ব্যাঙ্কের পাশ বই-এর একটা অদৃশ্য কিন্তু অবধারিত যোগ আছে। যাহাদের চাকরি নাই, তাহাদের কাছে ঐগুলি বাঙালী প্রকাশকের নিকট কবিতার পাণ্ডুলিপির ন্যায় অগ্রাহ্য।

প্রভাতে সংবাদপত্রের কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়িয়া মনে যে আশা জাগে সারাদিন চেষ্টার পরে অপরাহ্ণে তাহা বিলুপ্ত হয়। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তবে সন্ধ্যাবেলার হৃদয় বেদনা বলিয়া যাহাকে ভুল করিতেছ উহা আসলে উদরের যন্ত্রণা,—হৃদয়ের নহে। পাক-যন্ত্রের অবস্থানটা হৃদযন্ত্রেরই কাছাকাছি। সারাদিন অনাহারে থাকিলে সন্ধ্যায় গ্যাস্ট্রিক ব্যথা চাড়া দিয়া ওঠে, এ কথা কবিরা জানে না, কবিরাজেরা মানে।

অমরুশতক বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীতে তোমার কোন উপকার হইবে না। বরং দিন কতক পিটম্যানের শর্টহ্যান্ড চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

"বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলিবার" কথা নিতান্তই কবি-কল্পনা। উহাতে বিশ্বাস করিও না। নতুবা বিনা অন্নে ক্ষুধা নিবারণ হইত, বিনা বক্তৃতায় সভা।

তবে শ্রীকৃষ্ণের আমলে ব্রজধামে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। কাজেই বেকার কানু গয়লাদের পাড়ায় সোমত্ত মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করিয়া ও বাঁশি ফুঁকিয়া দিন কাটাইয়াছেন। একালে সভা, সমিতি, এসোসিয়েশান বা পলিটিক্যাল পার্টির অভাব নাই। তুমি অবিলম্বে আমাদের ডি· এস· পি ; সি· এস· পি ; এস· এস· পি প্রভৃতি যে কোনো একটা বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী দলে ঢুকিয়া নেতা বানিয়া যাও। সকল বেদনার অবসান হইবে।

ইতি শ্রীরাজনীতিক

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে।

নাম্নী

বর্তমান শতকের ত্রিশের পর্যায়ে বাংলা সাময়িক পত্রের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, অধুনালুপ্ত বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় কুমু ও মধুসূদন কাহিনীর গোড়াতে নাম ছিল,—তিন পুরুষ। দুই কিস্তি প্রকাশের পরে কবি তাঁর নব নামকরণ করেন—যোগাযোগ। পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে সে নামেই তার প্রকাশ ও প্রচলন।

নামান্তরের কারণ নির্দেশে কবি বলেন, নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে ছায়েবানুগতা হয়ে চলবে সে তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর ভাষায়, তিন পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এটা লেখকের খেয়াল, কিছু প্রমাণ করার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করার জন্যই। সুতরাং নামটা ত্যাগ করলে গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচাবে না। কবির মতে নামটা লাউয়ের বোঁটার মতো; তাতে ধরবার সুবিধে। বোঁটার আকার নিয়ে কেউ লাউয়ের বিচার করে না।

লাউ সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য নিতান্তই পরিমিত। শ্রাবণের মেঘকজ্জল দিবসে পুষ্পিত কদম্ববন অথবা হেমন্তের অলস অপরাহ্নে নির্মল নীল আকাশের নীচে স্বর্ণাভ শস্য-ক্ষেত্র অতি সাধারণ কবিত্বরসলেশহীন মানুষের মনকেও ক্ষণেকের জন্য মোহাবিষ্ট করতে পারে। কিন্তু উঠনের একপাশে বাঁশের মাচায় লম্বমান লাউয়ের দৃশ্য কোনো কালে কোনো কল্পনাপ্রবণ কোমল চিত্তকে উতলা করেছে, এমন কথা শোনা যায়নি। রোহিতের মুণ্ড বা গলদাচিংড়ি সহযোগে সুপক্ক ব্যঞ্জনে লাউয়ের যে রস তা যতই উপাদেয় হোক না কেন তার উপলব্ধি একমাত্র রসনাতেই সীমাবদ্ধ। অতি-ভোজন জনিত অপরিপাকে তার বেদনাদায়ক অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কাউকে যদি সচেতন হতে হয়; তবে সেটা উদরে, হৃদয়ে নয়। সুতরাং লাউয়ের বোঁটা সম্পর্কে কবিগুরুর অবজ্ঞা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারে নামটা কি সত্যি সত্যিই অলাবুবৃন্তের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর? সন্দেহ আছে।

পরিচয় সৌকর্যের জন্যই জগতে নামের উদ্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ একটা কার্যকারণহীন ঘটনা, ইংরেজীতে যাকে বলে আরবিট্র্যারী। মার্জার জাতীয় জন্তুর এক বিশেষ শ্রেণীর নাম বাঘ, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা ছাড়া অন্যত্র যার উল্লেখমাত্রই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। অপর শ্রেণীর নাম বিড়াল,—যে গৃহিণীর সস্নেহ পরিচর্যায় ঘরে ঘরে প্রতিপালিত। কে কবে এদের বর্তমান প্রচলিত নাম দিয়েছিল তা যেমন জানা নেই, বাঘকে বিড়াল এবং বিড়ালকে বাঘ আখ্যা দিলে কী ক্ষতি ছিল তাও তেমনি প্রাণীতত্ত্ববিদদের বুদ্ধির অগম্য। আমকে আমলকি এবং জামকে জামরুল বললে প্রচলিত ধারণার অপহ্নব ঘটতে পারে বটে, কিন্তু উদ্ভিদ রাজ্যে কোনো বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না।

ভাষান্তর ও স্থানান্তরের ফলে পরিচিত নামের অপরিচিত রূপান্তরে নামের এই কারণহীন উৎপত্তি আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। কে না জানে যে বরাকরের পুল পার হলেই বাংলার সিঙ্গাড়া বিহারের 'সামোশায়' পরিণত হয়, ট্যাড়স 'ভিন্ডি' আখ্যা পায় এবং তরুণীর সযত্নরচিত কবরীবন্ধনে শ্বেত করবীর গুচ্ছটি মুহূর্তেই 'কানের' হয়ে ওঠে? তাতে তাদের স্বাদ, গন্ধ বা শোভার কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম অবশ্য বস্তু বা প্রাণীর আকার, বর্ণ বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। সেখানে যদৃচ্ছ নামকরণের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। গোলাকার সন্দেশের নাম বরফি এবং চতুষ্কোণ মিষ্টান্নের নাম কাঁচাগোল্লা হলে তাদের মিষ্টত্বের হানি ঘটে না, কিন্তু চোখে হাস্যকর এবং কানে পীড়াদায়ক হয়। দোকানে শাড়ি লাল, সবুজ বা বাসন্তী যে কোনো রঙেই স্ত্রীর মনে চাঞ্চল্য এবং স্বামীর পকেটে ছিদ্র সৃষ্টি করতে সক্ষম; কিন্তু নীলাম্বরী শুধু একটি বিশেষ রঙেই প্রাপ্তব্য। আষাঢ় গগনের পুঞ্জিত ঘনঘটায় দিনান্তে যদি কেউ ব্যাকুল কণ্ঠে "ধবলীরে আন গোহালে" বলে হাঁক দেয় তবে যে পয়স্বিনী গাভীর চিত্রটি শ্রোতার মনে জাগে তার রঙটা অবশ্যই সাদা।

শনাক্তকরণ নামের অন্যতম উদ্দেশ্য,—একমাত্র নয়। নইলে নামের বদলে সংখ্যা দিয়েই পালা মিটতো। রাস্তায় কর্পোরেশান বা মিউনিসিপ্যালিটির নম্বর মিলিয়ে অনায়াসেই বাড়ি চেনা যায়। খামের উপরে পঁয়ষট্টি-বি কিংবা একশ তিয়াত্তর ডি-ওয়ান লিখলেই ডাকপিয়ন যথাস্থানে চিঠি পৌঁছে দেয়। তবুও নতুন বাড়ি তৈরী করে বাড়ির মালিক তার নাম দেন 'উদয় ভিলা', গেটের গায়ে পাথর বা কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ করেন "শান্তি কুটির" অথবা তার চাইতে বেশী কাব্যগন্ধী,—"মিতালী" বা "মালঞ্চ"। সেগুলি বাড়ির শুধু আখ্যা নয়, আভরণও বটে। আসল কথা, গল্প লেখা বা ছবি আঁকার মতো নামকরণও মানুষের রচনাত্মক মনোভাবের একটা বিশেষ প্রকাশ। কল্পনাশ্রয়ী শ্রবণসুখকর নাম দিয়ে সাধারণ জড় বস্তুকেও মানুষ অসাধারণত্বের স্পর্শ দেয়। রেলের উপর দিয়ে যে গাড়ি চলে তার রেলগাড়ি নামটা পুরোপুরি অর্থসঙ্গত। কিন্তু সেটা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক। পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার বা ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস বললে নামটা সমষ্টির গণ্ডি থেকে ব্যষ্টিতে, বহুর মধ্যে থেকে একের কোঠায় নেমে আসে। তবুও সে নাম পরিচয়ের চিহ্ন মাত্র। চা-বাগানের যেমন উর্দি ,ভলান্টিয়ারের যেমন ব্যাজ, বেষ্টামের যেমন কণ্ঠি। শুধু গতির আভাস বা গন্তব্যের হদিস ছাড়া তার সঙ্গে টুয়েন্টি-আপ বা থার্টিসেভেন-ডাউনের তফাৎ সামান্য। কিন্তু ডেকান কুইন বা ফ্লাইং স্কটম্যান নামের মধ্যে আছে এমন কিছু যা নামের অধিক। সে রেলগাড়ির বস্তুরূপকে অতিক্রম করে ভাবরূপে পরিব্যাপ্ত। ট্রেনকে সে শুধু পরিচিতি নয়, ব্যক্তিত্ব দান করে।

রজ্জুতে সর্পভ্রম মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ সৃজনধর্মী মনের সার্থক বিকাশ। আমের বস্তুরূপটা ফল ; পোস্তা অথবা হাতিবাগানে যা ঝুড়ি দরে বিক্রী হয়। আমের ভাব রূপটি আছে রাণীপসন্দ নামের মধ্যে। তাতে আছে উন্নতরুচি রাজমহিষীর দুর্লভ পক্ষপাতের ইঙ্গিত। 'ইউ'দের সেন্ট এবং 'নন-ইউ'দের পারফিউম কথাটায় অতি আধুনিকাদের টয়লেট কেশে সুদৃশ্য শিশিতে-ভরা প্রসাধন দ্রব্যের গুণের ব্যাখ্যান হয়। 'ইভিনিং-ইন-প্যারি' বা 'রেড মস্কো' নাম তাকে দেয় স্বপ্নলোকের মোহজাল। সেটা নোবেল প্রাইজ পাওয়া রাসায়নিকেরও সাধ্যাতীত।

গোলাপ যে-কোনো নামেই সমান মনোহরণ করে বলে যে মহাকবি নামের গুরুত্ব অস্বীকার করে গেছেন, হায়, তাঁর জানবার সুযোগ হয়নি যে গোলাপ-বিলাসীরা ইতিমধ্যে গোলাপেরই সহস্রাধিক নামকরণ করেছেন। বস্তুহিসাবে গোলাপের যে মাধুর্য তা কয়েকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের মধ্যেই নিবদ্ধ। তার জন্যে চমৎকারিত্বের প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু পিকাডেলী, মন্টিভুমা বা ফ্লেমিং সান-সেট নামের মধ্যে আছে একটা ভাবের ইসারা যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না। সে নামগুলি গোলাপকে এমন একটি স্নিগ্ধ মহিমা দান করে যা তার শোভা ও সুরভির বহু উর্ধ্বে। সে নামের পিছনে বোটানিস্টের হাত নেই, কল্পনাপ্রবণ কবিমানসের সুকুমার অনুভূতির চিহ্ন আছে যা রূপকে করে অপরূপ, রসকে করে বচনাতীত।

বস্তুর ন্যায় ব্যক্তির পরিচয় কেবল গুটি কয়েক প্রত্যক্ষগোচর গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার আত্মপ্রকাশের ধারা বহুবিধ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরিবেশে তার বিভিন্নরূপ। সকালবেলা থলে হাতে গড়িয়াহাটের বাজারে যিনি আলু কেনেন, দুপুরে হাইস্কুলে তিনি ছেলেদের কল অব থ্রির অঙ্ক কষান, বিকালে ময়দানে সবুজ গ্যালারীতে বসে মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গলের জন্য চেঁচিয়ে গলা ফাটান। অধস্তন কেরানীদের কাছে আপিসের যে বড়সাহেবের দুর্ধর্ষ চেহারা, ঘরে শাসনপটু গৃহিণীর কাছে তাঁরই বিনয়াবনত মুখ।

এই বহুমুখী অস্তিত্বের মধ্যে মানুষের পরিচয় যখন পারিবারিক সম্বন্ধের সূচনা করে তখন তার নাম প্রচলিত প্রথা দ্বারা সুনির্দিষ্ট। সম্পর্কের বিচারে আমরা কাউকে বলি ছোড়দি ; কাউকে বলি—বেয়ানঠাকরুণ। ভাষা ভেদে খুড়োমশাই চাচাজী এবং বউদি ভাবীতে রূপান্তরিত হতে পারেন। কিন্তু মূলতঃ সে নামগুলি সরকারী আপিসের কার্যবিধির মতো স্মরণাতীতকাল থেকে অবিসংবাদে স্বীকৃত। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি মানুষের সংজ্ঞা নয়,—সম্বোধন।

কখনও কখনও মানুষের নামে থাকে তার জাতি বা বৃত্তির নিশানা। পাড়ার বাসুনদি সম্পর্কে

আর কিছু না জানলেও এইটুকু জানি যে, তিনি কায়েতের মেয়ে নন। পণ্ডিতমশাই-এর বিদ্যা অথবা পুরুতঠাকুরের সাত্ত্বিকতা নিয়ে মতদ্বৈধ ঘটতে পারে। কিন্তু তাঁদের জীবিকা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁদের বনমালী, গোবর্ধন, চন্দ্রমোহন বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত নাম নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। কিন্তু একমাত্র ভোটার লিস্টে ছাড়া অন্য কোথাও তার কোনো খোঁজ পড়ে না। রেলের মালবাবু এবং আদালতে জজসাহেবের পিতৃদত্ত নাম চাপা পড়ে থাকে তাঁদের চেয়ারের আড়ালে। পদ ও পদবীতে প্রভেদ থাকে না। বস্তুতঃ মাইনারের মাথায় হেলমেট এবং আম্পায়ারের গায়ে সাদা কোটের মতো পেশা দিয়ে যে শুধু পোশাক নিরূপিত হয় তা নয়, নামেরও উদ্ভব ঘটে।

কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে প্রকাশ তা আপিসে প্রমোশন, ইলেকশানে ভোট এবং সংবাদপত্রে শোক-সংবাদ রচনার জন্যে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন মানুষের পরিচয়ের দিক দিয়ে তা একান্তই আংশিক। কর্মকেন্দ্রিক জীবনের বাইরে নরনারীর যে একটি বৃহত্তর সত্তা আছে তা কোনো একটি বিশেষ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত নয়। লঙ্কায় ঝাল, তলোয়ারের ধার এবং বাঁশিতে সুর ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করিনে। কিন্তু মানুষকে পাই তার রূপ, গুণ, বীর্য, প্রেম, ধৃতি ও তিতিক্ষায়। পুণ্যে পাপে, দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে তার ব্যক্তিত্ব বহুধাবিকীর্ণ। মানুষের এই বহু বিচিত্র বিকাশকে কোনো একটি মাত্র নামের মধ্যে ব্যক্ত করা কঠিন। তাই পুরাণ ইতিহাসে ব্যক্তির একাধিক নাম। মহাভারতের ভীম বৃকোদর, রামায়ণের রাবণ দশানন এবং দশরথ-তনয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

সেকালে ঠাকুর দেবতাদের নাম ও নারী দুই-এরই সংখ্যা ছিল অগুনতি। কৃষ্ণের শতনাম, সহস্র গোপিনী। বর্তমান মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে সে সব এলাহী কাণ্ড ভাবতেও আমাদের হৃৎকম্প হয়। একশ্চন্দ্র যেমন তমোহন্তি এখন এক স্ত্রীই শান্তি হরণের জন্য যথেষ্ট।

নামের বহুলতা একালেও একেবারে পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। ওয়ারড্রোবে পোশাকী ও আটপৌরে দুই প্রস্থ শাড়ি গয়নার মতো বেশীর ভাগ মেয়েরই নামও একাধিক। কলেজের রেজিস্টারে যে তন্বঙ্গী বিদ্যার্থিণী বাসন্তিকা রায়, বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে সে হয়তো টুনু বা বাবলু। ছেলেদের নামেরও সদর অন্দর আছে। এন্ডারসন কোম্পানীর মুৎসুদ্দী মহাতপ চাটুয্যের ঝাঁটার মতো গোঁফ, হাঁড়ির মতো ভুঁড়ি এবং ফুটবলের মতো টাকের পানে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা জানেন, তাঁর বৃদ্ধা পিতামহীর কাছে তিনি এখনও খোকন।

সংসারে আলো ও বাতাসের মতো নামটাও এত স্বতঃসিদ্ধ যে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা নিজেরাও তেমন সচেতন নই। দুর্ভিক্ষ এ দেশে প্রাত্যহিক এবং রাষ্ট্রবিপ্লব আছে শুধু সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু রাজদ্বারে শ্মশানে চ যার খোঁজ পড়ে থাকে সে হচ্ছে নিজের নাম। আপিসের হাজিরা বই থেকে রেশনের কার্ড এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে জমির দলিল অবধি সর্বত্রই নামের উল্লেখ চাই। আপনাতে আপনি বিকশি বৃন্তহীন পুষ্পের খবর আছে কবিসম্রাটের কল্পনায়, রাষ্ট্রহীন নাগরিকের অস্তিত্বও অসম্ভব নয় আধুনিক জগতে। কিন্তু নামহীন মানুষের জায়গা নেই কোনোখানে। যাঁরা বলেন যে জেলের কয়েদী এবং স্টেশনের কুলীদের নাম নেই, আছে নম্বর, তাঁরা জানেন না যে এগজামীনের খাতার মতো তাদেরও পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা থাকে নেপথ্যে।

সবাই জানি, মহাত্মা বলতে বোঝায় গান্ধীজিকে। বালগঙ্গাধর তিলকের আখ্যা ছিল লোকমান্য। দেশবন্ধুরূপে জনচিত্তে আজও অবিস্মরণীয় বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ। এগুলি তাঁদের পিতৃদত্ত নাম নয়,—আপন পুণ্য জীবনের মহিমামণ্ডিত লোকদত্ত বিশেষণ, অগণিত অনুরক্ত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। কিন্তু সংসারে বেশীর ভাগ নামই অর্জিত নয়, প্রাপ্ত। জমিদার-নন্দনের যেমন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, মন্ত্রীদের যেমন মোটরকার।

ভূমিষ্ঠ হয়েই বিত্তলাভ ঘটে কোটিতে গুটিকের। জন্ম নিলেই একটা নাম জোটে যে-কোনো শিশুর। বলাবাহুল্য, সে নাম নির্বাচনে শিশুর নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। অর্থের সাচ্ছল্য থাকলে বেনারসী, চন্দ্রহার, মোটরগাড়ি মায় স্বামী পর্যন্ত পছন্দ করে নেওয়া চলে। কিন্তু নিজের

কৌলিক নামের উপরে নিজের রুচি খাটে না। ঐখানে আমরা সবাই পিতৃমাতৃনির্ভর। তাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে বই-এর ভ্রমসংশোধনের মতো নামেরও পরবর্তীকালে পরিমার্জন, পরিবর্জন ঘটে। পেলারাম পেলব রায়ে পরিণত হয়, অরুণ চাটুয্যে হন উত্তমকুমার।

সুখের বিষয় নিজের নাম নিয়ে নিজের কোন দায় নেই। সন্তানের শিক্ষা সহবৎ এবং আচার আচরণে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মা-বাবাকে নিন্দা সইতে হয়। কিন্তু তার নামকরণের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। শরৎচন্দ্রের নায়ক ঈর্ষাদগ্ধ সতীশ মেসের ঝি সাবিত্রীকে "মা-বাবা সার্থক তোমার নাম রেখেছিলেন" বলে ব্যঙ্গ করেছিল। সেটা নিতান্তই রাগের কথা। নইলে একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, নামের অর্থ বজায় রেখে বেঁচে থাকা পৃথিবীতে খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

কানাছেলের পদ্মলোচন নাম কৌতুকের বিষয় সে-কথা বাংলা প্রবাদে বলে। টেলিফোন বাঙের কন্যার নাম গৌরী শুনলেও চমকে উঠতে হয়। কারণ অসঙ্গতিটা এতই সুস্পষ্ট যে অতিশয় নির্বোধ ব্যক্তির কাছেও তা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু শিশু সাধুচরণ যদি বড় হয়ে নোট জাল করে জেলে যায় এবং বৃদ্ধদেব বাঁড়ুয্যে যদি পুলিশ কোর্টে নারী হরণের মামলায় আসামী হয়, তবে তাদের নাম নিয়ে তাদের মা-বাবাকে খোঁটা দেওয়া চলে না। জনক-জননী স্নেহপরায়ণ হবেন, এটা স্বাভাবিক। তাঁরা যে জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞও হবেন, এমন প্রত্যাশা অনুচিত। পাঁজি দেখে যাত্রা এবং ঠিকুজি দেখে বিয়ের সম্বন্ধ আমরা অনেকেই করে থাকি। কিন্তু করকোষ্ঠি দেখে ছেলের নামকরণ করেছেন এমন সাবধানী বাপের কথা আজও শোনা যায়নি।

ইংরেজীতে একটা সহজ নিয়ম আছে যাকে বলে, রুল অব থাম্ব। তাতে অনেক জটিল বিষয়ের কাজ চালানো মীমাংসা হয়। নামকরণেও গোটা কয়েক সাধারণ নীতি মেনে চললে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে না। এযুগে রাজা প্রায় সব দেশ থেকেই অন্তর্হিত, রাজা চালায় রাজপুরুষ। সুতরাং নৃপতি, ভূপতি, নাম নিয়ে আর টানাটানি করে কাজ নেই। সোনা যখন বাজারেই ফোরটিন ক্যারেট তখন হিরণ্ময়ী বা স্বর্ণলতারা নিশ্চয়ই অলীক এবং সোনামণিরা এ্যানাক্রোনিজম। মোট কথা, বাঙালী ছেলেদের নাম বীরেন্দ্র এবং বাঙালী মেয়েদের নাম সুদর্শনা না হলেই ভালো। জানি, স্নেহ অন্ধ এবং কল্পনা বল্গাহীন। কিন্তু তারও একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা প্রয়োজন মনে করি।

জীবনে নামকরণের গুরুত্ব যতটুকু সাহিত্যে তার বেশী। মানব মনের সুকুমার ও সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ। তার যে রস সে অনির্বচনীয়। কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা। সে-রস শুধু পুঁথির পাতার মধ্যে নয়, পাঠকের হৃদয়ের গভীর উপলব্ধিতে প্রসারিত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের তত্ত্ব লেখকের কলমের মারফতে যতখানি প্রকাশ ততখানিই বোধ্য। সাহিত্যে লেখার যেথায় শেষ সেথায় বোঝারও অন্ত নয়।

নির্দিষ্ট অক্ষপথে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে জগতে দিবা-রাত্রি ঘটে, ছাপার অক্ষরে এটা একটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু 'গগনে গরজে মেঘ' এই যুক্তাক্ষর বর্জিত অতি সহজ তিনটি শব্দের সমাবেশ আমাদের কাছে শুধু তথ্য বহন করে না, মনের পর্দায় ঘনবরষার একটি শ্যাম গম্ভীর চিত্র সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানে বস্তুটাই মুখ্য। সাহিত্যে ব্যঞ্জনটাই আসল। ওস্তাদী গানে কথার মতো তার বিষয়টা অপ্রধান।

কাব্য উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে আমরা গ্রন্থকারের রচনার সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিনে, আপন কল্পনার তুলিতে রাঙিয়ে তুলি। নাম সেই অঙ্কনকার্যে সহায়তা করে। কবি ও কথাশিল্পীরা যে তাঁদের কাব্য ও পাত্র-পাত্রীদের নামকরণে বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন সেটা অকারণ নয়। মলাটের উপরে 'প্রাথমিক পাটীগণিত', বা 'ইংলন্ডের ইতিহাস' দেখলে বই-এর ভিতরে কী আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হই। প্রয়োজন হলে কিনতেও দ্বিধা ঘটে না। কিন্তু 'নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলন' নাম হলে অতিবড় রাবীন্দ্রিকও 'নৌকাডুবি' পড়তে উৎসাহ বোধ করতেন কিনা সন্দেহ, যদিও নামটা বিষয়সঙ্গত। কবি নিজেও সাহিতো নামকরণের এই গুরুত্ব সম্পর্কে কম সচেতন ছিলেন না। দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হতো তবে পঞ্চপতিগর্বিতা সেই ক্ষত্র নারীর দীপ্ত তেজ যে ঐ তরুণ কোমল নামটির দ্বারাই পদে পদে খণ্ডিত হতো সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়

ছিলেন।

পোশাকের মতো নামেরও বাহার এবং বৈচিত্র্য ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বেশী। অতীত থেকে বর্তমান অবধি বাঙ্গালী পুরুষের নামের হেরফের যা হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত অল্প। মেয়েদের নাম তাদের শাড়ির পাড় এবং ব্লাউজের ছাট-কাটের মতো অনেক অদল-বদলের মধ্য দিয়ে চলেছে। সে বিবর্তনের ধারার সঙ্গে বাংলা বই-এর নামকরণের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আদি যুগে নাম ছিল ঠাকুর দেবতার অনুকরণে। যথা, মেয়েদের নাম—জগদম্বা, যোগমায়া বা সিদ্ধেশ্বরী। বই-এর নাম,—অন্নদামঙ্গল, হরিবংশাবলী, কৃষ্ণচরিত্র। পরবর্তীকালে চার পাঁচ অক্ষরের পার্থিব নাম। যেমন মেয়েদের শৈলবালা, কমলকুমারী, মাধুরীলতা এবং উপন্যাসের দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কন। তারপরের অধ্যায়ে তিন অক্ষরের সাদা সিধে নাম। তখন মেয়েরা মালতী, দামিনী ও সুষমা। বই - গীতালি, বলাকা, ও চৈতালী। মাঝে মাঝে যমকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিশুদের ফালতু বা হেলা এবং সমালোচক ঠকাবার জন্য পুস্তকের পর্ণপুট বা তৃণখণ্ড নামও দেখা গেছে।

একদা ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর মন্দতেজ নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে বিদেশী ভাবধারার একটা প্রচণ্ড জোয়ার এসেছিল। সে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে আমাদের বহু জীর্ণ ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের মূল ধ্বসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাতে আমরা উপকৃত হইনি একথা বললে সনাতন আর্যধর্মের জয় হয় কিনা জানিনে, সত্যের মর্যাদা নিশ্চয়ই রয় না। অবশ্য জোয়ারের প্রথম বেগে জল মাঝে মাঝে নদীর কূল ছাপিয়ে যায়। তাকে বলি বন্যা। সে দিনের বিলাতীভাবের বন্যায় আমাদের শিক্ষিত সমাজেও একটা নোঙর ছেঁড়া, বাঁধন ভাঙার ঢেউ উঠেছিল, চলতি কথায় যাকে বলা হত সাহেবিয়ানা। তার কতটা ভালো, আর কতটাই বা মন্দ সে-বিচারের ভার ঐতিহাসিকের। তবে একথা ঠিক যে মাঝে মাঝে তার অত্যুগ্র প্রকাশ ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলা, বা পা ফাঁক করে সিগারেট খাওয়ার মতো নিছক অর্থহীন পরানুকরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেদিনের নামকরণের মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইঙ্গবঙ্গ মনোভাবের পরিচয় ছিল। আইভি-দি, কুইনী-মাসি, মিলি মিত্তির, মেরী চ্যাটার্জীরা শুধু সমাজের উচ্চস্তরেই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা দিয়েছিলেন। সেদিন বাঁড়ুয্যেরা ব্যানার্জী হয়েছেন, বসু মশাই—মিঃ বোস। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ডি-এল-রায় এবং সিভিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ রায় এস-এন-রে নামে পরিচিতি লাভ করেছেন।

নামের এই বিলাতীকরণ পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যবসায়িক জগতেও সংক্রামিত হয়েছিল। দত্ত এ্যান্ড কোং বা চ্যাটার্জী ব্রাদার্স নাম ইংরেজী এ্যান্ডারসন লিমিটেড বা পিলকিংটন এ্যান্ড সন্সের অনুকরণ হলেও একেবারে অভূতপূর্ব নয়। বিদেশী হাওয়া গায়ে লাগার আগেও আমরা হাটে বাজারে 'সাহাদের আড়ৎ' বা 'চৌধুরীদের গদি'র সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। পালেস্ পল্ এবং করেরা কার হওয়াতেও অবাক হইনে। কিন্তু বিপিন মোদক যখন বি-পীন-এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং গোপাল বটব্যাল যখন জি-ও-পী-অল (প্রাইভেট) লিমিটেড নামে ব্যবসা শুরু করে, তখন নামের গায়ে বিদেশী আস্তরণ লাগাবার প্রয়াসটা আর উহ্য থাকে না। অবশ্য যে-যুগে ডবল দামে সাহেবী দোকান থেকে জিনিস কেনা প্রগতি এবং আভিজাত্যের লক্ষণ গণ্য হতো সে-যুগে এ মনোভাব সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। স্বনামে পুরুষ ধন্য হতে পারে, কিন্তু ধনী হতে গেলে অনেক সময়ে বেনামীতেই কাজ সারতে হয়, এ তথ্য বর্তমান ব্ল্যাক মার্কেটের দিনে কে না জানে?

বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে—এভরি এ্যাকশন হ্যাজ ইটস্ ইকুয়্যাল এ্যান্ড ওপোজিট রি-এ্যাকশান। অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও কথাটা কম প্রযোজ্য নয়। যৌবনে যাঁরা মদ্য, মাংস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সম্পর্কে একেবারে মোহমুক্ত পুরুষ, বার্ধক্যে তাঁরাই গীতা, গঙ্গাস্নান ও গুরুদেব নিয়ে মাতামাতির আর সীমা রাখেন না। বাঙালীর নামকরণেও এই নিউটনীয় সূত্রের প্রভাব আছে। বিগত যুগে যেমন ইংরেজী নাটক-নভেল থেকে মেয়েদের নাম আমদানি করা হতো, বর্তমান যুগে তেমনই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য মন্থন করে নাম নির্বাচন

হচ্ছে। একালের গয়নার ডিজাইনের মতো নামেরও প্রাচীনত্বটাই আধুনিকতার চিহ্ন। এ্যান, ন্যান্সী এখন আর ফ্যাশান নয়। এখনকার নাম,—স্বাতী, শর্মিলা, চিত্রলেখা বা প্রজ্ঞাপারমিতা।

দোকানের সাইনবোর্ডেও এখন রিভার্স গিয়ারের পালা। অক্সফোর্ড স্টোর, এম্পায়ার মেডিক্যাল হল্ কিংবা এলিফিনস্টোন পিকচার প্যালেস এখন পুরাতত্ত্বের কোঠায়। হালে বাবাদের দোকানের নাম মিষ্টিমুখ, সিনেমার নাম রূপালী এবং জুতার দোকানের নাম শ্রীচরণেষু। প্রতিক্রিয়া ? বোধ হয়। প্রতিশোধ বললেও ক্ষতি নেই।

সে বাসিন্দা ইংরাজ কণ্ঠে অপরাধের স্বরে বলল, "এই দিন কয়েক হল, আমিই দিল্লী গিয়ে বেণ্টিঙ্ক বন্দুরে জেনারেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ছাড়িয়ে এনেছি।"

বিস্ময় দৃষ্টিতে নির্বাক তার পানে তাকিয়ে রইলাম।

পাই দুইশিল-বাক্সিয়ে তার দাদনের সরুক আলোটা উস্কিয়ে ধরল।

জট

রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা একটি মহৎ গুণ। অন্তত নিরপত্তা ধূলি-পুস্তকে সে কথাই লেখে। আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইস মেকস্ এ ম্যান হিলথি অ্যান্ড ওয়াইজ। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা ক্ষমা করেন, ও কাণ্ডটি আমার জন্য নয়।

আমরা দিনের অন্যান্য সম্পাদকীয় ও নানা কথার প্যাদি লুপ্তটা নিজে 'পাস' না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে আপিস থেকে উঠতে পারিনে। ততক্ষণে রাস্তার শেষ ট্রাম ডিপোতে ফিরে যায়, বন্ধিস মোড়ে চিনুপুরানী পানওয়ালার দোকানে ঝাঁপ বন্ধ হয় এবং পাড়ার অধিকাংশে ল্যাম্পো নিবুইয়ে অন্ধকার নেমে আসে।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে আহার ও সিগারেট শেষ করে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘড়ির কাঁটা বারোটার নিশানা পার হয়ে যায়, ইংরেজী ম্যাগেজারে প্রবিধের পরিবর্তন ঘটে।

বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আটটার আগে শয্যা ত্যাগ শুধু কঠিকর নয়, ইতিমত দুঃসাধ্য। অফিসিয়ের টাইপার-রিটার এবং পুরীর সমুদ্রতীরে ঘুরাঘুর নিশ্চয়ই অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু সেটা এমেরিকান টুরিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজিনের তরুণ কবিদের জন্যই তোলা থাক। তা না দেখার মনোবেদনায় আমি কিছুমাত্র ম্রিয়মান নই।

আজও যখন ঘুম ভাঙল, আকাশে সূর্যকরণের তখন যথেষ্ট উত্তাপ। পাশের বাড়ির হেসেসে কড়ায় ঘন ঘন ঘৃত আলোড়নের শব্দ এবং মাঝে মাঝে কি চাকরের সরোষ ভর্ৎসনা। বোঝা যায়, কেরানীবাবুদের আপিস অভিযানের সময় অনুবর্তী।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সিনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিই। মন্দা নিয়ে সংখ্যা যায় না। সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু সম্পাদককে নিজের শক্তিকা পড়তে হয়। শুধু পড়া নয়, আর ঘিনঘান প্রতিবাদী কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হয়, কোথায় কী ভুল-ত্রুটি ঘটিয়ে। তার পরেই টেলিফোনে এক প্রস্থ প্রশ্ন, অনুযোগ, নির্দেশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুঃ, তরমনা বা সতর্কীকরণ। কপোরেশনের ধরাটা 'নবযুগের' তরুণ লেখে বেরিয়েছে; আমাদের কাগজে রিভিউ পাঠাব কেন? 'রাত্নপরী' প্রথম মহীর শুভ্র টাটা ঝাঁস করেছে; আমাদের সাঁয় রিপোর্টারেরা কি ঘুমুচ্ছে? মিউজ এডিটার, টাফ-সহ, স্পেশাল রিপ্রেসেনটেটিভ কাউকেই রেহাই দিই নে।

আজটা অগ্রিম সাক্ষ্যে নেই। অবশ্য অপরিহার্য। সাধারণত মিটিঙ্গ হয়ে পাবে, কিন্তু নির্বিকল্প নয়। বাজারে ঘিঁচির কোম্পানির সিগারেট, সাবান বা তরল আলতার মতো পত্রিকার জনপ্রিয় অপিসটিপন মনে প্রতিযোগিতা আছে।

প্রাত্যহিক কর্মসূচীর এই অবশ্যম্ভাবী চেইনফোন পর্ব সমাধা করে যখন দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের প্রতীক্ষায় আছি, তখন তৃতা এসে যোগেন করল—জনাব বাবু আসিছন্ত।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকাতেই কিঙ্কিত বিস্তারিত করে বলল,—সে, আরোগ্যবাবু অছি।

সংবাদে। অমার হলাম। 'ব্রিটিশ অমায়ে সম্পাদকের গৃহে সংবাদে এবং তাঁর আগমনীতেও মুহূর্তমান একবারও অন্তরাত্মার্থির হিন না। বিশ্ব এবা বারে সময়ে এবং আমাদের এ বাড়িতেও প্রায়ের তাহাদির অধিকের আনকালাই ঘটেছে। তবের বাস্তবনীতিরা বাগান-দরে এবনটি ইন্টিয়ান ইন্ডি-কলাই পরিচ্ছ পদ্ধতের অন্ত হয় প্রশ্ন অনুযোগ, জিজ্ঞাসা, কখনটি মাত্র চতুর্থ প্রশ্নটা কিছুই বাদ যাবনে। সন্তুষ্ট পাহাড়ায় কারণ বন্ধ ঘটি ঠোপ পাহাড়কেমে লাভ দিয়ে চোর

ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ও আলিপুর সেণ্ট্রাল অথবা রোমিয়েশী জেল—সব কিছুরই অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে দিনকাল বদলেছে। গভর্নমেণ্টকে গাল দিলে এখন আর রাজদ্রোহ হয় না; বরং কাগজের জনপ্রিয়তা অর্থাৎ বিক্রি বাড়ে। সম্পাদকের খাতির বিস্তৃত এবং বাজিকের বাজে খরচা পরিপুষ্ট হয়।

তবুরোলের চাইতে কলমের জোর বেশী এ কথাটা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেবার মূল বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুলিশের চাইতে যে প্রেসের প্রতাপ প্রবল, সে বিষয়ে এখন দ্বিমত নেই।

বেণীশঙ্কর অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রইল না। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পরে আগন্তুক নিজেই পরিচয় দিলেন। নাম সুধীর বসু। কলকাতা পুলিশের—ঘাবড়াও না, ইনস্পেক্টার। বর্ষিও ইতিপূর্বে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটেনি, তিনি আমারই নিকট প্রতিবেশী। রাস্তার ওপারে লাল বাড়িটায় থাকেন।

বিস্ময়ের কিছু নেই। কথামালার কৃপে নিমজ্জিত জ্যোতিষীদের ন্যায় সাংবাদিকদের দৃষ্টিও সুদূর নভোমণ্ডলে নিবদ্ধ। পায়ের কাছে যত্ন গহরের তাঁরা খোঁজ রাখেন না। কাটাকার পোছে বা টিউটিনিশায় বেন খেদার নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমাদের নখাগ্রে। পাশের বাড়ির মানুষটিকে চেনা দূরে থাক, তার নামও জানিনে।

উৎসা পক্ষে ভদ্রতাসূচক সামান্য দু একটা মামুলি কথাবার্তার পরে সুধীরবাবু বললেন, "আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি।"

এবার অবাক না হয়ে উপায় নেই। সম্পাদকের কাছে প্রত্যহই লোক আসে এবং একটু অধিক সংখ্যায়ই আসে। তারা কেউ নিজের বক্তৃতা বা বিবৃতি ছাপাতে চায়, কেউ বা বলা অভাব-অভিযোগের চিঠি, কেউ বা প্রকাশ করতে চান পাড়ার ক্লাব বা মহিলা সমিতিতে সভীত অথবা নৃত্যকলায় নিজের অন্যূন কন্যার প্রাইজ পাওয়ার বিবরণ ও ফটোগ্রাফ। সম্পাদকের কাছে উপদেশ চাইতে আসাটা অভূতপূর্ব বটে। ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে হয় তো।

সুধীরবাবু কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গেই বললেন, "ঠিক কী ভাবে যে বিষয়টা আপনাকে বোঝাব ভেবে পাচ্ছিনে। দিন দুই হলো একটি মেয়েকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

সে কী কথা? এতকাল তো জানতেম, খ্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরাই পুলিসের ফ্যাসাদে পড়ে থাকে। কিন্তু সে-কথা ভদ্রলোককে বলা যায় না। তাই বিস্ময় গোপন করে ঘটনাটি জানতে চাইলেম।

সুধীরবাবু বললেন, "ঘটনাটা বড়ই অদ্ভুত। অবশ্য দিন সন্ধ্যাবেলা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, উঠোনে একটি মেয়ে বসে আছে। চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো, হাত-পা কাঠির মতো, চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে। বিদীর্ণ আকৃতি থেকে বয়স সঠিক অনুমান করা শক্ত। তবে সেটা যে শঁচিশের উপরে নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের ভিখারী, অনাহারে অস্থিচর্মসার। পাকা থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা আধুলি দিতে গেলেম। নিলে না। হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল—'সাহেব আমাকে বাঁচাও।'"

বিস্ময়ের বিষয়, মানতেই হবে। গাজী মূলে আনকে স্বেচ্ছায় জেলে যেতে বাজী। কিন্তু তাঁরা তো বেশীর ভাগই এখন মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী। মিথন পক্ষে এমপি, এম-এল-এ হয় তাঁরা পার্লামেণ্ট ও লাইসেন্সের চৌহদ্দি আছেন। আপনি সোবৃষ্টিসিতে ভরাতে চায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে? পাগল নয় তো?

সুধীরবাবু নিজেও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু বাক্যালাপে পরীক্ষা করে বোঝেন, তার অস্বাভাবিকতার কোনো লক্ষণ নেই। তার বাই হোক, মেয়েটা যে উন্মাদ নয়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক প্রথমে তিনি কথায় বুঝিয়ে পরে কড়া ভাষায় শাসিয়ে মেয়েটিকে তাড়াতে চেষ্টা করেছেন। সে কিছুতেই নড়তে না।

ইনস্পেক্টার-গৃহিণী মেয়েদের সব সমস্যার উত্তর দিয়েছেন। কলকাতার বাড়িতে একটা ঠাকর রাখবে ও ইবনিমিক-কুকার সঙ্কল করে গৃহকর্তা এক বাস করেছেন। তার মতে ইহার এ কী

মুহূর্ত তালিকার মধ্যে থেকে একটি ঘটনা আমাদের নিস্তব্ধ সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায় একেবারে ডবল কলাম হেডিং নিয়ে প্রকাশিত হলো। পাটক মহলে চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

এসেম্বলীতে প্রশ্নোত্তরকালে বিক্ষোভের ঢেউ উঠল। একথা কি সত্য যে, রসুলপুর গ্রামে জনৈক অনাথা বিধবার একমাত্র শিশুপুত্র খাদ্যাভাবে অনাহারে মারা গেছে? উইল দি অনারেবল চীফ মিনিস্টার বি প্লিজড টু স্টেট—?

গভর্নমেন্ট প্রথমে অস্বীকার করলেন। পরে সাপলিমেন্টারীর চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, তাঁর বিশেষ কোনো অসুখ ছিল না। বললেন, ডাক্তারের অভিমতে যথোচিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস মৃত্যুর কারণ।

এ রকম খানাই-পানাই যুক্তিতে বিরোধী দল শান্ত হয় না। তাঁরা অটপসীর রিপোর্ট দাবি করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জনস্বার্থের খাতিরে গভর্নমেন্ট তা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফলে সভাকক্ষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল, যখন একজন স্বতন্ত্র সদস্য অভিযোগ করল যে, শিশুর মৃত্যুর পরে তার মা বিদ্যাবাসিনীও অভাবের তাড়নায় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। বিরোধী পক্ষের 'শেম' 'শেম' ধিক্কার ধ্বনিতে মন্ত্রীর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

গভর্নমেন্টের সমর্থকেরা সংখ্যায় ভারি। তাঁরাও তারস্বরে পাল্টা অভিযোগ করতে লাগলেন—এক্কেবারে বাজে কথা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিছক চালবাজি,—পলিটিক্যাল স্টান্ট।

স্পীকার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় বৃথাই টেবিলে ঘন ঘন হাতুড়ির শব্দ করলেন—অর্ডার, অর্ডার।

কোথায় অর্ডার? ডিসঅর্ডারের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দুই পক্ষে প্রবল বাদবিতণ্ডা, সক্রুদ্ধ চীৎকার ও সবেগ মুষ্টি আস্ফালনের মধ্যে বিরোধী পক্ষ এক যোগে ওয়াক-আউট করলেন।

ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ নয়। মনুমেন্টের তলায় বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের খাদ্যাভাবের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় গভর্নমেন্টকে বিস্তর গালাগাল দিলেন এবং অপিস আদালত মুখে এসেম্বলীর দিকে বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা দ্বারা ট্রাম-বাসের রাস্তা আটক করলেন। "অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও" ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হতে লাগল।

তারপরের অধ্যায় অতি পরিচিত পুরাতন প্যাটার্নেরই পুনরাবৃত্তি। পুলিস কর্তৃক শোভাযাত্রায় বাধাদান, ইষ্টক বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ, রক্তপাত, এ্যাম্বুল্যান্স ও হাসপাতাল। পরের দিন হরতাল, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ, পাইকারী গ্রেপ্তার এবং গুলিবর্ষণ।

মাত্র মাস দেড়েক আগেকার ঘটনা। তাছাড়া ঐ দস্তখতে নিজেরও কিছুটা অংশ ছিল। একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথেষ্ট অগ্নি উদ্গিরণ করেছিলেন। সুতরাং আনুপূর্বিক সমস্তই স্মরণে ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে এই অর্ধউন্মাদ নারীর সম্পর্ক কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, "সম্পর্ক খুবই নিকট। এ মেয়েটিই বিদ্যাবাসিনী।"

"সে কি? বিদ্যাবাসিনী তবে মরেনি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "না। তার ছেলের অনাহারে মৃত্যুর কথাটাও সত্যি নয়।"

"তার ছেলেও বেঁচে আছে?"

অনুরূপ সহজভাবেই সুধীরবাবু বললেন, "না, ছেলে বেঁচে নেই।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেম, "মাফ করবেন মশাই। আমি সহজ বুদ্ধির মানুষ। হেঁয়ালির ধার ধারিনে। বিদ্যাবাসিনীর ছেলে মরেনি, আবার বেঁচেও নেই—এ ধরণের ধাঁধায় আমি অভ্যস্ত নই। সোজা বাংলায় যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন, শুনতে রাজী আছি। নইলে রেহাই দিন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রতিভভাবে বললেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন—মানে, আমিই গুছিয়ে বলতে পারিনি। কথাটা হচ্ছে যে, তার ছেলে অনাহারে মরেনি। কোনো অসুখ-বিসুখেও নয়।

আসল উপাদান? খালি বাড়িতে বাইরের লোক ঢুকেছিল, তবে কুকক্ষেত্র বাধবে না? তাছাড়া দু'খানি শাড়িতেই, এ খবর যদি একবার সিঁদুরে কানে পৌঁছয়, তবে কুরুক্ষেত্র বাধবে না? তাছাড়া সিঁদকাঠি খারাপ। কে কোথা থেকে কখন খবরের কাগজে একখানা উড়ো চিঠি ছেড়ে বসবে তার ঠিকানা আছে কি? লজ্জায় তখন কাউকে কি আর মুখ দেখানো চলবে? চাই কি, চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়বে। ভদ্রলোক অত্যন্ত কাতর চক্ষে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁর জন্য সত্যিকার করুণা বোধ করলেম। আশ্বাস দিলেম—আমাদের কাগজে সে চিঠি ছাপা হবে না। বললেম, "ঘাড় ধরে মেয়েটাকে সদর দরজার বাইরে পার করে দিন। নিজে না পারেন থানা থেকে পুলিস এনে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিস অফিসার; আপনার ভাবনা কিসের?"

সুধীরবাবু বিশেষ আশ্বস্ত হলেন এমন মনে হলো না। তাই লঘু-চপল কণ্ঠে বললেম, "ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা করেন না শুনেছি; আপনাদের পুলিসেও কি সে-রকম রেয়াজ?"

সুধীরবাবু সে পরিহাসে যোগ না দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "কনস্টেবল অবশ্য হুকুম করলেই আসে। তারা এসে জোর করে মেয়েটাকে অনায়াসেই দূর করতেও পারে। দরকার হলে, কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি আমাদের চোখের সামনেই চলে। ও সব মাইল্ড করলে পুলিস ডিপার্টমেন্টে কাজ করা সম্ভব নয়। এ মেয়েটাকেও থানায় টেনে নিয়ে কয়েদ করে রাখতে পারতাম। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন? কেমন যেন জোর পাচ্ছিনে।"

"কেন বলুন তো? হঠাৎ তার উপরে মায়া বসে গেল না কি?" কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেম।

সুধীরবাবু জবাব দিলেন, "ঠিক মায়া নয়। বোধ হয় সঙ্কোচ, মানে—একটা যেন হেলপলেসনেস।"

ক্ষণেক নীরবতার পরে প্রায় অর্ধস্বগতভাবে বললেন, "চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস-নিয়ে আমাদের কারবার। সংসারে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই-ই যে কত অধম, কত পাষণ্ড হতে পারে তার দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাই। সুতরাং মানুষের কোনো অপরাধেই আমরা চমকে উঠিনে। কিন্তু এ মেয়েটা নিজে থেকেই যে স্বীকারোক্তি করেছে, তা যদি সত্যি হয় তবে সে মনুষ্য সমাজের বাইরে। অথচ তাকে কোনো মতেই স্বভাব-পাগী, মানে আমাদের পুলিসী ভাষায় যাকে বলে হ্যাবিচুয়্যালী ক্রিমিন্যাল, বলা যায় না।"

মনে মনে বিরক্ত হলেম। এ যে কেবলই ভণিতা করে চলেছে। আসল কথাটা কী?

কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে মনের ভাব সব সময়ে যথাযথ প্রকাশ করা চলে না। সভ্যতার অনেক ধেসারৎ আছে; তার মধ্যে এটাও একটা। তাই বিরক্তি গোপন করে যথাসাধ্য লঘু কণ্ঠেই বললেম, "এ তো হলো প্রস্তাবনা। এবার মূল পালাটা শুরু করুন। আমার নিজের অবশ্য আপিস বিকেলে, কোনো তাড়া নেই। কিন্তু আপনাকে যদি এখনো কাজে যেতে হয়, তবে বেলা বড় কম হয় নি।"

ইনস্পেক্টারবাবু লজ্জিত হলেন। বললেন, "ওঃ, তাই তো! ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলছি। আচ্ছা আপনি তো সাহিত্যিক। বলতে পারেন, ছেলেদী কথাটার কোনো বাংলা আছে কি?"

বললেম, "আছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা পরে হবে, আগে আপনার রহস্যময়ী মেয়ে লাহিনীটা শোনা যাক।"

তিনি মিনিট দুই চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপরে প্রশ্ন করলেন, "বিদ্যাবাসিনীর কথা মনে আছে আপনার?"

"কোন বিদ্যাবাসিনী? সেই যাকে উপলক্ষ করে শহরে ঘুনোঘুনি কাণ্ড হয়ে গেল? মনে আছে বৈ কি।"

ফুল একটি ফুলিঙ্গ থেকে যেমন সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি, সামান্য টি-এন-টি কণিকায় যেমন বিস্ফোরণ, সে ব্যাপারটার সূচনাও তেমনি অতি সাধারণ ঘটনায়।

একটি শিশুর মৃত্যুসংবাদ। এই অহিবাদিপ্রপীড়িত দেশের শত সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে নিত্য এমন কত শিশু মরে কে তার খোঁজ রাখে? কিন্তু এই বিশেষত্বহীন প্রাত্যহিক

আজ মেয়ে দেখানো।"

বিপিনের চাউনে তার কৃত্রিম গাম্ভীর্যটুকুই ছিনি নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "হাঁ মেয়ে দেখা নয়, আজিল।"

বিপিনের চোখ আর নেমে নেই।

"পাত্রপক্ষ কি কলা দেখে? কেমনী না কুল করল?" প্রশ্ন করলাম।

সুচিমন্থ সোমসুন্দর জবাব দিলেন না। বললেন, "ব্যাপারটা বিদ্যাবাগিনীর নিজের মুখ থেকেই শোনা। এ দুদিনে খণ্ড-খণ্ড ভাবে জেনেছি। ভূতলে যা ঘাঁচায়, তাই বলছি। মোদ্দা কথাটা শুনুন।"

বলিন চুপ করে থেকে ইসারা করলেন, "কেনী বকা মেয়েদের স্বভাব। দশ বলতে দোষ আবার আনেক সময় লাগবে, আপনারও ধৈর্য থাকবে না। তাই অসরকারী আশাশুলি কেটে ছোঁট সংক্ষিপ্ত সারটুকুই শুনবি।"

বিদ্যাবাগিনীর মা ইন্দিরার নিবেদ্যান ছিলেন। পুজা-মানত, তাগা-তাবিজ ও নানাবিধ তুকতাক করে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন বিদ্যাবাগিনীর জন্ম। পরিবারে সহ আত্মীয়কের ও বহু বিলম্বিত শিশুদের আদরে পরিমেলী সাধারণতই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মেয়েটা আদের ভবিষ্যতের পক্ষে বিরকম নয়।

বিদ্যাবাগিনী তার মায়ের বাক্সের ধন, বাবার চক্ষের মণি। সে চোখের আড়াল হলে দুজনেই পাগলের প্রায় জল করেন। কে জানে, হয়তো এই সেহাধিক্যের কারণেই বিদ্যাবাগিনী ছোটবেলা থেকে জেদীপরায়ণ। তখন তার মুখ আলো করে কথা ফোটেনি, তখনই সে চটা ফেলে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ত, পায়ের জামা বা মায়ের শাঁড়ির নীচে কাটত। তার চূড়ান্ত ধৃষ্টতা করে বলেছে, "এক চৌটা মেয়ের জেদ মেনে করে মরি। বড় হলে এ মেয়ে দেখীটোপুরানী না হয়ে যায় না।"

মায়ের চাইতে বাপের প্রতি বিদ্যাবাগিনীর টানটা ছিল বেশী। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিন কথা বন্ধ থাকে।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, পিতৃজনের উপর আপন অথবা অধিকার স্থাপনের প্রয়াস নারী-চরিত্রের শিক্ষণ বৈশিষ্ট্য। শৈশবেই বিদ্যাবাগিনী বাপের উপরে নিজের দখল সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। প্রতিযোগিতার খেলা পুকুরের কাউকে তিনি কখনও জেতে দেবেন না একটু আদর কবরেন এমন সত্য ছিল না। এমন কি, তার মা স্বামীর সঙ্গে একান্তে হাসি গল্প করলেও তার মুখ ভার ও চোখ ছলছল হতো।

স্কুর বালিকার এই প্রবল ঈর্ষাকাতরতা আত্মীয় পরিজনের কাছে কৌতুকের বিষয় ছিল। তার যা অনেক সময় জেহের ছলে করে মেয়েকে বলেছেন, "হিংসুটী মেয়ের কতখানা দেখ একবার। বাপি, ও বাপ-সোহাগী, তোমার বাবার উপর আমারও কিছুটা দাবি আছে যে। সে খবর রাখ কি?"

স্কুলে বিদ্যাবাগিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল শান্তী। সে বিদ্যাবাগিনীর হোমটাস্কের অঙ্ক করে দেয়, সেলাই-এর পরীক্ষার জন্য রুমালে ফুল তুলে রাখে। বিদ্যাবাগিনীও আত্মত্যাগের অর্থের বা নাজেল-বাক্সির ভাগ শান্তীকে না দিয়ে খায় না। তারা এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলে, এক সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলের পেছে বাড়ি ফিরে আসে। অপরিণতবয়স্ক দুই কিশোরীর এই গভীর বন্ধুত্বের পাত্রর বয়স্থা গৃহিণীরা ঈর্ষা করে তাদের নতুন নাম দিয়েছেন—গঙ্গা-যমুনা।

এই বিবিধ সহীহবের সুখ-স্বর্গে একদিন দুর্বিপাকের মতো দেখা দিল মানতী—বিদ্যাবাগিনীদের ক্লাসে শহর থেকে নবাগতা ছাত্রী। বয়সে সে বিদ্যাবাগিনীর চাইতে দুদিন বয়সের বড়ই হবে। তার নিজের রূপ ও বাবার অর্থ দুই-ই সাধারণের চাইতে বেশী। সে গল্প শুনিয়ে সহপাঠিনী সহপাঠীদের তাক লাগিয়ে দেয়। স্কুলের অন্য মেয়েরা তার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যস্ত। শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিরাও খুশি তাকে একটু বেশী খাতির করেন।

সে-দিন স্কুলে পৌঁছতে বিদ্যাবাগিনীর একটু দেরী হয়েছিল। ক্লাসে ঢুকতেই দেখল, মানতী পাশের পাশে বসে আছে। বিদ্যাবাগিনী দু খুশির করে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে বসেছ কেন?"

মানতী উত্তর করে জবাব দিল, "বসেছি আমার ইচ্ছে। তোমার তাতে কী?"

বিদ্যাবাগিনী হুঙ্কারে বলল, "এটা আমার সীট।"

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। শান্তীই ও বিদ্যাবাগিনী বরাবর একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। সে কথা ক্লাসের সবাই জানে। কিন্তু কথোপকথন সেখানে থামে না। শুরু হয়েছিল ঝগড়া, তারপরে ঠিককালী এ বসন্ত নারুন করে যায়। শুধু প্রতিনিধিত্বে নয়—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও মানতী বিদ্যাবাগিনীর সর্বজনীকৃত দাবি মেনে নিতে চাইল না। "তোমার সীট আমি মানি না। আমি লেখা আছে তোমার? টানা দিয়ে লিখে রেখেছ বুঝি?" ক্ষেত্রের প্রশ্ন করল সে।

না, ঘরানার মতো নাম লেখা বা আকারেই সে ক্লাসে কারও আসনটিকে অন্য কোনী বলতে পারে, সে কথা বিদ্যাবাগিনী কখনও ভাবেনি, এমন অর্থ ছাড়া তার বা কারও কোনো বিশিষ্ট অধিকার আছে বিনা সে সম্পর্কে তার মনে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন জাগেনি।

সে মানতীর কথার জবাব না দিয়ে আপনার মনে বলল, "একদম বেঞ্চে উঠে বস শান্তী, এইদিকে আরো হবে এ।"

"ইস, বড়দম শোনো মেয়ের! উঠের না তো, কেমি, কী করতে পার?" মুখভার ভঙ্গিতে বলল মানতী।

প্রথমে বিদ্যাবাগিনী টান মেরে মানতীর বই পত্র ফেলে দিল।

মানতী সহজে হটবার পাত্রী নয়। সে তৎক্ষণাৎ টান করে বিদ্যাবাগিনীর পাশে এক চড় বসিয়ে দিল।

বিদ্যাবাগিনীর হাসন আর স্কুল-কাল তার ধীরন নয়। সে মানতীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমুদয়ে পরাজয় দিয়ে ক্রেডেমিক্টুস বাঁধিয়েছিল। অন্য মেয়েরা প্রীতিমেটির ক্লাসে ঢুকে তিনি মুহূর্তের দুই পক্ষকে থামিয়ে দিলেন। বিদ্যাবাগিনী আরো অপমানিত বোধ। নিজের ঘর পাঁচ হাত বড়ুম দিলেন বিদ্যাবাগিনী জন্য বেঞ্চিতে বসতে। মানতী সর্বপ্রথম শান্তীর পাশে বিদ্যাবাগিনীর একদিনের অনিচ্ছাকৃতির আসন উত্তরাধিকার অধিকারে মতো সগর্বে বিরাজ করতে লাগল।

তখন বিদ্যাবাগিনীর সমস্ত রাগটা পড়ল শান্তীর উপরে। মানতীকে সে তার পাশে বসতে দিল কেন? কেন সে তাকে বাধা দিল না? একজনী না সে দুই বুড়ুটি ঠাকিয়ে তার এক দিকে বসে আছে কোন লজ্জায়? সে উঠে হাত আসতে পারে না বিদ্যাবাগিনীর পাশে। হাতে কি কোঁ পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছে?

ছুটির শেষে বিদ্যাবাগিনী শান্তীর দিকে না তাকিয়ে চার চক্ষে হাতে টেনী একা বাড়ি চলে এল। অনেকদিনের মতো বিকেলে শান্তী যখন তাকে খেলতে ডাকতে এল, বিদ্যাবাগিনী তখন মুখ ফিরিয়ে রইল। শান্তীর অনেক সাধ-সাধনা কুকুরে তার প্রসন্নতা লাভ করতে পারল না।

রাত্রিতে বিদ্যানাথ শুনে বিদ্যাবাগিনীর রোষ বহু হয়ে গেল। কাকুতে যে সে অমন লাঞ্ছনা দিয়েছে, তার সমস্ত অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে, সে কথা স্মরণ করে বিদ্যাবাগিনীর মন খা খা করতে লাগল। তাঁহির কাজ না থাকলে বিদ্যাবাগিনী সেই শান্তে শান্তীর কাছে গিয়ে কথা মিটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত ছিল।

পরদিন সকালে বিদ্যাবাগিনী অনেক আগে স্কুলে গেল। তার নতুন বেঞ্চি বেঞ্চিতে বসে শান্তীর আসার আগ্রহে রইল।

ক্লাসের ঘণ্টা বাজবার তিনটি বাজেও তার আসে শান্তী এল। তার সঙ্গে কে? বিদ্যাবাগিনী চোখে ভুল দেখছে কি? না, ভুল দেখার তো কোনো। এ তো মানতী। তার দুজনে এক সঙ্গে এসেছে। শান্তী বেঞ্চেনিবিকে না তাকিয়ে তার নিজের পুরানো জায়গাতে বসে পড়ল। মানতী বসেছে। শান্তী বেঞ্চেনিবিকে না তাকিয়ে তার নিজের পুরানো জায়গাতে বসে পড়ল। মানতী বিদ্যাবাগিনীর প্রতি একটা কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শান্তীর চারা পাশের জায়গাটি দখল করল।

প্রকৃত ব্যথা এই যে, শান্তীকে বিদ্যাবাগিনীর মন দিয়ে পাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত ছিল না। সেদিন সে নিজে থেকেই বিদ্যাবাগিনীর পাশে গিয়ে বসেছে। এই সামান্য নিয়ে ঝগড়া ভুলে বসেছিল। কিন্তু মানতী যে বিদ্যাবাগিনীকে ডক কথার মাধ্যমে ভুলের সরকার তার জন্য তার মনে বাসে ছিল না। তার জন্য ছিল না। মানতী শান্তীকে চোখের ধরা আসনটার মাথা ছুঁয়ে যায় ক্লাসে

নয়ে এসে নিজের পাশে বসল।

পার্বতী মেয়েটি শান্ত নিরীহ ধরনের। প্রত্নতত্ত্বপরায়ণা বিন্ধ্যবাসিনীর বন্ধুত্বের অনেক অত্যাচার সে নির্বিবাদে মেনে নিত। কোনো বিষ্ণু অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না। সেদিক দিয়ে সে বিন্ধ্যবাসিনীর ঠিক বিপরীত। মালতীর জুলুমে বিব্রত হলেও তাকে অগ্রাহ্য করার মতো জোর পার্বতীর ছিল না। বিন্ধ্যবাসিনীর অসংকুচিত কথনা করে সে তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারত না। তাকে না দেখার ভান করে বিরসমুখে মালতীর পাশে বসে ক্লাসের পড়া শুনতে লাগল।

ক্লাসের অপর প্রান্তে বসে বিন্ধ্যবাসিনী মিষ্টন ক্রোদের দুঃসহ আবেগে নীড়িত হতে লাগল। পার্বতী যে নিজে ইচ্ছা করেই মালতীর পাশে বসেছে, সে বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় রইল না। মালতীর সঙ্গে তার কবেরই যে ঝগড়া, বিন্ধ্যবাসিনীকে তার কোনো প্রয়োজন নেই এ ভাবনায় তার বুকে টুঁই মুচড়ে ওঠল। গত রাত্রিতে পার্বতীকে নির্দোষ কল্পনা করে আজ যে এতক্ষণ তার জন্য সে ঔষীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে শুধু তার নিজের নির্বুদ্ধিতা। পার্বতীর জন্য বাগান থেকে অভিজাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সে গোলাবা সংগ্রহ করে এনেছিল। সেগুলি বরং তার পরম শত্রু অঙ্কের মাস্টারমীকে দিতে রাজী আছে। কিন্তু পার্বতীকে কদাচ নয়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে সে তার টিনের বাক্সটিতে সযত্নে সঞ্চিত পার্বতীর দেওয়া পুঁতির মালা, চুলের ক্লিপ, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি উপহার দূর করে ফেলে দিল। রাগে, দুঃখে ও অপমানে তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে নতুন সঙ্গিনী মালতীর সঙ্গে পার্বতীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পেতে পার্বতী আর তেমন উৎসুক নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর চোখতে পার্বতী ভয় করত। একবার রাগালে সে যে কোনো সমবয়স্কা মেয়েকে ধরে তার কপালটা দেওয়ালে ঠুকে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা পার্বতীর ছিল। কিন্তু এবার সে অবাক হয়ে দেখল, বিন্ধ্যবাসিনী ঝগড়া, মারামারি কিছুই করল না, শুধু কথা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে রইল। পার্বতী নিশ্চিন্ত হল। মালতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বে আর কোনো দ্বিধা রইল না। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। মালতীর দেওয়ার হাতটা দরাজ, দানের সামগ্রীগুলিও লোভনীয়। নানা রঙের লজেন্স ও নানা স্বাদের চকোলেটের কাছে সামান্য আমলকী ও কুলের আচারের আকর্ষণ কতদিন টিকতে পারে? বেচারী বিন্ধ্যবাসিনী।

শুধু কেক, বিস্কুট বা টফির প্রাচুর্যই নয়, মালতীর অন্য উপহারগুলিও যে-কোন সহপাঠিনীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে সক্ষম। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ করল, পার্বতী নতুন ধরনে চুল বেঁধে এসেছে। কেশশোর এ স্থাপানীর বার অনুকরণ তা বুঝতে বাকী থাকে না। স্কুলের অন্য মেয়েদের মা-মাসিরা জবাজবে তেল মাখা চুল কষে টেনে খোঁপা বেঁধে দেয়। নেহাতই যে শৌখিন, সে তারই উপরে বড় জোর একগাছা মোটা পিং-এর চিরুনি চড়ায়। মালতীর বকম আলাদা। সে খাড়ের কাছে রাঙিন ফিতা ফুলের আকারে গেরো দিয়ে চুলগুলিকে সাপের মতো পিছনে ঝুলিয়ে দেয়। তার নাম বুঝি "পনি-টেল"। আয়া ছিরি দেখে মরে যাই যেন! নির্লজ্জ পার্বতীটাও ঐ ঢং নকল করেছে দেখেই কালিন থেকে বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে গর্জাচ্ছিল। আজ তার উপরে চুলে জড়ানো নীল রিবনটা দেখামাত্র বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরে গেল। মাথায় খুন চাপল।

সে তড়িঘড়ো সেলাই-এর বাক্স টেনে কাঁচিটা বের করে পার্বতীর দিকে ছুটে গেল। পার্বতী ছেলের উপরে ঝাড় টেঁট করে খাতায় নোট লিখছিল। মুখ তুলে তাকাবার অবকাশমাত্র পেল না। বিন্ধ্যবাসিনী নিমেষে তার চুলের মধ্যে যত খাঁজ শক্তে কাঁচি চালিয়ে দিল। গুচ্ছ গুচ্ছ ঘন কালো চুলের রাশি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

পার্বতীর দীর্ঘ চুলের সৌন্দর্য তুলে ধিখাত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শেষে পার্বতী চুকরে উঠতে লাগল।

সামান্য একটা সিদ্ধের সঙ্গ বর্তন ফাঁসি কেন যে বিন্ধ্যবাসিনীকে এমন দুর্জয় ক্রোধে আত্মহারা করল, তার ব্যাখ্যা এজন্যে সাইকো-অ্যানালিস্টরাই জানেন। ইউনিয়ন জ্যাক যেমন ব্রিটিশ অধিকার ঘোষণা বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে এই চিরাচরিত কি তেমনি পার্বতীর উপরে মালতীর পরিপূর্ণ

মধ্যলের ইঙ্গিত বহন করেছে? কে জানে?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে কান ধরে স্কুল থেকে দূর করে দিলেন। অন্য মেয়েরা সবাই তাকে দুয়ো দিল। বাড়িতেও তার দণ্ড বিধান কম হলে না। কিন্তু অপলাজিতকে বিষ্ণুমাত্র অনুতপ্ত গঞ্জনা অনায়াসে অগ্রাহ্য করল। পার্বতীর মাথাটা প্রায় বেশপুনা হয়ে গেছে। একমাস, দুমাস, একথা কল্পনা করে বিন্ধ্যবাসিনী গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বিয়ের পর বিন্ধ্যবাসিনী যখন স্বামীর ঘর করতে এল, তখন সে তৌবনে পরিপূর্ণ যৌবনী। সে যৌবন—আক্ষরিক এবং সাঙ্কেতিক উভয় অর্থে।

স্বামীর সেবা ঘরে তার ত্রুটি নেই। যখন যে জিনিসটি চাই হাতের কাছে আগে ভাগে এগিয়ে রাখে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থসচ্ছলতা পরিমিত। কিন্তু নিপুণ গৃহিনীপনায় বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি থাকতে দেয় না। প্রীতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে ছোট-খাটো অভাবের ফাঁকগুলিকে সুধায় ভরে দেয়।

স্বামী গোকুল মিশুক প্রকৃতির লোক। গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে। সবার ঘরেই তার সমান সমাদর। আশ্চর্য এই যে, স্বামীর লোকপ্রিয়তায় বিন্ধ্যবাসিনী খুশি হয় না। কারণ কে বলা যেতে পারে, গোকুল শুধু স্ত্রীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে এক চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, পাইকারী হৃদ্যতার ভিড়ে অন্তত অংশে লক্ষ কোটি তারকার মতো প্রতিয়ে যাবে না,—বিন্ধ্যবাসিনীর এই অভিলাষ। গদার জায়ায় ফলাও দাঁড়াল এই যে, বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ঘরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই গোকুলের শাওয়ায় বহুদিনের পুরানো দৈনন্দিন তাসের আড্ডাটি উঠে গেল। সমবয়সী বন্ধুদের কাছে মনসা-সরস্বতীতে—নৌকোবাইচে, কথা শিবরাত্রিতে গাজনের মেলায় গোকুলের সঙ্গ ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠল।

সেবার বারোয়ারীতলায় গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের আয়োজন করল। তাতে গোকুল অভিমন্যু সাজল। তাকে সবাই ধন্য ধন্য করল। শুধু বিন্ধ্যবাসিনী নীরব রইল। উজ্জ্বল কে দেখেছে তা সে জানে না। কিন্তু ও যে নারী সুরে 'নাথ' 'নাথ' বলে গোকুলের গায়ে ঢলে পড়ছে সেটা তার কাছে অতিরিক্ত বেহায়াপনা মনে হল। গোকুলেরই বা এত আদিখ্যেতা কেন? এ্যাক্টো করছ, করা। তা বলে অত 'প্রাণেশ্বরী' বলে ঢোলবার কী দরকার সে বাপু?

বিন্ধ্যবাসিনী নির্বোধ নয়। সখের দলে ব্যাটাছেলেরাই পরচুল মাথায় পরে মেয়ের অভিনয় করে, সে কথা সে জানে। অথচ স্বামীর পাশে গোঁফ-দাঁড়ি কামানো মুখে ঘড়িমাখা উজবুকে দেখলেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন বিরস হয়। স্বামীর থিয়েটার করায় সে আপত্তি করতে লাগল।

প্রথম অভিনয়ে প্রচুর হাততালির স্বাদ পেয়ে গোকুলের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নাটকে নায়কের পার্ট করার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কিন্তু রিহার্সালে যাওয়ার সময়ঘাটে বিন্ধ্যবাসিনী মাথাব্যথার ভান করে এমন কাণ্ডাকাটি শুরু করে যে, গোকুল বেচারী আর বাড়ির বাইরে যেতে ভরসা পায় না।

গোকুল মানুষটা শান্তিপ্রিয়। ভাড়া বিবাদকে সে অত্যন্ত ভয় করে। তাই খুশিটিকে সে ধীরে ধীরে খেলাধূলা, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর নিশ্ছিদ্র একাধিপত্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। বিন্ধ্যবাসিনীর বশুর দুই সুখেই কাঁদল।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সংসারে কিছুই একটানা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সবই চাকার মতো ঘুরছে।

সুখানি চ, দুঃখানি চ। বিন্ধ্যবাসিনী তা জানত কি?

অল্প বয়সেই গোকুলের একমাত্র ছোটবোন সুভদ্রার স্বামী মারা গেল। দুখিনী বালবী মেয়েটাকে সুভদ্রার শ্বশুরা ও টাকাকড়ি তেকে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। নিরুপায় বিধবা ভাই-এর সংসারে ফিরে এল।

সুভদ্রা বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে বছরে অনেক ছোট। অবশ্য ঠীক-ঠকানা, ভাই-এর সংসারে হয়েছে বলে তার কুমারী সীমা নেই। সংসারের সমস্ত কাজের বোঝা সে মাথায় তুলে নিল। রান্না

কল, ঘর নিকানো, গোপাল কাজ, মাঘ গোয়ালে গরুকে জাবনা দেওয়া, ক্ষেতের শাক ক্ষেড়ে মেলে মাইতে বোলা সবই নিজে করে। বিদ্ধ্যবাসিনীকে কুটোটি নাড়তে দেয় না। এমন মেয়েকে ভালো না বেসে পারা যায় না। বিদ্ধ্যবাসিনীর মনে সত্যিকার করুণা হয়। আহা, দুঃখিনীর আর কোথাও ঠাঁই নেই। একবেলা দুমুঠো ভাতে ডাল দেওয়া বইতো নয়।

গোকুল শ্বশুরবাড়ই যেতেছিল। বোনকে সে ব্যাপারই ভালোবাসত। তার দুর্ভাগ্যে তার প্রতি স্নেহটা অবশ্য বেড়েছে। সে তার জন্য মাঝে মাঝে একটু দই, পাটালি বা তিলের বরফি কিনে আনে। কখন কী খেলে তার পেট্রোল খবর নেয়।

বিদ্ধ্যবাসিনীর কাছে সেটা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মনে হয়। ভাবখানা দেখ একবার। সে যেন গোকুলের বোনকে নাখাইয়ে রেখেছে। বাস্তবিক বিদ্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট যত্ন নেয়। তাহিতে বিধবার ভাত খেতে নেই। বাগানের কলাটা, শশাটা বিদ্ধ্যবাসিনী তারই জন্যে তুলে রাখে। একাদশীর দিনে নিজের দুধটুকু জোর করেই সুভদ্রার বাটিতে ঢেলে দেয়। কচি মেয়েটা নির্জলা উপোস দিতে পারে কি?

বৌটাকে সুভদ্রা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখনও সে তাকে আদর করে। স্নেহের স্বরে বলে, "ও সুবি, দুঃখু মনে একটু জিরিয়ে নে দিকিনি। মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোকে এখন ঐ চাকি-বেলুন নিয়ে পড়তে হবে না। ওটি কি খানা আমি নিয়েই করে নেবো'খন।"

আবার তার পরমুহূর্তেই গোকুল যদি তাকে ডেকে দুটো কথা বলেছে তো অমনি বিদ্ধ্যবাসিনীর অন্য মূর্তি। মুখ ভার করে তিক্তস্বরে বলে, "বসে বসে ভাই-এর সোহাগ কুড়োনো হচ্ছে। ওদিকে উনুনে মুখ উবুলে পড়ে যাচ্ছে, তার হঁস নেই।" সুভদ্রা অমনি আগেই দুধের কড়া নামিয়ে সরা চাকা দিয়ে তুলে রেখেছিল। সেটা কখন আবার কী করে যে উনুনে উবুল তেবে পায় না।

তবে এটুকু বুঝতে বাকী থাকে না যে, দাদার কাছে বেশী ঘেঁষাটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। গোকুল ডাকলেও এখন সে কাজের ছুতো করে তাকে এড়িয়ে চলে।

স্ত্রীর আচরণ গোকুলের কাছেও হতবুদ্ধিকর। বিদ্ধ্যবাসিনী দয়াময়ীহীন নয়। গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্রের অনেককেই সে সাধ্যমত সাহায্য করে, সে তো গোকুল নিজের চোখেই দেখেছে। অনাথা ননদিনীর প্রতি তার বিরূপতার গোকুল কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

একই সঙ্গে শ্যাম এবং কুল বজায় রাখা কঠিন কাজ, সেকথা গোকুল শুনেছে। বউ ও বোনকে একই বাড়িতে রাখা তার কাছে কঠিনতর মনে হল। অবশেষে বোনকে আবার তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসাই স্থির করল।

সেদিন সকালেই তাকে কেন্দ্র করে স্বামীস্ত্রীতে এক পালা কথা কাটা-কাটি হয়েছিল। তাই যাওয়ার আগে সুভদ্রা যখন বৌঠানকে প্রণাম করতে গেল, বিদ্ধ্যবাসিনী মুখ গম্ভীর করে রইল। কিন্তু সে যখন তার শাড়ি দু'খানা, জল-খাওয়ার পাথরের ঘোট ঘটিটি, একখানা রাধাকৃষ্ণের পট ও অনুরূপ দু'একটা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির সামান্য পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে গেল, বিদ্ধ্যবাসিনীর বুকে ব্যথা বাজল।

বিদ্ধ্যবাসিনী সুভদ্রাকে একটি ঠেঙে টিনের বাক্স দিয়েছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরটিতে গিয়ে দেখল সেটি কুলুঙ্গির উপরে ঠিক তেমনি রয়েছে। বিদ্ধ্যবাসিনী বাক্সের তালাটি তুলে দেখল, গুটি দুই সুতী জামা, কাচের ফ্রেমে আঁটা ছোট একটি আরসি, একটি পশমের জীর্ণ আলোয়ান এবং একটি ছোট কৌটায় কয়েক আনা ও পয়সা মিলিয়ে দু'টাকার কাছাকাছি অর্থ পড়ে আছে। জিনিসগুলি বিদ্ধ্যবাসিনীরই নানা সময়ের দান। সুভদ্রা কিছুই নিয়ে যায়নি, ফেলে রেখে গেছে।

বিদ্ধ্যবাসিনীর অশ্রু আর বাধা মানল না। অকারণ বৈরিতায় যে নিরাশ্রয় বিধবাকে সে এ-বাড়িতে ঠিকতে দেয়নি তারই বিচ্ছেদ বেদনায় মেজেতে বসে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আগুনের মতো অসুবিধাজনক খবরগুলিও কিছুতেই চাপা থাকে না। শারদীয় পূ..া আসর। বিদ্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার জন্য একজোড়া থান, বিশ্বটা আখের গুড়, নিজের খাদ্যের গুটি কয়েক পেঁপে ও পাঁচটি টাকা গুছিয়ে রেখেছিল। দক্ষতের বাড়ির একটি ছেলের হাতে পাঠাবে। সেখানেই কথাটা শুনে এল। সুভদ্রার হৃদয়হীন দেওরেরা কেন যে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে আবার বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হয়েছে সে উদারতার রহস্য এতদিনে উদ্ঘাটিত হ'ল। স্ত্রীকে লুকিয়ে গোকুল তাদের হাতে

নগদ একশ টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে।

গোকুল গোড়াতে প্রতিবাদ করল। শোনার কথা, একশ নয়। নেহাৎ। অবশ্য, টাকাটা সুভদ্রার স্বামীর। মৃত্যুর আগে গোকুলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

জগতে স্বামী মাত্রেই জানেন যে, স্ত্রীর কাছে সময় বিশেষে দু একটা মিথ্যা কথা না বলে সংসারে বাস করা দুষ্কর। কিন্তু কথা পড়লে যে স্ত্রীর কাছে সত্য কথা বলা যায় না, এ-কথার উপলব্ধি অনেকের নেই। গোকুল যে মহাজনের কাছে জমি জমা বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল সে খবরটুকু বিদ্ধ্যবাসিনীর অগোচর ছিল না। সে দুঃখের মূল বর্ণনা করে স্বামীকে নিরাশাকুল করে তুলল না।

গোকুলের মনে অনেক দিনের বিদ্বেষও জমা ছিল। নদীর মতো সচিদুকূলে ধৈর্য একবার ভাঙলে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত। সে উচ্চ কণ্ঠে বলল, "আবার জমি আমি ছাড়া নিয়েছি। বেশ করেছি।"

স্বামীর এমন প্রকাশ্য বিদ্রোহে বিদ্ধ্যবাসিনীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাগে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। প্রায় চীৎকার করে বলল, "জমি তোমার? তুমি ইচ্ছেমতো চলবে মনের বাসনা? বেশ তো তোমার আদরের বোনকে নিয়ে এসে ঘর সংসার চালাও। আমি যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।"

গোকুলেরও মাথার রক্ত চড়ে গেল। সে অত্যন্ত বেশী চঁচিয়ে বলল, "তুমি যাবে কেন? আমিই চলে যাচ্ছি। এ অশান্তির পুরীতে আর এক মুহূর্ত নয়।" পরিত্র আলনায় হাতের কাছে যে জামাটা ঝুলছিল তাই টেনে নিয়ে গোকুল কাচের বোধ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিদ্ধ্যবাসিনী ভেবেছিল, স্বামী বড় জোর দু'তিন দিন কষ্টমাস্তবের বাড়ি কাটিয়ে রাগ পড়লে আপনি ঘরে ফিরে আসবে। দিনের পর মাস কেটে গেল। মাসের পর বছর। গোকুল ফিরল না। কেউ বলল, সে অঘোর অধিকারীর যাত্রাদলে নলরাজার পার্ট করছে। কেউ বলল, সে শহরের চাটকলে দিন মজুরী খাটছে। কেউবা বলল, সে বাগুপ্রস্থে হাটে মুণ-মুসুরের কিস্তি নিয়ে যাচ্ছিল, নৌকাডুবিতে মারা গেছে।

স্বামী-বিরহিতা বিদ্ধ্যবাসিনীরও দিন কাটে। সহায়ীন, সম্বিহীন জীবন যখন দুর্বিষহ মনে হয়, একমাত্র শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে সে অশ্রু মোচন করে।

পৃথিবীতে শোকের যদি বা শেষ আছে, দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বর্ষার শেষে গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল। বিদ্ধ্যবাসিনীও শয্যা নিল।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে বিদ্ধ্যবাসিনী দেখল, সুভদ্রা, মেঠো হাতে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। সে বিদ্ধ্যবাসিনীর অসুখের খবর পেয়েছিল কিংবা শ্বশুরবাড়ি অসহ্য হওয়াতে পালিয়ে এসেছে তা সে-ই জানে।

বিদ্ধ্যবাসিনী সজল চক্ষে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার অসহায়ের ভয়েই সুভদ্রাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল, সে অনুশোচনায় বিদ্ধ্যবাসিনীর হৃদয় ভারাক্রান্ত। তার জন্যই তাই নিরুদ্দেশ এ ভাবনায় সুভদ্রার মন অপরাধী। অশ্রুস্রোতের মধ্য দিয়ে দুই অনুতপ্তা নারীর পুনর্মিলন ঘটল।

সুভদ্রা ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়, সাবু জাল দিয়ে পথ্য তৈরী করে, তার কোলে বিদ্ধ্যবাসিনীর শিয়রে বসে হাওয়া করে বা সোরাই-এর ঠাণ্ডা জল ন্যাকড়া ভিজিয়ে ঘুরুরও কপাল মুছে দেয়।

মায়ের চেয়ে ছেলের পরিচর্যাটা মর্মন্তদের। দুস্থ শিশুর আকুল আর্তনাদ। তাকে সুলভেই সুভদ্রার দিনের বেশীর ভাগ সময়টা কেটে যায়।

দুর্ভাগ্যরা চিরকালই দীর্ঘজীবী। তা নইলে দুঃখ কষ্ট সইবে কে? হতভাগিনী বিদ্ধ্যবাসিনীও ছ' সাত মাস যমে মানুষে টানাটানির পর সেরে উঠল। সুভদ্রার শিশুও যার বিদ্ধ্যবাসিনী সারা রাত বলল, "খোকনকে আজ আমার বিদ্যানাই শুইয়ে দিস। ও যে তোকে বাড়াবার ঘুমুতে দেয় না।"

খোকনের সে-প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি দেখা গেল। সে তার ঝিনুকা ঘুমানো ছোট মাসীটি নেড়ে জানিয়ে দিল, "দিদির কাছে ঘুমুবো।"

শুনে বিদ্যাবাসিনী ও সুভদ্রা দু'জনেই হাসল।

হ্যাঁ, হাসিটা বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

মায়ের চাইতে মাসির ধরণটা চিরকালই হাসাকর। দেখা গেল পিসির প্রতি বেশী অনুরাগটাও গুরু-শাসনের পাকে অনুকূল নয়। বিদ্যাবাসিনীর পুত্রলাভ প্রাপ্ত। এতদিনে অসুখে নিজের শক্তি ছিল না, তাকে দূরে রাখতে হয়েছে। এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ছেলেকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতে ব্যাকুল হলো।

বিদ্যাবাসিনীর স্নেহ অধিক, ধৈর্য পরিমিত। সুভদ্রা শিশুর সমস্ত দৌরাত্ম্য হাসিমুখে সহ্য করে। আশ্চর্য নয় যে, মায়ের চাইতে পিসির সঙ্গে তার ভাব বেশী। সেটা বিদ্যাবাসিনীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়।

বিদ্যাবাসিনী ছেলেকে খাওয়াতে বসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দু'গ্রাস গেলাতে পারল না। শিশু খাবার ছড়িয়ে, ফেলে একাকার করল। বিদ্যাবাসিনী ক্লান্ত হয়ে হার মানল। সুভদ্রা এসে কাক দেখিয়ে, চিল দেখিয়ে, টুনটুনির গল্প বলে অনায়াসে খাইয়ে দিল। বিদ্যাবাসিনী ছেলেকে স্নান করাতে গেলে সে ছুটী পালায়, ঘুম পাড়াতে গেলে ধস্তিপনা শুরু করে। সুভদ্রার হাতে সেগুলি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হয়।

দিনে দিনে বিদ্যাবাসিনীর মন তিক্ততায় ছেয়ে যায়। সুভদ্রা দেখে, বিদ্যাবাসিনী আজকাল অকারণে রেগে যায়, অনর্থক বকুনি দেয়, থামথা গুম হয়ে বসে থাকে। বৌঠানের এ চেহারার সঙ্গে অতীতের তার নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপতে থাকে।

শঙ্কাটা উভয়তঃ। বিদ্যাবাসিনীর মনে পড়ল, সুভদ্রাই তার জীবনের দুষ্টগ্রহ, ভাগ্যাকাশে শনি। সে যতদিন আসেনি গোকুলের সঙ্গে বিদ্যাবাসিনীর বিরোধ ছিল না। তারই জন্য সে স্বামী খুইয়েছে। তার কাছে কি বিদ্যাবাসিনীর শেষ অবলম্বন ছেলেকেও হারাতে হবে? ভাবতেই বিদ্যাবাসিনী শিউরে উঠল।

পুবানে শচির পাড় থেকে সুতো খুলে খুলে সুভদ্রা নিজের ঘরে কাঁথা সেলাই করছিল। বিদ্যাবাসিনীর ছেলে পাশে বসে খেলছে। হঠাৎ তার কী খেয়াল হল। বাবনা ধরল বেড়াতে যাবে। শিশুকে ভোলাতে তার কথায় সায় দিতে হয়। সুভদ্রা বলল, "যাবে বৈ কি। মা এখন ঘুমুচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলে আমরা সবাই বেড়াতে যাব। খোকন যাবে, মা যাবে, আমি যাব।"

খোকন বাধা দিয়ে বলল, "না মা যাবে না।"

সুভদ্রা বলল, "মা না গেলে, খোকনকে কোলে নেবে কে?"

সে-টা খোকনের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। সে প্রশ্নের জবাবও তাকে ভাবতে হয় না। সে নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল, "তুমি কোলে নেবে।"

সুভদ্রা বলল, "বেশ, আমিই খোকনকে কোলে নেব। কিন্তু মাকে সঙ্গে না নিলে মা কাঁদবে যে।"

জননীর জন্মন সম্ভাবনায় শিশুপুত্রকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। সে তার পূর্ব সংকল্পে অটল রইল। বলল, "না, মা যাবে না। মা আমাকে মেরেছে।"

কথাটা অবিশ্বাস্য। সকাল বেলা সে মায়ের ওষুধের শিশীটা নিয়ে খেলা করছিল। মা দেখতে পেয়ে তা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল মাত্র। শিশুর মন থেকে সে ক্ষোভ দূর হয়নি।

সুভদ্রা বলল, "ওমা, তাই নাকি। তবে তো মাকে কিছুতেই সঙ্গে নেওয়া হবে না। মাকে খুব বকে দিতে হবে। মা বড্ড মন্দ, বড্ড দুষ্টু।"

বিদ্যাবাসিনী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনছিল। শেষ কথাটা কানে যেতেই একেবারে যেন ক্ষেপে গেল। মা মন্দ, মা দুষ্টু! এ সব জপিয়েই যে সুভদ্রা ছেলেকে তার কাছে পর করে দিচ্ছে সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রইল না। সুভদ্রার সেবা, যত্ন, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমস্তই একটা বিরাট ছলনা মনে হল। বিদ্যাবাসিনীর ছেলের উপরেই সুভদ্রার লোভ। তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্যই মায়াবিনী তার দেহের মায়াজাল পেতেছে। নইলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে আবার এখানে আসবে কেন? বিদ্যাবাসিনী বোঝা, তাই এতদিন বুঝতে পারেনি। সে প্রতিজ্ঞা করল, রাক্ষসীকে আর এক দণ্ড এখানে থাকতে দেওয়া নয়।

হতচকিত সুভদ্রা বুঝতে পারল না, কোথায় কখন তার কী অপরাধ ঘটেছে। সে কাঁদতে লাগল। মেয়েদের চোখে জল দেখলে পুরুষের হৃদয় গলে যায়। ঈশানেরও মন আরও শক্ত হতে না দিয়ে সে থামল না।

আপদ গেল। কিন্তু বিপদ কাটল না। মুখরিকল বাধাল বিদ্যাবাসিনীর ছেলে। বিশু বা পুবও সে এতটুকু বুঝতে পারল যে, মা পিসিকে বকেছে। সে মুখিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। শান্ত বিদ্যাবাসিনী অসুস্থ শিশুকেই ঘুম পাড়ানোর উদ্যোগ করল। বিছানায় শুয়ে ছেলে পিসির কাছে বায়নার জন্য কান্না শুরু দিল।

বিদ্যাবাসিনী তাকে কী উপায়ে শান্ত করতে ভেবে পায় না। কোল নিয়ে ঘুম পাড়ানির ছড়া শোনাল, বৈয়াম থেকে মিছরির খণ্ড হাতে দিল, কাচের ঘোড়া, টিনের ঝুনঝুনি যেখানে যত খেলনা ইত্যাদি স্তোক বাক্যেও ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলান গেল না।

বিদ্যাবাসিনীর শরীর দীর্ঘ অসুস্থতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেনি। মানসিক উত্তেজনা ও গ্লান অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবসানে দুর্বল দেহ আরও অসহ্য হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় চিত্ত প্রসন্ন ও মেজাজ টাঁগা রাখা সহজসাধ্য নয়। সে বিরক্ত হয়ে কড়া স্বরে বলল, "চুপ কর বলছি, নইলে মার খাবে।"

তোষণ এবং শাসন উভয় পন্থাই বিফল। ছেলের কান্না থামে না।

ধৈর্যচ্যুত বিদ্যাবাসিনী ছেলের পিঠে নিজের হাতের দু'এক ঘা বসিয়ে না দিয়ে থাকতে পারল না।

শিশু আরও উচ্চ স্বরে 'পিসি' 'পিসি' ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিদ্যাবাসিনীর দুই কানে কে যেন গরম লোহার শেরেক বেঁধাতে লাগল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শাসাল, "ফের পিসির নাম নিয়েছ কি মেরে খুন করব। চুপ, চুপ।" হাত দিয়ে সে ছেলের মুখ চেপে ধরল।

কাপড়ে। এটুকু শিশুর গায়ে যেন অসুরের জোর এসেছে। ক্ষীণকায়া বিদ্যাবাসিনী তাকে রুখে উঠতে পারল না। মায়ের হাতটা সজোরে ঠেলে দেলে দিয়ে সে চীৎকার করল,—পিসি।

বিদ্যাবাসিনীর তখন আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। "তবে রে, তোমার গায়ে বড় জোর বেড়েছে, দাঁড়াও তোমার পিসি ডাকা আমি বন্ধ করছি।" মাথার বালিশটা বিদ্যাবাসিনী ছেলের মুখে চাপা দিয়ে পাগলের মতো একটা লাগল, "ডাক, ডাক দেখি একবার চোর পিসিকে।"

শিশু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সবলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। বস্তাধস্তির ফলে বালিশটা এদিক ওদিক একটু সরে গেলেই ছেলের গোঁ গোঁ কান্নার শব্দ বিদ্যাবাসিনীর কানে আসে। দুর্বার ক্রোধে উন্মত্ত বিদ্যাবাসিনী আরও প্রাণপণ শক্তিতে চাপতে থাকে।

কতক্ষণ এ যুদ্ধ চলেছে? এক মিনিট? এক যুগ? বিদ্যাবাসিনী তা জানে না। সে শুধু স্মরণ করতে পারে ক্রমে অব্যাহত শিশুর প্রতিরোধের বেগ কমে এল। হাতপা ছোঁড়া শান্ত হয়ে গেল। বালিশের নীচে থেকে অবরুদ্ধ কান্নার ক্ষীণতম শব্দও শোনা গেল না। পাশী হতভাগা ছেলে কোথাকার। এতক্ষণে ঢিট হয়েছে। বিছানার পাশে বসে বিদ্যাবাসিনী হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনার ও পরিশ্রান্তিতে তার দেহ ঘেদসিক্ত ও তপ্ত তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়েছে।

হঠাৎ বিদ্যাবাসিনীর খেয়াল হল, ছেলের কোনো সাড়া শব্দ নেই তো। তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর থেকে বালিশ চাপাটা সরিয়ে দিল। শিশুর মেটি চোখ দুটি মুদিত। শরীর অসাড়। মুমূর্ষুর কি? বৈ, নিঃশ্বাস পড়ছে না তো। আতঙ্কে বিদ্যাবাসিনীর কুতী ওয়াস করে উঠল। নাক হাত দুটি তুলে নিজের গালের উপরে রাখল। হাত কিংবা গাল ঠিক বুঝতে পারল না। পায়ের তলায় হাত দিয়ে উষ্ণতা পরীক্ষা করল। নিশ্চিন্ত হল না। তার বুকের উপর কান পেতে শুনল। হৃৎস্পন্দনের আভাস মাত্র পেল না, কানে কাছে 'বোকন' 'বোকন' বলে বার বার ডাকে ডাকল। সাড়া পেল না। ক্ষুব্ধ নিষ্ফল নিরুপায় সেইটিকে দু'হাতে কাঁকুনি দিয়ে বুকি শিশুকে জাগাতে চেষ্টা করল। তার পরে "ওরে মাণিক" বলে চেঁচিয়ে উঠে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বিশ্বাসঘাতকীর কথা জানা হল, তখন রাগী হয়েছিল। উঠেই কৃষ্ণপক্ষের আকাশ চরম্ভীন। নিঃশব্দ রজনীর বিভিন্ন বিশিষ্টতাগুলোর সমস্ত তাৎপর্য নিয়ন্ত্রণ। সেই সর্বাঙ্গসুন্দর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শুধু পাশ পুরুষটি বিশ্বাসঘাতকীর কথা শোনাতে নিশ্চুপ আর্তনাদে ধারালো ইস্পাতে পড়তে লাগল। পাতলা গোছ প্রতিযোগিতার অনাদর বিশ্বাসঘাতকীর চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শব্দহীন ভাবে চলতে চলতে নিজের সমাজটাই বুঝি নদীর ঘাটে নিয়ে পৌঁছল। সেখানে কৃত্রিমভাবে সেতা বিপুল প্রাচীন ঔতিহ্যের নানাস্তরের মূল আবহাওয়ার কিসের নির্দেশ? পরপারে অস্পষ্ট ওকালতীর রূপসা ছায়া-বহিত পূর্বদিগন্তী বিশ্বাসঘাতকীর তন কিসের ইঙ্গিত? সোহরওয়ার্দীর কালো কালো উপায় অন্ধকার ঝেকে আরাম ক্রমাগত আক্রান্ত?

রক্ত কয়ে একটা শব্দ হল। শান্ত নদীর নিষ্প্রাণ ঘাসে অগ্নিকের একটা আলোড়ন উঠে ঘীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

ঘাসের বিছানে বিশ্বাসঘাতকীর জাহিদীর ঐতিহাসিক ভালবাসকে সমাধি। কিন্তু পুলিশের গায়ে সাহিত্যিক সর্বকরার ঘাইরে ঘটনার কথা বেশী। অন্তরে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো তাহাকে উপস্থাপনের জোরার কাজের হয় জানে না। ইশাপাত্রীরাবন্ধু আরও তথ্য জোগ করতে লাগলেন। পুরুষোত্তম ঈশ্বরদাসের খেয়ে যেমন পরিশ্রমী, তিনপাড়া ঔতিহ্য তেমন পুলক।

যে মানুষ ছেলেবেলা মায়ের মতো দীর্ঘতর বেলা প্রহরে দীর্ঘতর এপার-ওপার করেছে, তার পক্ষে কয়েক ঘুরে আসবার কথা শক্ত নয়। ঘাসের নীচে নদ ঘাটের এসে বিশ্বাসঘাতকীর প্রত্নসম্পত্তি আশানি সাজ হয়। সেখানে উদাহ ভাসিয়ে যেলে। ছেলেদেরে মেয়েরা—"

কথা নিয়ে ভাসাল, "যাক, যে জোয়ার কী আর তাকে জল থেকে উদ্ধার করল, কী করে করে সে প্রায় থেকে পারে এল এসব প্রত্নত্ব খানা ভাবাতেই করার পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কোনো ঔতিহাসিক জোরে পক্ষেও যেন হয় মূলধান মালমসলা। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাই মনে।"

সুনিলবাবু খুব হাসল নিজ ভাবিয়ে। ঔতিহাসিকে কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্বাসঘাতকীর জন্মকাল—"

ঔত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভাসাল, "আমি লিখব কবি কি? কবি। তার এক বর্ণও বিশ্বাস করা হয় না।"

বৃদ্ধাদেরী বিশ্বকল চুপ করে রইল। সেই অভিজিৎ সীমারেখা তক করে বিশেষি আসার প্রশ্ন করলেন, "এখন আমার কী করা উচিত; বলুন তো।"

তা আমার বুদ্ধির অতীত। বলাবাহুল্য "আমরা সম্পাদকের সর্বিকালিনীকরণ। তবদর্শন থেকে ঔতিহাসিক এসে আমরা ভাবেই থেকে ঔতিহাসী অভিযাত্রক সব বিষয়েই আমরা অনাবশ্যে উপদেশ বা প্রস্তাবনী প্রতিদিনের দিতে পারি। কিন্তু ঔকার কার্যই, বিশ্বাসঘাতকীর সম্পর্কে কী করা উচিত তা জানিনে।"

অভয়ানন্দ হতাশ হাসল। ঔতের সমস্ত দায়ভা অর্থাৎ এগিয়ে দিয়ে যেলাম। মুখর দিয়ে হাত থেকে প্রশ্ন করলেন, "ওখানে আপনার কাজের কাজই যোগেরে কোন হয়?" ঔত কাছে উত্তরের ঠিক যোগল হাসল না।

আমার চোখের সামনে বিপুল চমকের মতো একটা ঢক ঔতিহাসে বাসনবেদিয়া জেগে ঔঠল,—"নিজেকে বিশ্বাসঘাতকীর চরকলাকের আত্মপ্রকাশ।" "সত্য পুলিশ অফিসারের পক্ষে প্রত্যাশিত অভিধান।" পাশে পাশে বিপুলকী চমকোরা সাইকেলে ঝলাঝলের ঘোরা নিয়ে ঔতকে ঔকারে ছুঁড়ে—"ঔতিহাসে বিশ্বাসঘাতকীর অন্ত নিলাপরে। জন্মমৃত্যুর পরিপ্রেক্ষে জন্মমৃত্যু—"

কিন্তু মন স্থির করতে সময় লাগল না। একটা চমকপ্রদ 'খুন' এবং শতঁহরার হাজার লাগল রাশি অভিজিৎ ঔতিহ্য নির্ণয়ের সুযোগ যেন্তারা ঔতিহাস করলাম। জানি, সম্পাদকীয় কর্তব্যের বিপুরি গাঁথা। সাধুলোক ঝাড়লোকের অন্তরে পরাজয় আসার আর মুখ দেখানো যায় না।

অনেক রাত অবধি ঘোরে দুম আসেনি, পাশেই লোকের ঘোরে নিয়ে শান্তনু আসার কুমিয়ে পড়েছিল। ওঠাল, মাথার কাছে নিজের একটা শব্দ ঘোরে, ঔঠল।

কেউ দরজা ঘেরেছে কি? এই তো মনে হচ্ছিল অন্ধকার কেউ দরজার নিজের আসে দেখ নিয়ে শুরু করেছে। সূর্য ঔঠরে এখনও দেরি, এত সকালে কে এল?

শান্তনুদের ফ্ল্যাটটি দক্ষিণ মেরের একটা গলির শিকলদারে। সামনে রেলিংঘেরা ছোট একফালি বারান্দা। তারই পাশে শোবার ঘর। শান্তনু দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনে রেলিংঘেরা ছোট একফালি জোৎস্না নেই তো। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ল সেতুর। ধূ, সেই ঔজ্জ্বল্য করা ঘনশ্যাম কাঠামোটা।

এরকমে বাংলাদেশী মোক্ষ হোল। সাইকেলের ঘরানার ঔপরে ভূমিকার পরিবর্ত মিলি অর্থ হাতের কাজ তিন-চার তলার সিঁড়ি বেয়ে প্রতিটি ঘরানাকে ঘরে যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাও নয়। চলন্ত সাইকেলে বেয়ে যেতে যেতে হাত ঔপরের ঘরানার ঔপরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাও দেখা। আজ সাঁঝে থেকে সাজানে বিশিষ্ট ধারাটা ঘরে ধরে ঘরানার ঔপরে হাত ধরে ঘরানার ঔপরে ঘরে ঘরানার ঔপরে ঘরে ঘরানার ঔপরে ঘ

যাযাবরের সাহিত্যকৃতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় আটতিরিশ বছরে (১৯৪৬-১৯৮৩) কুল্লে ছয়খানি বই লিখেছিলেন। এখনকার লেখকদের মতো অতিপ্রজ লেখক হবার বাসনা তাঁর আদৌ ছিল না। তাঁকে আমি কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁর বই পড়েছি গত পঞ্চাশ বছর ধরে। যখনই হাতের কাছে পেয়েছি, পড়েছি। এর প্রধান কারণ সুখপাঠ্যতা, শেষ কারণ সুখপাঠ্যতা। তাঁর প্রথম বই 'দৃষ্টিপাত' (১৯৪৭, জানুয়ারি/১৩৫৩ পৌষ) অবিশ্বাস্য পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেদিনের এই আশ্চর্য পাঠকপ্রিয়তার কারণ কী ছিল একথা আজ শান্ত চিত্তে ভেবে দেখলে স্বীকার করতে হয় ১৯৪২-৪৩-এর দিল্লি শহরের সর্বস্তরের মানুষ ও দিল্লির পুরনো তথা নতুন কালের ইতিহাস এত রম্যভাবে কখনও আর কোনও বইতে উপস্থাপিত হয়নি।

তিনটি আয়ুধ যাযাবরের হাতে সম্যক নৈপুণ্যে ব্যবহৃত হত—উইট, স্যাটায়ার, হিউমার। সেই সঙ্গে সব রচনারই পৃষ্ঠপটে ছিল বিষয় সম্পর্কে প্রভূত অধ্যয়ন। সঞ্চিত তথ্যের নিপুণ বিশ্লেষণ আর উপস্থাপনার কুশলতা। সতর্ক সজাগ অধ্যয়নশীল মনের মধ্যে মিশে ছিল সমবেদনা, সহমর্মিতা আর সহানুভূতি। তার ফলে যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের রচনা হয়ে উঠেছিল পদে পদে স্বাদু।

যাযাবরের অপর বৈশিষ্ট্য সাফল্যের পুনরাবৃত্তি না করা। প্রথম বই (দৃষ্টিপাত)-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সেই পথেই পরপর চার-পাঁচখানা বই লিখতে তাঁর ছিল না আগ্রহ। দৃষ্টিপাত বইটি দিল্লির সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে রম্যপত্রাবলির সংকলন (বেল্-লেতর্স্)। দ্বিতীয় বইটি উপন্যাস 'জনান্তিক' (১৯৫২)। ১৯৫০ সালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে 'দৃষ্টিপাত' দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে এবং লেখক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নরসিংহ দাস পুরস্কারে সম্মানিত হন। সুতরাং 'জনান্তিক' প্রকাশকালে তাঁর আসল নাম পাঠকসমাজ জেনে যায় এবং অনুধাবন করে 'দৃষ্টিপাত'-এর সূচনায় 'সংকলয়িতার নিবেদন' একটি কুশলী চাতুর্য। 'জনান্তিক' প্রকাশের পর লেখক উপন্যাস রচনা থেকেই সরে যান। তৃতীয় বই 'ঝিলম নদীর তীর' (১৯৫৫) প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় কিশোর পত্রিকা 'মৌচাক'-এ। কিন্তু এটি কিশোরপাঠ্য বই বলে সরিয়ে রাখা যায় না। এ বই সকল ভারতীয়ের পাঠ্য। কাশ্মীর নিয়ে যে

রাজনীতি ও হানাদারি আজও চলছে তার সূচনাকাহিনি এ বইটি। চতুর্থ বইটি প্রবন্ধসংকলন 'লঘুকরণ' (১৯৬৪)। এখানে পাই পদে পদে স্বাদুতা। যাযাবরের গল্প যেমন সুখপাঠ্য, প্রবন্ধও তেমন। এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ বই দুটি গল্পসংকলন 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ' (১৯৭৩), 'যখন বৃষ্টি নামল' (১৯৮৩)।

লেখকের প্রার্থনীয় সৌভাগ্য বিনয় মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন—তাঁর পাঠকপ্রিয়তা ঈর্ষাযোগ্য। 'যাযাবর অমনিবাস' (দে'জ) প্রথম প্রকাশিত ১৯৮৩ সালে, পরবর্তী ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০২ সালে। 'দৃষ্টিপাত'-এর বিক্রয় ঈর্ষাযোগ্য। তবু অবহেলে তা তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্জিত সাফল্যের পথ ছেড়ে অন্য পথে গিয়েছেন। আসলে, এই সাহিত্যচর্চা বিনয় মুখোপাধ্যায়ের গভীর জীবন-অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের সুচারু প্রকাশ। ঈর্ষণীয় সাফল্যে তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি, পাঠকের সাগ্রহ কৌতূহল নিবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছেন।

দুটি গুণের জন্য যাযাবরের রচনা সেদিন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজও করে। ধারবৎশক্তিসম্পন্ন ভাষা আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ।

প্রথম বই 'দৃষ্টিপাত'-এ তার উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য। উইট, হিউমার, স্যাটায়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্যারাডক্স, এপিগ্রাম, বেথজ, অক্সিমোরন, অ্যালিগোরেশন। তার ফলে তাঁর কিছু কিছু বাক্য প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কোনও গদ্যলেখকের পক্ষে এটা সামান্য কৃতিত্ব নয়।

'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।'

'সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা শহরটার সমস্ত পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়েট। বাবু পালাল পাড়া জুড়ালো, গিন্নি এল পাটে!'

'বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারান্টি তো নয়ই। সে শুধু মীনস, সে এন্ড নয়।...আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান জ্ঞান করবেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল প্রুফ নয়, যেমন নয় ইন্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।'

এই কটি উদাহরণই যথেষ্ট। এইসব বাক্য হয়ে উঠেছে প্রবাদপ্রতিম। এই হয়ে ওঠার পিছনে ক্রিয়াশীল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর কুশলী বাক্যনির্মাণ।

বস্তুত এই দুটি গুণেই সেদিন 'দৃষ্টিপাত' বাঙালি পাঠকের মনোহরণ করেছিল।

'দৃষ্টিপাত' বইটির সূচনায় আছে 'সংকলয়িতার নিবেদন'। এটা কেবল বিক্রয়ের জন্য চমকপ্রদ সূচনা নয়, এর পিছনে আছে সাবধানতা। বইটি যখন বের হয় তখনও ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেনি। লেখক ভারত সরকারের কর্মচারী, সূচনা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার। ইংরেজ জাত সম্পর্কে নয়, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে যেসব ক্ষুরধার মন্তব্য করেছেন সেগুলি রাজদ্রোহী মন্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারত। তাই প্রকাশকালে লেখক ও প্রকাশককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও স্বীকার্য,

'সংকলয়িতার নিবেদনের' অন্তরালে সক্রিয় কুশলী চাতুর্য, এবং আমার বিশ্বাস তা লেখকেরই রচনা। তা এখানে উদ্ধার করি।—

'এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক। ১৯৩৬ সালে একটি বাঙালী যুবক লন্ডনে ব্যারিস্টরি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লিতে পাঠান। লন্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত। দিল্লিতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতকগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে! এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে, হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।'

'দৃষ্টিপাত' পত্রাবলির সংকলন। 'খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। ১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে এবং ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দুটি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এ বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে।'

প্রকাশকের এই বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায় তখন ভারতে ব্রিটিশরাজের পূর্ণ প্রতাপ ছিল। বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দিল্লিতে আগমন ও প্রস্থানের উল্লেখ ও বিবরণ আছে। ক্রিপ্‌স্ দিল্লি এসেছিলেন ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ, চলে যান ১৯৪২ সালের ১২ এপ্রিল।

স্বাধীনতালাভের পূর্বেকার দিল্লিতে ক্রিপ্‌স ও ভাইসরয় বড়লাট লিনলিথগোর মধ্যে সম্পর্কটি মধুর ছিল না এবং বড়লাট তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যাযাবর ইঙ্গিত করেছেন ক্রিপসের দৌত্য অসফল। পরবর্তীকালে Transfer of Power, Volume I-এ তার বিশদ বিবরণ আছে। 'লর্ড লিনলিথগো ক্রীপ্‌স দৌত্যের সাফল্য কামনা করেননি।' (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। এই মন্তব্য অভ্রান্ত বলে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। এতে লেখকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'দৃষ্টিপাত'-এর পাঠকপ্রিয়তা সে কারণে ঘটেনি।

দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌র পরাজয় কীভাবে ঘটল, আক্রমণকারী বিট্রিশের পরাক্রম ও নিষ্ঠুরতা কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল তা যেমন বর্ণিত, তেমনই পিছিয়ে গিয়ে সম্রাট শাহজাহান ও তার কন্যার শেষজীবনের কাহিনিও

উপন্যাসগুলি। নয়া দিল্লির পত্তন, পরিকল্পনা ও নির্মাণের বিবরণ যেমন আছে তেমনই আছে ১৯৪২ সালে রাজধানী দিল্লির সমাজজীবনের আলেখ্য। এইসব কিছুর পিছনে সক্রিয় লেখকের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান, শাসক ও শাসিতের মানসিকতার উন্মোচন, এবং দিল্লিবাসী ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজের নিপুণ আলেখ্যচিত্রণ। সর্বোপরি আছে মানবচরিত্রের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তার কুশলী উপস্থাপন। সবের মিটফল পাঠকপ্রিয়তা।

'দৃষ্টিপাত' প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে ছাব্বিশ বছর পূর্বে। তবু আজও তার পরনে পাঠকের ক্লান্তি ঘটে না। তার কারণ লেখকের গভীর অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ আর নিপুণ বিশ্লেষণ। তা সমভিভ গদ্যে ব্যক্ত। এই সমভিভতাই পাঠককে মজায়। কয়েকটি উদাহরণে তার পরিচয় পাই। সেক্রেটারিয়েটের বর্ণনা :

'ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটটি নবনির্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়েট নয় এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লি শহরটা আপস্টার্ট, বারাণসী প্রয়াগ এমনকি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও ওর পশ্চাতে কোন ট্র্যাডিশন নেই। সে হঠাৎ টাকা-করা ওয়ার-কনট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি অমিদার নয়। কিন্তু যুগাটাইপে ভুঁইফোড়দের। এ যুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী অস্টিন, সাত লহরীর চাইতে মগুলন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব। মাকখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ডাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়েটের দুই মহল,—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি কিছু এক। যেন মহরার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ হাঁচে গড়া এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনাকার এডুইন লুটিয়েন এবং তাঁর সহযোগী সার হার্বার্ট বেকারের নাম।...

সেক্রেটারিয়েট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে,—সাকল্যে দুই অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ-তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী ঘণ্টা প্রভৃতি অলংকরণের। তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যরীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিত্রিত কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজস্থিতিরা বেশীরভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতনার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। অনভিজ্ঞ এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ-নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু'ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেণ্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবমিনার থেকে মাত্র একুশ ফুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে কক্ষ আছে প্রায় এক হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডই বটে।'

নয়া দিল্লির রাজপথ-পার্ক ও পুষ্পশোভার বর্ণনা :

'এ সময়ে ফুলের অভাব নেই। পথের দু'পাশে সরকারি বাগানগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভার সমৃদ্ধ, পথচারণে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার মৌমাখার বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আসে ফুলের কেয়ারী। ডাকঘরের গাছে, হাসপাতালের মাঠে, সুটে রয়েছে

প্রচুর মহুলমী ফুল। ঝাউ গ্রেণে আছে 'কালো' ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে পুষ্পপ্রদর্শনের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভয়াবহতার শেষেই। নয়াদিল্লীর আকাশ আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিস্তেজ হতাশার, মাটিতে আছে তপস্বিনীর ধূলিমলি। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী শহরটির জন্য প্রদান করেছে ছায়ার, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার জল সিঞ্চির কৃপণের ধন রচনা করেছে পর্যাপ্ত ইন্দ্রজাল। চাণক্যপুরীর পথে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেদন আছে নয়াদিল্লীতে। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার অনতিদূর, পরিবিরহিত পথ-আলোকিত পাশে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সমাবিষ্টাহিত তরুণ-তরুণীর প্রাণে হয় উদ্বেগ, বক্ষ হয় ঘন ঘন, চুলি চুলি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোনো কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সাহচর্যে তরুণতরুণীর পৃথক্-চেতনার আসন্ন অতি নিকটে আর একজনের মুখ আসবে ঝেকে আ' দু'-একবার সাক্ষ্যলাভ হয়ে শাসন একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।'

বাঙালি মেয়েদের অধিগতীকার (সাইটসিইংসবাসে) বর্ণনা :

'এদেশে সর্বশুদ্ধাহিতা হবার লাভী মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুশীলা ও পুরকর্মনিপুণা। যে মেয়ে ডিগ্রিছে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাস করেছে তাকেও কারপেটি সূচ তোলা শিখতে হয়, বঙ্কির তোলন দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের সামনে কনে বাঙালির সমন্ন মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি-পরিচিত ভজনের ভঙ্গিতে মধুরে বাসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী আজ' ইত্যাদি। বিবাহের মহরায় পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। আজার বরের মনিদ আছের বৌদ্ধ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশি থাকেন, তার জীড়াদক্ষতা, অভিনয় পারদর্শিতা কিংবা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয়তো ইনকেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিদ্যে কোনো একটা মাত্র কুটিয়ে নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের নাম প্রথমতঃ রূপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষকদের রান্নাবান্নাশেষ পরিমাপে।'

দিল্লির বর্ণনা করে বাঙালপ্রমাজে সাইটসিইংসন পরীক্ষার বিবরণদানে লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তার সপ্রতিভ উপস্থাপনা পাঠককে টানে। পঞ্চাশ বছর আগে এঁকেল ছবি খুব-একটা বদলায়নি। দিল্লিবাসী এখন আরও অনেকগুণ হয়েছে, কিন্তু রাজপথের শোভা বদলায়নি। আর বাঙালি সাইটসিইংসনের কৌশলটা উন্নত হয়েছে, মূল ব্যাপারটা বদলায়নি।

এখানেই দৃষ্টিপাত-এর লেখকের জিত।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান ('দৃষ্টিপাত') আর ১৯৪৭ সালে কাশীর থেকে হানাদার বিতাড়নে ভারতীয় সেনার অভিযান ('বিদায় নদীর তীরে')। এ দুটি ছবি পাশাপাশি রাখলে যাযাবরের গভীর ইতিহাসচেতনা আর সেই ইতিহাসকে জীবন

করে তোলার শিল্পসামর্থ্য, এ দুই গুণের পরিচয় পাই।

লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ 'ঝিলম নদীর তীর' বইটি, পূর্বেই লিখেছি, কেবল কিশোর-পাঠ্য নয়, সব বয়সের সব ভাষাভাষী ভারতীয়মাত্রেরই পাঠ্য। এ বই আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কদের মূঢ়তার দাম আজও আমাদের দিতে হচ্ছে। অথচ সেদিন ভারতীয় সৈন্যরা কী অসমসাহসে কী অবিশ্বাস্য অভিযান চালিয়ে কাশ্মীরকে করেছিল হানাদারমুক্ত।

লেখক গ্রন্থসূচনায় দুটি কাজ করেছেন। তথ্যসংগ্রহ কাজে যেসব বই পুরনো দলিল ও সরকারি মুদ্রিত বিবরণীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার একটি অবশ্যউল্লেখ্য তালিকা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী সমকালীন ব্যক্তিদের প্রতি। তালিকাটি এই রকম:

'হোয়ার থ্রি এম্পায়ার্স মিট (ই. এফ. নাইট) ; জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর টেরিটরিস (ফ্রেডরিক ড্রু) ; গোলাব সিং (কে. এম. পানিকর), রেমনিসেন্স অব এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান (উইলিয়ম এডোয়ার্ডস) ; ডিফেন্ডিং কাশ্মীর (পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন); কন্‌ডেমড আন্‌হার্ড (অজ্ঞাত) ; ডেসপাচেস টু দি সেক্রেটারি অব স্টেটস (এইচ. এম. ডুরান্ড) ; হিস্টরি অব দি শিখস (কানিংহাম) : ইউ, এন কমিশন্‌স রিপোর্ট ; মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (এ, ক্যাম্পবেল জনসন) ; হোয়াইট পেপার অন কাশ্মীর (গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া) ; শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ; মাননীয় জি. এম. সাদেক ও মিসেস রাজেন্দ্র সিং।

লক্ষণীয় কত গভীর অধ্যয়ন ও বিচারের মধ্য দিয়ে লেখককে যেতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর শ্রমজনিত ঘর্মের বিন্দু রচনায় কোনও ছাপ ফেলেনি, উল্টে লেখক পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন এক রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস দ্রুতগতি কাহিনি। রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযানের সারাৎসার নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'ঝিলম নদীর তীর'।

কাহিনি শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে উদ্ধার করেছেন 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' গ্রন্থের লেখক অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন-এর একটি উক্তি :

Mountbattan says, as a military operation, the speed of the fly in on the 27th October left our SEAC efforts standing.

দ্বিতীয় বিশ্বসময়ে মিত্রশক্তির দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখানে স্বীকার করেছেন, হানাদারদল এগিয়ে আসছে, শ্রীনগরের বিমানপত্তন তখন সরু এক ফালি পিচ্, সেখানেই অসম্ভব সাহসে নেমেছেন ভারতীয় সৈন্যদের তিনটি ডাকোটা (সাতাশে অক্টোবর ১৯৪৭-র ভোরবেলা)।

এবার ভারতীয় সেনার হানাদার বিতাড়ন অভিযানের বর্ণনার অংশবিশেষ :

"১৯৪৭-এর ৭ই নভেম্বর। রাত তখনও শেষ হয়নি। ব্রিগেডিয়ার এল. জি. সেন (জন্মসূত্রে বাঙালি) হুকুম দিলেন 'ফরোয়ার্ড মার্চ'। এতদিন ছিল আত্মরক্ষার লড়াই। এবার আক্রমণের পালা। শ্রীনগরের অদূরবর্তী বাদগামে থানা গেড়ে বসে আছে হানাদার বাহিনী। তাদের মেজাজ খুশ, কারণ বাদগামের যুদ্ধের পরে এ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের

আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। 'এমন সময় হারে রে রে রে'—

এই ভূমিকার পরেই ভারতীয় সৈন্যদের প্রথম আক্রমণের বিবরণ : 'বিনা বাধায়-ই হানাদারেরা ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে বারমূলা থেকে পাটান। পাটান থেকে সেলাটং। শ্রীনগর শহরের প্রায় দোরগোড়ায়। এখন রাজধানী শ্রীনগর তাদের নাগালে। ঠিক যেন গাছের নীচু ডালে ঝুলছে লাল টুকটুকে পাঁকা আপেলটি। শুধু হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। অনেক রাত জেগে সর্দার তাই ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আমোদ ফূর্তি করেন। কখনও মনের সুখে গোঁফে লাগান চাড়া। কখনও বা গন্ধ-ভরা রুমাল হাতে নিয়ে সহস্রবার দাড়িতে দেন ঝাড়া। শেষ রাত্রির দিকে সর্দারের ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন।—যেন শ্রীনগর দখল করে মহারাজকে কোতল করেছেন। মহারাণীকে করেছেন বাঁদী। তাকিয়া ঠেস দিয়ে সোনার গড়গড়ায় রুপোর নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া খাচ্ছেন আরামে। হঠাৎ শোনেন "হারে রে রে রে—"

ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে ভীষণ বেগে। চমকে উঠে বসে বললেন, "অ্যাঁ, যুদ্ধ? সে কী?"

চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় হাঁক দিলেন, "বন্দুক লাও।" লাও তো বটে! কিন্তু আনে কে? হট্টগোলের মধ্যে হানাদারেরা কেউ খুঁজছে হাতিয়ার, কেউ খুঁজছে পোশাক কেউ বা দিশেহারা হয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই কপালে খেল ঠোক্কর, মাথায় পেল চোট। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে। ব্রিগেডিয়র সেন আগেভাগে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরে, আর একদলকে দক্ষিণে। মাঝখানে ছিল মূল পদাতিক বাহিনী। ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতো তিন দল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করল হানাদারদের। তিনদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে লড়াই করা চলে কতক্ষণ? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হানাদারেরা কাবু হয়ে পড়ল। তার উপরে—।

এ কী, মেশিনগানের আওয়াজ শোনায় যেন! হানাদারেরা তখন দিল সোজা চম্পট। দৌড়, দৌড়, চোঁচা দৌড়। কমান্ডার দেখলেন মহাবিপদ। দলের লোকেরা এভাবে পালাতে শুরু করলে যুদ্ধ করবেন কাকে নিয়ে? তিনি তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "ভাইজান, তোমরা পিছু হটছ কেন? মনে হিম্মৎ রাখ, হিন্দুস্থানী কাফেরগুলি এখুনি ঘায়েল হবে। একটু পরেই শ্রীনগর আমাদের কব্জায়। জিহাদ হাসিল কর—"

কে শোনে কার কথা। হানাদারেরা বলে, "আরে রাখো মিঞা, তোমার শ্রীনগর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান যায়, তায় জিহাদ!" তাড়াতাড়ি পালাতে লাগল তারা যার যে দিকে, দু'চোখ যায়। কিন্তু যেদিকে সেদিকে যাওয়ার কি জো আছে? ভারতীয় সৈন্যরা আছে যে তিন দিকেই। খোলা একমাত্র পিছনের পথ। সে পথে হানাদারেরা হানা দিয়েছিল শ্রীনগরের পানে। উল্টে সে পথেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটল তারা। পিছনে মরে পড়ে রইল তাদের শ'তিনেক সঙ্গী। কিছু রেখে গেল লুঠের মাল, কিছু ফেলে গেল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম। প্রাণের মায়ায় ছোটা,—বড় বিষম ছোটা। পড়ি তো-মরি করে ছুটতে ছুটতে হানাদারেরা সেলাটং থেকে পালালো পাটানে। পাটান থেকে

বারমূলায়। উল্লাসে ভারতীয় বাহিনী পিছনে ধাওয়া করল তাদের। কিন্তু শহরে যাত্রীচলার মোটর বাসগুলি কত আর জোরে চলতে পারে? তবুও সৈন্যদলের ড্রাইভারেরা চেষ্টা করল প্রাণপণ। গাড়ির এক্সিলারেটরটা ডান পায়ে চেপে ধরল পুরোপুরি। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা, চল্লিশ থেকে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সৈন্য বোঝাই জানলা খড়খড়িগুলি কাঁপতে লাগলো সশব্দে। স্টিয়ারিংটা ধরতে হলো শক্ত মুঠোয়। 'চালাও, চালাও জোরসে।" হাঁকতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদলের সেনানায়ক।' ('ঝিলম নদীর তীর')

ব্রিটিশ সেনার দিগ্বিদুর্গ আক্রমণ (দৃষ্টিপাত) আর ভারতীয় সেনার বারমূলা-পাটান-সেলাটং-এ পাকিস্থানি হানাদারের বিরুদ্ধে অভিযান ('ঝিলমনদীর তীর')—দুই সামরিক অভিযানের বিবরণে অবলম্বিত হয়েছে একই চিত্রময় দ্রুতগতি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা-কৌতূহল মিশ্রিত গদ্যরীতি। যাযাবরের এই গদ্যরীতির পরিচয় ঈষৎ পূর্বেই দিয়েছি। তফাত কেবল একটি জায়গায়-পরিবেশ রচনায়। বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌র বিরুদ্ধে ইংরেজ-অভিযান আর কাশ্মীরে পাকিস্তানি হানাদার-বিতাড়নে ভারতীয় অভিযান-এ দুয়ের বাতাবরণ এক নয়। প্রথমটিতে ছেয়ে আছে এক ধরনের বিষণ্ণতা, তার মূলে আছে ভারতীয়দের দেশপ্রেম আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। দ্বিতীয়টিতে আছে এক ধরনের উৎসাহ (উল্লাস), তার মূলে সক্রিয় ভারতীয়দের দেশপ্রেম ও পাকিস্তানি হানাদারদলের ঘৃণা। দুটি ক্ষেত্রেই লেখক সফল।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জনান্তিক' (১৯৫২) একমাত্র উপন্যাস। এর পূর্বে ও পরে যাযাবর আর উপন্যাসরচনায় আগ্রহ দেখাননি। হয়ত তাঁর মনে হয়েছে উপন্যাস তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। রম্য পত্রাবলি ('বেল-লেতর্স') 'দৃষ্টিপাত' আর প্রবন্ধ ও ছোটগল্পই তাঁর স্বক্ষেত্র। বস্তুত তাঁর প্রবন্ধ ও ছোটগল্পে ভেদ বিশেষ নেই। ছোটগল্প রচনায় যে তাঁর হাত আছে তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন সুনন্দা ও চারুদত্ত আধারকার কাহিনিতে ('দৃষ্টিপাত' গ্রন্থভুক্ত), কিন্তু তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করেননি। আমার মনে হয়, যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় যে মানসিকতার অধিকারী, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রীয় মানসিকতা খাপ খায় না। সুনন্দা-চারুদত্ত আধারকার কাহিনিটি রোমান্টিকতা ভাবাবেগসর্বস্ব "দেবদাস" কাহিনিতে পর্যবসিত করার অভিপ্রায় লেখকের ছিল না। আধারকার কাহিনির শেষে ('দৃষ্টিপাত'-এর শেষাংশ) লেখক আধারকারকে দ্বিতীয় দেবদাস বাননি, এটা পাঠকের পরম সৌভাগ্য। সুনন্দার সঙ্গে আধারকারের প্রেমবিনিময় (যা সুনন্দার পক্ষে খেলা বা অভিনয় মাত্র) কাহিনি আধারকার লেখককে বলেছেন এবং আত্মকাহিনি শেষ হওয়ামাত্রই উঠে চলে গেছেন। অবশ্য আধারকার সকরুণ স্বীকারোক্তি করেছেন—"মিনি সাহেব আমি ইডিয়টই বটে। পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম, খেলাকে ভেবেছি সত্য।" আধারকারের শেষ কৈফিয়তকে লেখক বলেছেন, 'অতি দুর্বল সান্ত্বনা'। পাঠকের সৌভাগ্য, আধারকার যতই ককটেল-বিশেষজ্ঞ হোন না কেন লেখক তাকে দেবদাসের মতো মদ খেয়ে বিলাপ করার অবকাশ দেননি। তাই বিনয় মুখোপাধ্যায় নন শরৎ চাটুজ্জে ; সে কারণেই কাহিনি শেষে লিখতে পেরেছেন:

"আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যাঁরা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। এঁদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কম্প্রমাইজ। এ দারুণ ইনফ্লেশনের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশি নয়।" প্রেমিক আধারকারকে লেখক বলেছেন, 'কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য।' এর বেশি কিছু লেখক তাকে দেননি।

তাই একমাত্র উপন্যাস 'জনান্তিকে' লেখক পাঠককে পথের শেষে কোনও সান্ত্বনা-মরূদ্যানে পৌঁছে যাবার আশ্বাস দেননি। এ উপন্যাসের নায়িকা মলী সেন তার জীবনআলেখ্য তার আপন উক্তি, আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই উদঘাটিত হবে বলে লেখক আশ্বাস দিয়েছেন পাঠককে। তার বেশি কিছু করতে চাননি, কারণ তাঁর কথায়, 'সবাক চিত্রের তো কমেন্টারী প্রয়োজন হয় না'।

মহানগরীর এক ক্লাবে লেখক যোগ দিয়েছিলেন শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়। সেখানেই দেখা পেয়েছিলেন 'জনান্তিক' উপন্যাসের নায়িকা মিসেস মলী সেনের। এই ক্লাবটিতে নানা ধরনের নরনারীর অভাব ছিল না। বিপত্নীক অফিসার, স্বামীপরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীন তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা ক্লাবে আসর জাঁকান। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিস্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মারোয়াড়ি-নন্দন ইত্যাদি।

মলী সেনের হৃদয় আছে, আশা আছে, আসক্তি আছে, এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ভালবাসা আছে। ভালবাসায় তিনি আপন স্বামীকে জয় করতে পারেননি, অন্যকে আকর্ষণ করেছেন। এখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি—তাঁর প্রবল আসক্তি ঝঞ্ঝার মতো আসে, আবার চলেও যায়। তাই তিনি রিক্ত, নিঃসঙ্গ, বুভুক্ষু। অপরিমেয় গ্লানি বহন করে বেঁচে রইলেন মলী সেন। এটাই তাঁর ট্র্যাজেডি।

যাযাবরের 'লঘুকরণ' (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪) আটটি নিবন্ধের সমাহার—'রামগরুড়ের ছানা', 'খাপছাড়া', 'স্ত্রীষু', 'রাজকুলেষু চ', 'তির্যক অক্ষি', 'কালকের পোষাক', 'মীমাংসা', 'নাস্নী'।

এগুলিকে প্রবন্ধ বলা যাবে না। কারণ প্রকৃষ্ট বন্ধনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আনুগত্য, পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের বক্তব্যের উপস্থাপনা ও তাদের বিচার, এবং শেষে বক্তব্যকে গুটিয়ে এনে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রবণতা এই নিবন্ধগুলিতে নেই। বস্তুত এগুলিকে 'loose sally of the mind' বলা যায়, এবং রম্যরচনার পথেই লেখকের পদচারণা। সেনর মিশেল দ্য মঁতেন যে-ধরনের নতুন সাহিত্যপ্রয়াস (essay) করেছিলেন তা থেকে তৈরি হয় 'Essay' কিন্তু এখন আমরা essay বলতে যা বুঝি তা মঁতেন লেখেননি। বাংলায় এ ধরনের লেখায় প্রথম সাফল্য অর্জন করেছিলেন বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী। তারপর অনেকে তা লিখেছিলেন যেমন বুদ্ধদেব বসু। তা ছাড়াও আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায় এই ধরনের রম্যনিবন্ধ লিখেছেন যার উৎস 'wisdom in a smiling mood', সস্মিত প্রজ্ঞা। এ ধরনের রম্য নিবন্ধের সংকলন প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা'

(১৯৩৪) 'গীতাঞ্জলি ট্রিলজি' (১৯৪৪) রীতিমতো একটা গবেষণার নাম 'ইশারাই বাবা' (১৯৪৫)। এর সুনাম প্রচার করেছেন প্রতিবেশী লেখক, 'অজানার অনুসন্ধানে' গীতাঞ্জলি হয়ে উঠেছে 'আমাদের সুনন্দা জন্য না হলে আমরা কখনও রামকৃষ্ণের আসনে বসেছে ছবিতে দেখা নিত্যই আমাদের।" এ রামকৃষ্ণের ঈশা প্রচারে পুলকিত, তা কখনও বিতর্কে কাটিয়ে, কখনও বিদেশে প্রচার, কখনও বা অবশ্যই পুষ্টিকরণে। রামকৃষ্ণ 'সদ্‌গুরু'-এ সে কথাই আমাদের। তুলিকাকার লিখেছেন, "অতীত পুরুষদের আসনে আমাদের নিশ্চিন্তে পীরের পুরিকারী ঈশা পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ পাশে হয়েছেন। তাদের পুরোপুরি স্থান অবশ্যই, তারা উঠেছে, যারা আমাদের তারা নয়েরাই এ পৃথিবীর কারবার' নয়, শুধু এই প্রতীক হোলেন আমরা যেন। সুনন্দা যে-রূপ বাঁধার উপাসনার কারণ পাশের না এ পুরুষ আমাদের জন্য নয়।"

প্রথম ট্রিলজি ও সুনন্দা রায় হোলেন যোগ্য কারবারী, তারাবাবার সেই আসনই কারবারী থাকে নিজেকে উপস্থিত করতে হোলেন 'সদ্‌গুরুধন'-এর আরেক রহ-নিবন্ধ আমাদের সমাজ, ব্যক্তি, প্রশাসন ও নানা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তিনি গবেষণাকৌশলসমৃদ্ধ গবেষণামূলক ট্রিলজি। প্রথম ট্রিলজি বাবার কাহিনির হাসির আসল ঘটিয়ে দিয়ে হোয়েছিলেন, সুনন্দা রায় ও-নই কাহিনিকে। রামায়ণ তাঁদের পাশেই চলতে হোয়েছেন।

প্রথম নিবন্ধে (যাদবপুরের ছাত্র) আপত্তিগোত্র এই লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন, পরিচিতির আসন, কথা ও শিক্ষা আমাদের একাধিক লেখা কাহিনিতে। কথামৃতের বাক্যের আলোয় আমি, হোয়েলে ট্রিলজি এবং রামকৃষ্ণ তৈরি ভূমিকায়ের আমরা ঐতিক কাশপাত্রের সাথেও কাহিনির বাবার মধ্যে থেকে আসে। প্রতিবাদের মুক্তি অনুভব কথা করিব না। 'রামকৃষ্ণের অবতার, অনটিন, হোয়েছে সমাজ, অবতারবাদের বাঙালী সিংহল, বিভিন্ন সাধারণের উপেক্ষা ইত্যাদি—বাবার আলোকপাতের সম্পাদনীয় নিবন্ধের নিবন্ধের অবতরণ। অবতার, অনটিন আছে। হয়তো সেখানে পরিচয়ণী আছে। কিন্তু পাঠানি শুধু যা কাজলটা পাঠির মতো মুলে নিলে সেই একমাত্র আসাধারণটা নিকের বিশেষত্ব নয়। পাঠিয়েরে তো কোনো সেখা এরেখি নেই। উত্তর আমার দেখা যায়, মধুর মেয়েরা নিয়ে শেষে সেখানে হোলো কর্মবীর পুত্র নিজের। সেই সাজানি রাজনিষ্ঠুর কাজে ইট হোলো নিয়েরে, কোনোর আরি সেরো দি-বড়িটি-লির রাস্তা আমিয়ের। আমরা কঁকালে নিত্য আমরা আমরা পুঁটিলি বাঁধ রাজনা, আমরা যা কাঁধে পাশের পাশে কুড়িয়ে পাথরা স্কালনি কাটের বাঁধী। আমরা পুরিয়ে যা পাঁচাল ইটিয়ে নদ রেঁধে চলেছে। আমরা হাত পরিবেশ এবং সর্বপ্রিয়ের সর্বাংশে পাথরী আমাদিয়ে বলাসেই চলে। বাবার এরেই সম্প্রদায় বাজনি অবতার দেখে বাঙালী পরিবেশ দুরবস্থান নীর্ঘ হয়। বাঙ্কি থেকে গল্প হয়, আমল মেলের হাজার বাল থেকে চাতুর হোলো আমল পাঠ্য আমার হোলো দুটি মহাত্মার এলোমেলো এবংগতি হোলেনি। অথচ অবতার ও অনটিন হোলোর বিশ্ব অবতারপূর্ণ নয়। রামকৃষ্ণলাভ আমার অবতার গঠন কাল নিয়ে হয়। এবং সেটা কালের নয় না।"

বাঙালি কেমন নিয়ে অনটিন মুখুপুণ্যের কাহিনী রামকৃষ্ণের ছবি-লেখক এ দুটি

আসেন না। সমাজ সেখানে লোকেরাও তা-ই, লক্ষণ তিনি সাত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সমাজ অবতার নিবিড়তম টিপ্পনি—

"আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অনেকের সম্ভার সম্পর্কে আমরাই আমরা নয়। তাঁরা নিজেদের ভোগ নয়, কৃপণ পায়। কিন্তু ও দীনের, নিজেদের জীবনযাপনের আমাদের সাধারণের অর্থাৎ, নিজেদেরকে পরিচয় জন করে আমাদের নয়। কারণে তাঁরা হয় অন্তরালের, নয়তো কাগজপত্রেই। আসল নিজেকে রাখে। কিন্তু সে কৃপণদের ভোগের প্রশ্ন; কলে, ছলে, অর্থের নারায়ণের অবয়ব হয়। অন্তরের শুরুতর। তাতে আছে কেবল ভয়। সে শুধু দীনের নয়, নিজেরও বটে। কারণ পাঁচার অবতার নিজের কাঁচিয়ে সে অন্তর ছুল লেগেই সেটা হৈলেই লোকের কাছে অনাবশ্যক চলনসই মনে হোয়ে পড়ে। কিন্তু তারই পরিণতি ভয়। বাজনার ভাবে থাকে আসাধারণ বাঁচি। তাতে আসল অবতার নেই। আছে শুধু কাঁচ যাতে থাকে নিজের আপত্তি। সেটা আপনি নিজেকে আপনার নেই, তাঁদের নিয়ে আর্থে। বাস্তবিক, নিজেদের মতোই নিজে মনের প্রতীক নয়, ঠিক যেমন যেকোনো লক্ষ মতোই না বলছেন পাওয়াটি। আমাদের শেখাবে ভাল দৃষ্টি সেখেরা হয় নিজেরা নয়, অন্তরায়।"

যাদবপুরের পঞ্চাশ দুটি। 'দুই ও নীর' (১৯৭৫) মাতৃটি পাঠের সাক্ষাৎ। 'প্রথম বৃষ্টি নামল' (১৯৯৫) আটটি পাঠের সাক্ষাৎ। ঈশানে, যাদবপুরে সেমিনার পাঠে পাঠকের যে আসন, তাঁর পঞ্চাশটে একটি আসন, এবং পাঠকবিমুখক 'দৃষ্টিপাত' পাঠের সেই আসন। সে কারণে পাঠগুলির মেজাজ বেবরো জন্য পরস্ত আলোচনা নিয়োজিতেন। পাঠগোটি পাঠে সুবপাঠ্য। কেমন পাঠকের হৃদয়ের প্রতি, মনোজ পঠিক আসন আছেন। কড়া, মিঠে, কড়মিঠে, ঝাল, মেথেরা, লবণাক্ত, অম্লতা—সবই পাওয়া যাবে। যাদবপুরের পাক আছে white-cloth wedding চাতুপ্রসাদ সমাধি, আর অবশ্যমূল কলার উপস্থাপনা।

এগুলির মধ্যে একটি পঞ্চ 'অটিপ্রণ' কাছে। এমন পঞ্চ যিনি লিখতে পারেন তাঁর শিক্ষকসমর্থ ঈশ্বরে না করে উপায় নেই। পাঠের মধ্যে শিখ। পাঠকদের যে 'অটি', সে বিষয়ে প্রথমটি বাঙালি হয় দুটি কথাতে ট্রিটমেন্ট থেকে প্রাপ্ত যাচ্ছে, জানাচ্ছে। সেই বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে কাহিনের 'ডেকে' আলাপ হয় এক প্রবীণ মিলন ইয়োরোপ আসে, যিনি একদা পাকাটন ডাকাতে ট্রিটিশ রাজপুরুষ হিসাবে রাজুলি পাহাড়ের অধীন ডাকাতীয় রাজপুরুষে পালন করোছেন। তাঁর কর্মজীবনের এক কলাপ অভিজ্ঞতা এই পঞ্চটী। পাঠের সুনন্দা সেই ডাকাত অভিজ্ঞতার আড়াল নেই। যাদবপুর-সুলভ উপস্থাপনায় সিনিয়রের সঙ্গে পাঠক চলতে শুরু করেছে। যাত্রা সুলভটী মনোরম। তা কাল নিয়ে পঞ্চটী উপস্থাপনা করা যায় না। এ পঞ্চের মূলে আছে anti-climax। যাদবপুর সুনন্দা তার আভাসমাত্র নেই।

প্রথম ট্রিটিশ রাজপুরুষ তাঁর বাঙালি প্রোফেসর নর্থ-ব্রুকের কলিকাতার চাতুর্মিলনীতে একটি পত্র পেলেন। সে পত্র আসবাবে, তাঁর অভিজ্ঞতার আসবাবে। মিলনে জন পার্সিভেল লেখাগুলোর, সি. আই. ই., আই. সি. এস. (রিটায়ার্ড)-এর অভিধিত

অটোবায়োগ্রাফির একটি অধ্যায়।

সংক্ষেপে লিখি। যে বছর ফেয়ারওয়েদার নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রান্টিয়ারে উপজাতি এলাকায় তাঁর কাজে যোগ দিলেন তাঁর কিছুদিন আগে থেকেই উপজাতীয় একটা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে গভর্নমেন্টের সংঘর্ষ চলছিল। বিদ্রোহী উপজাতি দলের প্রধানকে সবাই বলে সুপীনের ফকির। সে গরিবের বন্ধু, ধর্মপরায়ণ, ব্রিটিশবিরোধী। খুন, লুঠতরাজ, লড়াইয়ে তার জুড়ি নেই। পেশোয়ারে বসে থাকলে তাকে ধরা যাবে না। দুদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ গিরিপথে যে সওদাগরেরা আসা যাওয়া করে তারা সুপীন ফকিরকে সেলাম এবং সেলামি না দিয়ে পার পায় না। পর পর দুজন ব্রিগেডিয়ার খতম হলেন। তখন তরুণ আই. সি. এস. ফেয়ারওয়েদার যেচে এই দায়িত্ব নিয়ে লান্ডিকোটালে পৌঁছলেন। বুঝতে পারলেন উপজাতীদের ভাষা না শিখলে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বা বৈরিতা কোনওটাই সম্ভব নয়। সাহেবের নৌকর বলতে দু'জন-বাবুর্চি ডিসুজা গোয়ানিজ। দ্বিতীয় জন, দীন মহম্মদ, এক কিশোর, তিন কুলে কেউ নেই। ফেয়ারওয়েদারের খুব পছন্দ দীন মহম্মদ। বয়স বারো বা তেরো। সে রান্না ছাড়া সাহেবের বাকি সব কাজই করে। কাজে ও বুদ্ধিতে হুঁশিয়ার। ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মোটর বাইকটার প্রতি ছোকরার সব চেয়ে বেশি যত্ন ও মনোযোগ। ফেয়ারওয়েদার কঠোর হাতে বিদ্রোহী নির্মূল করতে শুরু করলেন। এদিকে দীন মহম্মদ লুকিয়ে লুকিয়ে ফটফটিয়া (মোটর সাইকেল) চড়ে। গভীর রাতে সাহেবের মোটর বাইক নিয়ে চড়ে। হঠাৎ একদিন সাহেব দীন মহম্মদের এই নৈশবিহার টের পেলেন। পরদিন সকালে সাহেব তার নৌকরি খতম করে দিলেন। আপিস ঘরে এসে শুনলেন দীন মহম্মদ চলে গেছে। সাহেব যার কাছে পস্তুভাষা শিখতেন, সেই মুন্‌শিও বাড়ি চলে গেল। সে সাহেবকে দুদিন দুটি প্রবাদ বলে গেছে : 'দুনিয়ায় ঘটনার সীমা নেই ; সীমা আছে শুধু ধারণার।' এবং 'স্ত্রীলোক এবং বালক দুই-ই সরল ; কিন্তু প্রলোভনে পড়ে যদি পা পিছলোয় তবে তাদের হঠকারিতার সীমা থাকে না।' শুনে ফেয়ারওয়েদার সাহেব শুধু হেসেছিলেন। ছোকরা দীন মহম্মদকে বিদায় দিয়ে ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মনটা খারাপ হল।

লান্ডিকোটালের টার্ম শেষ হয়েছে, এবার সাহেব পেশোয়ার বা দিল্লি ফিরে যেতেই পারেন। সব অশান্তি দমন করেছেন, কিন্তু সুপীন ফকিরকে জীবিত বা মৃত ধরা যায়নি। তাকে ধরার জন্য সরকার ঘোষণা করলেন ইনাম (পুরস্কার)।

অনেক দিন পরে হঠাৎই একদিন দীন মহম্মদ এসে হাজির। সে সাহেবের বাবুর্চি ডি-সুজার কাছে শুনে গেল বিদ্রোহী ফকিরকে ধরতে বা মারতে পারলে মিলবে দু'হাজার টাকা ইনাম। দু'দিন পরে খবর এল, লান্ডিকোটালের দু'মাইল উত্তরে পাহাড়ের ওপার ফকীরকে কে একজন গুলির আঘাতে ঘায়েল করেছে।

টাকা নিতে যে এল তাকে দেখে ফেয়ারওয়েদারের দু'চোখে পাতা পড়ে না। সেই ছেলেটা—দীন মহম্মদ। সাহেব তাকে গুনে গেঁথে দু'হাজার টাকা দিলেন। সে গুনে এগারশো টাকা রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল। সে জানাল, পেশোয়ারে একটা ফট্‌ফটিয়া

(মোটর সাইকেল) দেখে রেখেছে। দাম এগারশো টাকা। কালই তা কিনতে রওনা হবে। দু'হাজার টাকাই তার প্রাপ্য—ভূতপূর্ব মনিব ফেয়ারওয়েদার তাকে বোঝালেন। দীন মহম্মদের তার দরকার নেই। মেহনত করে রোজগার করবে। বেশি টাকা দিয়ে হবে কী?

সাহেব কৌতূহল দমন করতে না পেরে শুধালেন—কেউ যা পারেনি, তুই তা পারলি কেমন করে?

দীন মহম্মদের মিনতি-মাখা উত্তর—আমি মিথ্যা বলিনি, হুজুর। প্রমাণ চান তো—

সাহেব বাধা দিলেন, না তোকে আমি অবিশ্বাস করিনি। আমি শুধু জানতে চাই, তুই এমন অব্যর্থ নিশানা করলি কেমন করে? ফকিরের গতিবিধি কেউ সঠিক জানতে পারে না। সে যে ওই পাহাড়ের ঘাঁটিতে ছিল সে খবর তুই পেয়েছিলি কোথা থেকে?

দীন মহম্মদের উত্তর—বাঃ রে, সে তো খুব সহজ। সে যে আমার বাবা।

ফেয়ারওয়েদার সাহেবের মনে হল, তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে, বোধ হয় পড়ে যাবেন ; পাছে পড়ে যান, দু'হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে ফেললেন।

পাঠক, বাংলাভাষায় এমন গল্প পড়েছেন? আমি তো পড়িনি। আপনি যদি পড়ে থাকেন আমায় জানাবেন।

গ্রন্থ-পরিচিতি

অমনিবাস-এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞাতব্য কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য নীচে মুদ্রিত হলো।

দৃষ্টিপাত

দৃষ্টিপাত বাংলা ১৩৫৩ সালের পৌষ (জানুয়ারি ১৯৪৭) মাসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তার অব্যবহিত পূর্বে প্রায় দীর্ঘকালব্যাপী সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল। সে কারণে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটে। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের ফলে "সহরে মানুষের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বিশৃঙ্খলা" এবং "পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে বহু বাধা-বিঘ্নের" উল্লেখ ছিল।

প্রকাশক তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে বলেন "আমাদের বিশ্বাস, দৃষ্টিপাত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বেলে লেটার্স—Belles Letters—এর আগে বাংলায় ঠিক এই ধরনের কোনো বই বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।" ঐ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় 'খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। ১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে এবং ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দুটি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এ বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে।"

১৯৫০ সালে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে দৃষ্টিপাত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে এবং গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বহুপ্রতিষ্ঠ নরসিংহ দাস পুরস্কারে সম্মানিত হন।

শ্রীমতী নমিতা লুম্বা অনূদিত হিন্দী দৃষ্টিপাত ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থকারকৃত দৃষ্টিপাতের একটি নাট্যরূপ অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশন কর্তৃক ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বেতারে প্রথম অভিনীত ও প্রচারিত হয়।

দৃষ্টিপাতের পটভূমিকা ক্রীপস মিশন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ, অনুমান ও মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশিত Transfer of Power vol-1 গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ইন্ডিয়া আপিস ও ওয়ার ক্যাবিনেটের তৎকালীন গোপনীয় দলিলপত্রের এই সংগ্রহ-পুস্তকটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৃষ্টিপাতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে "লর্ড লিনলিথগো ক্রীপস দৌত্যের সাফল্য কামনা করেন নি।" এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে Transfer of Power vol-1-এর নিম্নোক্ত বিবরণ

প্রণিধানযোগ্য, 'লিনলিথগো ক্রীপসের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। লন্ডনে ভারত সচিবের কাছে চিঠিতে ভাইসরয় পদত্যাগের হুমকি দিয়ে লেখেন যে ক্রীপস তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এর ফলে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধীন কর্মচারীদের কাছে ভাইসরয়ের মর্যাদাহানি ঘটছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দিল্লী আগমনের কথা আছে, "ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌঁছল দিল্লীতে, বেলা তখন দুটো।" ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস ভারতবর্ষে এসেছিলেন ইংরেজী ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনে—"স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস দিল্লী পরিত্যাগ করলেন।" দিল্লী পরিত্যাগের এই তারিখ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২। করাচী থেকে বিমানযোগে তিনি লন্ডন ফিরে যান।

স্বাধীনতার আগেকার যে দিল্লীকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিপাত রচিত হয়েছিল, একালের পাঠক সম্প্রদায়ের এক অংশের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তাঁদের অবগতির জন্য গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি স্থান, পাত্র ও পারিপার্শ্বিকের বর্তমান নাম ও বিবরণ দেওয়া হলো—

"সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল" বলে কাহিনীর আরম্ভ। সে এয়ারপোর্টের এখনকার নাম "সফদারজঙ্গ এয়ারপোর্ট"। এই বিমানঘাঁটিটি আজকাল নিয়মিত যাত্রী চলাচলের জন্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান দিল্লীতে এখন পালাম এয়ারপোর্ট থেকে যাতায়াত করে।

প্রথম পরিচ্ছেদের "দেড়টা বাজতেই দিল্লী। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টাখানেকের বিশ্রাম, প্রাতরাশের প্রয়োজন।" এখনকার বিমানযাত্রীর অভিজ্ঞতার বাইরে। কলকাতা থেকে সরাসরি দিল্লীগামী বিমান—non-stop flight এখন আর বামরৌলীর পথে যায় না। প্রাতরাশ এখন বিমানের ভিতরে নিজের আসনে বসেই পাওয়া যায়।

ঐ পরিচ্ছেদে "বোথারী সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তার নাম কুইনসওয়ে।" এখন আর নয়। বর্তমানে তার নাম বদলে হয়েছে "জনপথ"। "কিংসওয়ে" ও "ইয়র্কপ্লেস"-এর পরিবর্তিত নাম যথাক্রমে "রাজপথ" এবং "মতিলাল নেহরু প্লেস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে "বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে হোম ডিপার্টমেন্ট আছে একটি টেরে।" কেন্দ্রীয় সরকারে আগেকার ডিপার্টমেন্টগুলি এখন "মিনিস্ট্রী" নামে পরিচিত। ১৯৬৭-৬৮ সালে হোম মিনিস্ট্রী সাউথ ব্লক থেকে নর্থ ব্লকে সরে গেছে। এখন "সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে।"

"গিয়াসুদ্দীনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ নিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) তবে তা এখনও দেখা যায়। কিন্তু যে "বি, বি, সি আই রেলওয়ে লাইন গেছে তার উপর দিয়ে" তার সেদিনকার নাম ঘুচে গেছে। স্বাধীনতার পরে জোন্যাল নীতিতে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। বি, বি, সি, আই-এর সংশ্লিষ্ট অংশ এখন ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অধীন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত "লিওপোল্ড এমেরী" তৎকালীন ভারত সচিব Secretary of State for India ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের "কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের" নাম এখন 'ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড'। সে রাস্তার তিন নম্বর বাংলো—যেখানে "ভাইসরয় হাউস থেকে ক্রীপস এসেছেন"—তার এখন অস্তিত্ব নেই। সে বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে high-rise

'শাস্ত্রীভবন' নির্মিত হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখ থেকে দুই বাহুর মত দুদিকে প্রসারিত দু'টি রাস্তার উপরে" স্বরূপ একই ধরনের ছটি বাড়িও বিদ্যুৎ। ভূতপূর্ব "কিং এডোয়ার্ড রোড" অর্থাৎ বর্তমান "মৌলানা আজাদ রোড"-এর উপরে বাড়িগুলির স্থান দখল করেছে সরকারী দপ্তরখানা "নির্মাণ ভবন", এবং আন্তর্জাতিক সমিতি সম্মেলন ও দেশীয় সেমিনার এবং ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য নির্মিত বৃহৎ সভাগৃহ "বিজ্ঞান ভবন"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নয়াদিল্লীর রিডিং রোডে মন্দিরের উল্লেখ আছে। "একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না"—এই মন্তব্য বর্তমানে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নিউ দিল্লীর মিউনিসিপালিটি রিডিং রোডের নূতন নামকরণ করেছেন 'মন্দির মার্গ'; টেম্পল স্ট্রীটেরই আক্ষরিক হিন্দী অনুবাদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদে যে "সুপারিনটেন্ডেন্ট"-এর কথা আছে তিনি এখন "সেকশন অফিসার" রূপে পরিচিত। "এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী" পদটিও অন্তর্হিত। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির সিঁড়িতে বর্তমানে "সেকশন অফিসারের" পরের উঁচু ধাপ "আন্ডার সেক্রেটারী"।

অষ্টম পরিচ্ছেদের ইম্পিরিয়াল দিল্লী জিমখানা ক্লাব এখন শুধু "দিল্লী জিমখানা" নামে পরিচিত। তার "ইম্পিরিয়েল" বিশেষণটি ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করা হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে যে "সুইস হোটেলে"-এর কথা বলা হয়েছে বর্তমানে তার চিহ্ন নেই। সেখানে "ওবেরয় এ্যাপার্টমেন্টস" নামে কটেজ জাতীয় বাংলো ও ওনারশীপ ফ্লাটস নির্মিত হয়েছে।

জনান্তিক

জনান্তিক বাংলা ১৩৫৯ সালের অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর ১৯৫২) মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, পুস্তক হিসাবে প্রকাশের পূর্বে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বসুমতী পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৫৮ থেকে ভাদ্র ১৩৫৯ পর্যন্ত।

কলিকাতার একটি পেশাদার নাট্যসঙ্ঘ জনান্তিকের নাট্যরূপ নূতন দিল্লীর আইফাক্স হলে একাধিকবার অভিনয় করেন। তার আগে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার বাইরে অনেক শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় দ্বারাও জনান্তিক অভিনীত হয়।

ঝিলম নদীর তীর

ঝিলম নদীর তীর মৌচাক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশের (১৯৫৪) পূর্বে তার কিছু অংশ পুনর্লিখিত ও কিছু অংশ নূতন সংযোজিত হয়।

পাকিস্তানী শাসনাধীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) বইটির প্রচার বন্ধ হয়। "রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর" এই অভিযোগে সেখানকার গভর্নমেন্ট পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা বিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় "ঝিলম নদীর তীর"-এর সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৬০ সালে "ঝিলম নদীর তীর" হিন্দীতে অনূদিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক মন্মথনাথ গুপ্ত।

লঘুকরণ

বাংলা ১৩৭১ সালের ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪) মাসে লঘুকরণের প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। লঘুকরণের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছিল।

'রামগড়ুরের ছানা' ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে সংক্ষিপ্তরূপে "বর্ষশেষ" নামক একটি বার্ষিকী সাহিত্য সংকলনে ছাপা হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই খণ্ডিত রচনার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

যাযাবর নামে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে গ্রন্থকার তাঁর সাংবাদিক জীবনে 'শ্রী পথচারী' এই ছদ্মনামে আড়ালে যুগান্তর দৈনিকে রসরচনার একটি নিয়মিত স্তম্ভ-কলাম—প্রবর্তন করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্যকৌতুক satire and humour-প্রধান 'ইতস্তত' শীর্ষক ঐ কলামটি যুগান্তরের আদি যুগে পাঠকমহলে বহু পঠিত ও বহু আলোচিত ছিল। লঘুকরণের 'খাপছাড়া' নিবন্ধের কোনো কোনো অংশে পুরাতন 'ইতস্তত'র ছায়া আছে।

'স্ত্রীযু' অধুনালুপ্ত বসুধারা মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় আশ্বিন ১৩৬৫ প্রকাশিত হয়। তখন রচনাটির নাম ছিল 'লঘুকণ'। পুস্তকে সংকলিত হওয়ার সময়ে ঐ নামটি গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত হয়। নিবন্ধের পরিবর্তিত নাম হয় 'স্ত্রীযু'। এই নামান্তরের সঙ্গে বই-এর অব্যবহিত পরবর্তী রচনার শিরোনামায় যে ভাবসঙ্গতি বর্তমান তা তাৎপর্যপূর্ণ।

'রাজকুলেষু' ১৩৭০ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি প্রকাশের পরে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে রচনাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ দাখিল করা হয়। অবশেষে তথ্য মন্ত্রকের তদানীন্তন প্রধান—সেক্রেটারী—বহু ভাষাবিদ আদিত্যনাথ ঝা আই. সি. এস কর্তৃক ব্যক্তিগত তদন্তের পরে 'রাজকুলেষু'র প্রকাশঘটিত সরকারী উদ্বেগ ও বিরূপতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

'তির্যক অক্ষি' ১৩৬৬ সালের পূজা সংখ্যা বসুধারায় প্রকাশিত হয়। বসুধারার সম্পাদক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও রবীন্দ্রসাহিত্যবেত্তা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্রবন্ধটিতে "বিদ্যাদানের মতো একান্ত নির্বিরোধী কাজেও প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক মশাই যে হালিশহর নিকাষিপাড়া কলেজের প্রফেসার চাইতে অধিকতর মনোযোগের পাত্র সে কি শুধু মাইনের পার্থক্যে?" বাক্যটিতে তার সকৌতুক ইঙ্গিত আছে।

সর্বশেষ রচনা 'নাস্নীতে' "সোনা যখন বাজারেই ফোরটিন ক্যারেট তখন হিরণ্ময়ী বা স্বর্ণলতারা নিশ্চয়ই অলীক এবং সোনামণিরা এ্যানাক্রোনিজম।" এ উক্তির পিছনে ষষ্ঠ দশকের ভারতীয় অর্থব্যবস্থার একটি বহু বিতর্কিত বিধানের সংকেত আছে। সে সময়ে বিদেশ, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য উপসাগর অঞ্চল থেকে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা লুকিয়ে বে-আইনী আমদানী হচ্ছিল। গভর্নমেন্ট কাস্টমস বা পুলিশী পাহারা দিয়ে এই ব্যাপক চোরাচালান বন্ধ করতে অসমর্থ হওয়ায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 'গোল্ডকন্ট্রোল অর্ডার' জারি করেন। এই আইনের ফলে খাঁটি সোনার বেচা-কেনা কার্যতঃ বন্ধ হয়, গহনার জন্য চোদ্দ ক্যারেট-এর ঊর্ধ্বে সোনার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হয়। "গোল্ডকন্ট্রোল অর্ডারের" যুক্তি ছিল এই যে, দেশের অভ্যন্তরে সোনার চাহিদা না থাকলে বাইরে থেকে সোনার চোরা আমদানী আপনিই বন্ধ হবে। কিন্তু পার্লামেন্ট, সংবাদপত্র ও নানা সভা-সমিতিতে এই আইনের বিরূপ সমালোচনার ফলে পরবর্তীকালে গোল্ড কন্ট্রোলের বিধিনিষেধ বহুলাংশে শিথিল করা হয়।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

বাংলা ১৩৮০ সালের শ্রাবণ মাসে 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের সবগুলি গল্পই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভিন্ন পত্রিকার পূজা সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

শকুন্তলার আংটি, কৌন্তেয়, জট ও সরীসৃপ শারদীয়া আনন্দবাজারে ছাপা হয়। "কৌন্তেয়" গল্পটি হিন্দীতে অনূদিত হয়ে দিল্লীর বহু প্রচারিত সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থানে' প্রকাশিত হয়। 'দিনান্ত' গল্পটির হিন্দী অনুবাদ দৈনিক 'হিন্দুস্থানে'র রবিবারের ম্যাগাজীন অংশে মুদ্রিত হয়।

'জট' গল্পটির গোড়াতে নাম ছিল 'সর্পিল'। পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ার কালে গ্রন্থকার তার বর্তমান নামকরণ করেন।

দিনান্ত ও বারুদ 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সরীসৃপ' গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ Reptile নামে Indian Council for Cultural Relations-এর আন্তর্জাতিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা Indian Horizons-এ প্রকাশিত হয়।

যখন বৃষ্টি নামল

বাংলা ১৩৯০ সালের কার্তিক (নভেম্বর ১৯৮৩) মাসে 'যখন বৃষ্টি নামল' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বই-এর সব গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভিন্ন পত্রিকার পূজা সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। যখন বৃষ্টি নামল, গোপন খঞ্জা, মূল্যায়ন, কথাসাহিত্য পত্রিকার পূজা সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। পক্ষীতত্ত্ব, বেতার জগৎ পূজা সংখ্যা, সেন্ট্রিমেন্টাল কলেজ স্টুডেন্ট পূজা সংখ্যা। চরণাগত পরিবর্তন পূজা সংখ্যা, গাওনা উল্টোরথ শারদীয়া সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

"দেশ পত্রিকায় ২৪ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখের সংখ্যায় নীলাদ্রি চাকির নেওয়া যাযাবরের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এটি পড়লে যাযাবর ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন ভারতের রাজনীতি-সমাজ-আচার-ব্যবহার-বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।"

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET